সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

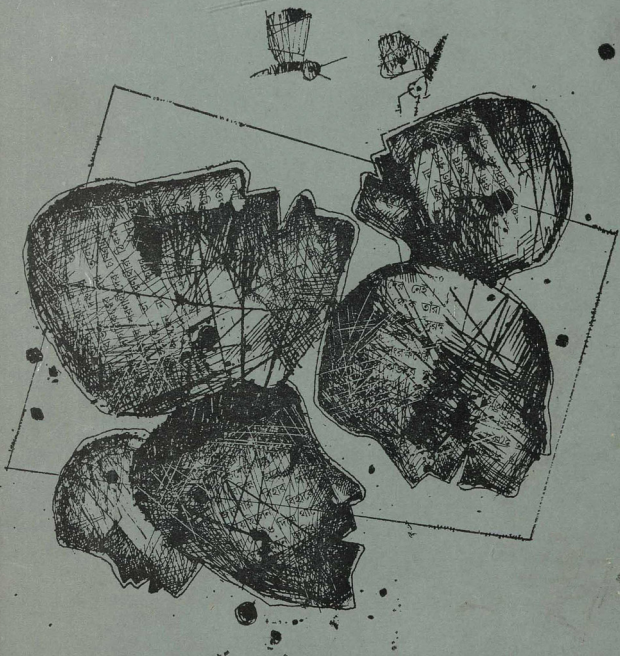

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৪

সম্পাদক	:	বিনয় ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক	:	সঞ্জয় চক্রবর্তী, কল্যাণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য
প্রচার	:	মানস বসু
বিজ্ঞাপন	:	অসীম রক্ষিত
প্রচ্ছদ	:	শেখর রায়
যোগাযোগ	:	টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০০৫৯
ফোন	:	৫৯ ৪০৪৮
		৪৩/১এ, মলঙ্গা লেন, কলকাতা-৭০০০১২

কল্যাণ সেনগুপ্ত / দেরিদা-দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ৫ □ অজিত চৌধুরী / একটি আধা অ্যাকাডেমিক (হাফ হার্টেড) প্রবন্ধ ১১ □ প্রিসিলা রাজ / সেমিওলজি এবং গ্রামাটোলজি : জাক দেরিদার সঙ্গে জুলিয়া ক্রিস্তেভার সাক্ষাৎকার ২৪ □ শিবাজীপ্রতিম বসু / একমাত্রিক সমালোচক ৪২ □ প্রীতিগোপাল দত্তরায় / আমাদের নন্দনতত্ত্ব ৫৩ □ পার্থ মুখোপাধ্যায় / কৃত্তিবাস : কিছু তর্ক, কিছু কথা ৬৪ □ অশোক চট্টোপাধ্যায় / শাস্ত্র-বিরোধিতা, ছয়ের দশক ৭০ □ সুপর্ণ পাঠক / সাহিত্য বিপণন ১০২ □ চৈতালী চট্টোপাধ্যায় / বিজ্ঞাপন : চাহিদা পুরণের শিল্প ১০৬ □ অসিত রায় / ভিন্নরঙ্গ ১১১ □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় / চণ্ডিকার উদরে বৃশ্চিক ১২১

উদয়ন ঘোষ / আমি এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে ১-৫৫

কথার খেলাপ হবে জানাই ছিল, বছরে চারটির বদলে এখন তিনটিতে এসে ঠেকেছি। এতে যে আমরা খুব অনুতপ্ত এমন নয়। প্রতিবছর একবার প্রকাশিত হলেই বা কী এসে যায়। প্রশ্ন হল আমাদের বিপন্ন ও বিস্মিত করে এমন লেখা কোথায়।

২৯. ৩. ৯৪

দেরিদা-দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

কল্যাণ সেনগুপ্ত

২

দেরিদা-দর্শনের বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা ও জটিলতার যথার্থ রূপায়ন খুব সহজসাধ্য নয়। তবু এই প্রবন্ধে আমি অন্তত একটি রূপরেখা দিতে চেয়েছি। এই আশা নিয়ে—দেরিদার গভীর মননের কিছুটা ইঙ্গিত হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, দেরিদার অনুপ্রবেশ সাহিত্যে যতটা দর্শনে ততটা নয়। বরং বলা যেতে পারে বিদগ্ধ সাহিত্যিক মহলই তাঁকে আবিষ্কার করেছে, নিয়ে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই মহলের হাতেই তাঁর উজ্জ্বল উদ্ধার—এই মহলই তাঁর বিভিন্ন রচনার বা তাঁর বিনির্মাণ কৌশলের মধ্যে দেখতে পেয়েছে এক নবতর সাহিত্য তত্ত্বের উজ্জ্বল দিগন্ত। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মহলে তাঁর আবেদন তেমন নাড়া দিতে পারেনি। কেন এই বৈষম্য? কেন দার্শনিক যেখানে বিমুখ, সাহিত্যিক সেখানে তাঁর প্রসন্ন মুখ ফেরান দেরিদার দিকে? অথচ দেরিদা তো দর্শন বিষয়েই কথা বলেছেন। বস্তুত তাঁর বিনির্মাণ শুরুই হয়েছে পাশ্চাত্য দার্শনিক হুসার্ল-এর বিরুদ্ধে এক তীব্র-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তাঁর রচিত **স্পিচ অ্যান্ড ফেনোমেনা, অফ গ্রামাটোলজি, মার্জিনস অফ ফিলোসফি**—সবই দর্শন বিষয়ক। তবে সাহিত্য অনুরাগীর মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করেন কোন গুণে?

হয়তো এর একটি কারণ—দেরিদার ঝোঁক যত না বক্তব্য বিষয়ের দিকে তার চেয়েও বেশি প্রকাশভঙ্গির উপর। কী বলব তার চেয়েও তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পায় কেমন ভাবে বলব। বিষয়ের চেয়েও শৈলীর প্রতি তাঁর অধিকতর মনোযোগ। বলা বাহুল্য, দেরিদা তাঁর টেক্সটে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা প্রচলিত অর্থে সাধারণ ভাষা নয়। কিন্তু কোনো একটি টেক্সটের শব্দ চয়ন স্থায়ী বা আবদ্ধ লৌকিক ভাষার অনুগামী কিনা সেটাই বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে সেই লৌকিক ভাষার মধ্যে এমন কোনো পথ তৈরি করা যায় কিনা যেখান দিয়ে নতুন ও অপরিচিত ভাষার অর্থও আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বস্তুত কবিরা এই কাজই করে থাকেন। তাঁদের বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের মধ্যে আমরা পরিচিত অর্থকেই নতুন ভাবে পাই। এ কথা দেরিদা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁর শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য, প্রকাশের বিশেষ কৌশল আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হলেও তার সুরটি আমাদের পরিচিত সাধারণ ভাষার আবহের মধ্যেই বাঁধা আছে। সিম্বলিস্টদের মতো তাঁর কাছেও ভাষা তার নিজস্ব দীপ্তিতেই আলোকিত। হয়তো এই কারণেই প্রচলিত দার্শনিক ভাবনা থেকে তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। দার্শনিকরা সাধারণত শব্দ যোজনাকে অর্থ প্রকাশের

সঙ্গে অন্বিত করেন। কিন্তু দেরিদা এই শব্দার্থ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিশেষ ভাবে যা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হচ্ছে ভাষার নিজস্ব সংগীত ও ধ্বনি, নিজস্ব শক্তি ও বিন্যাস। ভাষা তাই তাঁর কাছে দি প্লে অফ সিগনিফায়ার্স—যেখানে শব্দের বিন্যাস ধ্বনি বা সংগীত নির্ভর। কবিরা এই ভাবেই তাঁদের শব্দ নির্বাচন করেন। ভাষার এই অন্তর্লীন সংগীতময়তাকে দেরিদা প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই হয়তো সাহিত্যমহল তাঁকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু ভাষাকে তার নিজস্ব শক্তিতে দেখার এই প্রবণতা, শৈলী, অচেনা আলোয় ভাস্বর শব্দ দিয়ে ইস্থেটিক ম্যাজিক তৈরি করার এই সব ঝোঁক কি আমাদের সত্য থেকে সরিয়ে দেয় না, যে সত্য দার্শনিকের অন্বিষ্ট বস্তু, যে সত্যকে প্রকাশ করার মধ্যেই তিনি ভাষার বিশেষ উদ্দেশ্যটি খুঁজে পান? এ কি রেটোরিকাল এফেক্টের কাছে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া নয়? প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ভিটগেনস্টাইনও কখনো-কখনো ভাষা ব্যবহারে এই সূক্ষ্ম চাতুর্য, এই নাটকীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনো-কখনো বক্তব্য থেকে বচন-কুশলতা, বিমূর্ত দার্শনিক ভাবনা বা বিষয় থেকে প্রকাশ নৈপুণ্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন :

"What I'm doing is also persuasion. If someone says : 'There is not a difference' and I say : 'There is a difference' I am persuading. I am saying 'I don't want you to look at it like that'." (**লেকচার্স অ্যান্ড—কনভারসেসনস্ অফ ইসথেটিক্স, সাইকোলজি অ্যান্ড রিলিজিয়াস বিলিফ**)

ভিটগেনস্টাইনের এই বক্তব্যের মর্মার্থ এই : কোনো দার্শনিক ভাবনা যথার্থ বা সত্য কিনা সেটি তেমন বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে বাগ্‌ভঙ্গির কারুকাজ, চাতুর্য ও নাটকীয়তাকে আশ্রয় করে সেই ভাবনাটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় কিনা; এমন করে পরিবেশন করা যায় কিনা যাতে সেই ভাবনা পাঠককে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে। সত্য বড় নয়, বড় হচ্ছে ভাষার যাদু। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কথা দার্শনিককে মুগ্ধ করতে পারে না। এবং তারই প্রতিফলন দেখেছি প্লেটোর এই বিশিষ্ট বয়ানে :

"The poetic-workman dabs on certain colours by using the words and phrases of the various arts.....so that others, as ignorant as himself, taking their view from words, think he is speaking magnificiently...so great is the natural charm in this manner of speaking" (**রিপাব্লিক, বুক ১০**)।

কিন্তু দার্শনিকদের এই ধরনের আপত্তির বিরুদ্ধে দেরিদার স্বপক্ষে দু-একটি কথা যে বলার নেই তা নয়। দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য নিতান্তই অসার, বা দর্শনের কোনো গুরুত্ব নেই এমন দাবি তিনি করেননি। কিন্তু সব কিছুর আগে প্রয়োজন যে ভাষায় দার্শনিক কথা বলেন সেই ভাষার গভীরে প্রবেশ করা, খুঁজে দেখা তার শক্তি কোথায় নিহিত আছে। দেরিদা শুধু এইটুকুই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

দেরিদার বিনির্মাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য মুখের ভাষার (speech) চেয়ে লিখিত ভাষাকে (writing) বেশি গুরুত্ব দেওয়া। আমরা জানি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ঘরানায় কথাকে লেখার চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কথা বলার সময় বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই উপস্থিত থাকে। বক্তা, শ্রোতা ও কথার মধ্যে কোনো স্থান বা কালের দূরত্ব নেই। বক্তা জানে সে কথা বলছে এবং একই সঙ্গে শ্রোতা জানে বক্তা তার সঙ্গে কথা বলছে। বক্তা কী বলতে চায়, প্রকাশ করতে চায় কোন্ অর্থ, শ্রোতার কাছে তা পরিস্ফুট করবার জন্য সে নিজেই উপস্থিত থাকে। শ্রোতার বুঝতে অসুবিধে হলে বক্তা নিজেই সে অসুবিধা দূর করে দিতে পারে। কিন্তু কোনো লেখা যখন আমরা পড়ি তখন লেখক অনুপস্থিত থাকেন। সুতরাং অনেক সময় তাঁর অভিপ্রায় ধরতে না পারলে সেটি ধরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে পাওয়া যায় না। এই জন্য প্লেটো তাঁর **ফিদ্রাস** গ্রন্থে বলেছেন, লেখা কথার চেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা লেখক তাঁর অভীষ্ট অর্থটি পৌঁছে দেবার জন্য পাঠকের কাছে থাকেন না। প্লেটো বা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই বিশ্বাসের অনুরণন আমাদের দেশেও দেখতে পেয়েছি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী বা ব্যাকরণ কথ্য সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির উপর নির্ভর করেই রূপায়িত হয়েছে। বেদে, আরেয় আরণ্যকে বলা আছে, যদি কেউ মাংস খায়, বা মৃতদেহ দেখে, অথবা লেখায় ব্যাপৃত থাকে তবে সে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকারী নয়। মুখের ভাষার প্রতি এই অবিচলিত আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেরিদার বিপরীত ঝোঁক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কথা ও লেখার এই দুটি বিপরীত প্রান্তের শেষেরটি দেরিদার বেছে নেওয়ার এই বিনির্মাণ নিছক এক চমক সৃষ্টি করার জন্য নয়। এর পিছনে আছে এক গভীরতর যুক্তি। কোনো একটি শব্দের যে অর্থ সেটি সর্বক্ষেত্রেই এক হবে। সুতরাং কোনো বক্তা সেই কথাটি বলার জন্য যদি উপস্থিত নাও থাকেন, যদি তাঁর অভিপ্রায় আমরা না জানতে পারি তবু সেই কথাটির অর্থ হানি ঘটবে না। অর্থাৎ শব্দের অর্থ বুঝতে বক্তার সান্নিধ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলেই তার শব্দের অর্থও আমাদের আয়ত্তে আসবে। লিখিত ভাষা (writing) এই সত্যটিকে তুলে ধরে বলেই দেরিদা একে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২

উপরের আলোচনা থেকে হয়তো এ কথা উঠে আসে যে দেরিদা তাঁর বিনির্মাণে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে চান। কিন্তু কেমন ভাবে তৈরি হবে সেই সেতু? এর অর্থ কি এই—সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে বিভাজন রেখা তিনি একেবারে তুলে দিতে চান? প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক জোনাথন কুলার অবশ্য তা মনে করেন না। তাঁর মতে, বিনির্মাণের উদ্দেশ্য সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য একেবারে তুলে দেওয়া নয়, বরং তাদের সাযুজ্যকে নতুন ভাবে দেখা। হাইডেগারের মতো কুলারও দার্শনিক (thinkers) ও কবির (poets) মধ্যে একটি তফাত রাখতে চান। এবং তারপর বলতে চান, এই স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে এক গভীরতর পারস্পরিক নির্ভরতা

আছে সে কথা উপস্থাপিত করাই বিনির্মাণের উদ্দেশ্য। এই মেলবন্ধন তুলে ধরতে গিয়ে কুলার বলেছেন, যে কোনো দার্শনিক রচনাই 'fictive rhetorical construct' : সেখানে প্রাণ পায় চিন্তনের এক বিশেষ রীতি, এক বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি, কল্পনার এক বিশেষ অবয়ব। অপরদিকে কোনো সাহিত্যরচনা পাপ (evil), পুণ্য (good), নিত্য (eternity), অনিত্য (temporal) ইত্যাদি দার্শনিক অনুধ্যানকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। অবশ্য সংরক্ষণশীল দার্শনিক বা কবির কাছে এ ধরনের কথা অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে ওঠে। সংরক্ষণশীল দার্শনিক মনে করেন তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ, কবিতার ভাষার ধারে-কাছেও তা আসেনা। তিনি মনে করেন, তাঁর রচনা কোনো অর্থেই 'fictive rhetorical coustruct' নয়। অন্যদিকে সংরক্ষণশীল কবি মনে করেন, তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত সংগীত কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ভারে নিপীড়িত নয়। সুতরাং তাঁরা যখন শোনেন যে তাঁরা পরস্পরের কাছে ঋণী তখন স্বভাবতই তাঁরা শিহরিত হয়ে ওঠেন।

তবে দার্শনিক রিচার্ড রোর্টির মতো আমারও মনে হয়, কুলারের ব্যাখ্যা তেমন সংগত নয়। আমার মনে হয়, দেরিদা দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে সীমারেখাটিই তুলে দিতে চান। তাঁর কাছে দর্শনও সাহিত্য। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জিওফ্রি হার্টম্যান বলেছেন :

"Is not literary language the name we give to a diction whose frame of reference is such that the words stand out as words (even as sounds) rather than being at once, assimilable meanings ?" অর্থাৎ হার্টম্যানের মতে, ভাষাকে নিছক প্রচলিত অর্থের বাহন হিসেবে না দেখে সাহিত্যিক ভাষার নিজস্ব শক্তি উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই সাহিত্যিক মুহূর্ত দর্শনেও আসে যখন দার্শনিকের ভাষা বা প্রত্যয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংশয় ঘনিয়ে আসে। তখন আবার ভাষার দিকেই তাকাতে হয়—পুরনো শব্দের মধ্যে খুঁজতে হয় নতুন অর্থ, অথবা ব্যবহার করতে হয় নতুন শব্দ। এই সময়ে শব্দ নিছক শব্দ হিসেবেই—দাঁড়িয়ে থাকে—কেননা তার সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা তখনও তৈরি হয়নি। সুতরাং দর্শনে এই নতুন ভাষা ব্যবহারের অবকাশ সব সময়ই থাকে—এমন ভাষা যা নতুন বলেই তা দিয়ে প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তেমন ধরা যায় না, এমন ভাষা যার মধ্য দিয়ে ক্রমশই ধরা দিতে থাকে এক নতুন দার্শনিক বিকল্প।

অবশ্য দর্শন বলতে যদি দার্শনিকরা যা বুঝে এসেছেন তাকেই বোঝায় তবে এই সাহিত্যিক মুহূর্ত একেবারেই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেরিদা তাঁর **মার্জিনস অফ ফিলোসফি**তে বলেছেন, দার্শনিকের স্বপ্ন এক সম্পূর্ণ ও শাশ্বত ভাষার যার, প্রত্যয়গুলি অপরিবর্তনীয়। আর এই প্রত্যয়গুলি অপরিবর্তনীয় বলেই এর বিরুদ্ধে সংশয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। বলা বাহুল্য, দেরিদা কিন্তু দার্শনিকদের ব্যবহৃত তথাকথিত নিত্য প্রত্যয়ের বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন। তাঁর মতে অনৈতিহাসিকের

প্রতি দার্শনিকের এই অবিচলিত বিশ্বাস তেমন দৃঢ়ীভূতক নয়। দর্শনের কোনো কোনো বই যখন আমরা পড়ি তখন এক বিশেষ দার্শনিক সংস্কারের প্রভাবে আমরা একটি বক্তব্যকেই মূলে বা স্থায়ী বলে মনে করি। কিন্তু বইটি পড়তে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে এমন কথাও পাই যা সেই মূল বক্তব্যের বাতাবরণ ক্ষুণ্ণ করে। দেরিদা এই মার্জিন বা ভিন্ন সুর অথবা রোটির্র ভাষায়, 'literary openness' এর দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মার্জিন বা ভিন্ন সুর আবার নতুন করে, নতুন ভাষায় সাজানো যায়। তখন বইটির পট পাল্টে যায়—ফুটে ওঠে নতুন ছবি। এবং এর অর্থ দার্শনিকের কোনো কিছুকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করার বিশেষ প্রবণতার বাইরে চলে আসা। দেরিদা এই ভাবে নতুন করে লেখারই পক্ষপাতী। কিন্তু এর একটি সংকট আছে। মার্জিনের উপর জোর দিয়ে রূপান্তরহীনতার ঘেরাটোপে বন্দী দর্শনের কথা তিনি ভুলে যেতে পারেন যেমন করে নির্যাতন-মুক্ত দাস তার অত্যাচারী প্রভুকে ভুলে যায়। যদি তাঁর মনোভাব এই হয় তবে বলতে হয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু তাহলে দেরিদার লেখার প্রধান ভরটিই আর থাকেনা। কারণ যদি কেউ দর্শন সম্বন্ধেই কথা বলে থাকেন, যদি কেউ থাকেন দর্শনই যার মুখ্য উপজীব্য—তবে দেরিদার নামই মনে আসবে। আবার অন্য দিকে দেরিদা যদি অপরিবর্তনের প্রতি দার্শনিক ঝোঁককে আঘাত দিতে চান তবে তিনি যখন বলেন 'total, closed vocabulary' সম্ভব নয় তখন, সেটি-কেও এক পরিবর্তনহীন, প্রশ্নাতীত সত্য বলে গণ্য করতে হবে। তাহলে মার্জিনের আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। দেরিদা যে এই সংকট সম্পর্কে অবহিত নন তা নয়। তাই এই সংকট সমাধানে তিনি **মার্জিনস্ অফ ফিলোসফি**তে বলেছেন :

"....a new writing must weave and interlace these two motifs of deconstruction which amounts to saying that one must speak several languages and produce several texts at once." অর্থাৎ তিনি বলতে চান আমরা একই সঙ্গে দর্শনের ভিতরে থাকতে পারি এবং বাইরে আসতে পারি। দর্শনের ভিতরে থাকার অর্থ—তার ব্যবহৃত প্রত্যয়কে বোঝার চেষ্টা এবং তার অসংগতিকে তুলে ধরা। এবং একথা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে এই বাদ-প্রতিবাদ, যুক্তি ও বিরুদ্ধ যুক্তি তখনই সম্ভব হয় যখন দার্শনিক যে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ব্যবহার করেন তার অংশীদার হই আমরা। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এই দার্শনিক আবহাওয়ার বাইরে এসে নতুন ভাষা ও রীতিতে তুলে ধরতে পারি জগৎ ও জীবন বিষয়ে অন্য বিকল্প, অন্য দিগন্ত—প্রচলিত ভাষা ও যুক্তি দিয়ে যাকে বোঝা যায় না, কিন্তু যার অমোঘ স্বভাব ও আকর্ষণে প্রাণিত হয়ে উঠি আমরা। এই কথাটি আরও একভাবে বলা যায়। যে কোনো দার্শনিক যুক্তি ভাষা দিয়েই প্রকাশিত হয়। এবং সেই ভাষার অংশীদার না হলে দার্শনিক যুক্তিটিকে বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দর্শনের ঐতিহ্য যে ভোক্যাবিউলারি লালন করে তাকে বুঝতে গেলে সেই

ভোক্যাবিউলারির বাইরে আসা চলে না। কেননা, বাইরে এলেই দর্শনে প্রত্যয়ের যে যুক্তির কাঠামোটি তৈরি হয়েছে তাকে ধরা আর সম্ভব হয় না। কথাটির অর্থ এই যে দার্শনিক যে প্রত্যয় বা যুক্তি ব্যবহার করেন তাকে বোঝা বা তাকে খণ্ডন করা—এসব তখনই অর্থবহ হয় যখন দার্শনিক যে ভাষা ব্যবহার করেন তার সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সংযোগ থাকে। কিন্তু তা হলে দর্শনের ট্র্যাডিশনের বাইরে আসা কী করে সম্ভব হয়—যা দেরিদার অন্যতম অভিপ্রায়? এই সংশয়ের উত্তরে দেরিদার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ ইঙ্গিতবহ :

"To make enigmatic what one thinks one understands by the words 'proximity' 'immediacy'.....is my final invention in this book." (**অফ গ্রামাটোলজি**) অর্থাৎ দেরিদা বলতে চান যুক্তি দেওয়াই ভাষার একমাত্র কাজ নয়। ভাষা দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায়—যেমন আদেশ দেওয়া, অনুরোধ করা এমনকি কৌতুক করাও। যদি তাই হয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই। দর্শনে ব্যবহৃত প্রত্যয়ের কাঠামোটি যে যুক্তি-শৃঙ্খলে গড়ে ওঠে তাকে খণ্ডন করতে গেলেও সেই দর্শনের ট্র্যাডিশনের মধ্যেই থাকতে হয়। দেরিদা কখনো-কখনো এই কাজ করেছেন। আবার এই ট্র্যাডিশনের বাইরেও তিনি আসতে পেরেছেন যখন তিনি যে প্রত্যয়ের আবহে দার্শনিক পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছে তার অসারতা তুলে ধরেছেন বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ কৌতুকে। যার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটে হয়ে উঠেছে এই কথাই যে দর্শনের অপরিবর্তনীয় প্রত্যয় কাঠামোটি একটি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা। □

একটি আধা অ্যাকাডেমিক (হাফ হার্টেড) প্রবন্ধ

অজিত চৌধুরী

এক

একদল ছাত্র নোটবুক চাইছে, পাঠকের একাংশ মেডইজি।

সহজ করে শেষতম হালচালগুলো বলে দাও এটা—এটাই—যদি দাবি হয় কিছু পাঠকের, আমি তাদের সঙ্গে নেই। দুঃখিত। সাহেবরা লিখবেন, কিছু ঝকঝকে ভারতীয় সেগুলোকে পৌঁছে দেবেন ইউনিভার্সিটি এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট-গুলিতে, আর কিছু অসাধারণ মানুষ এইসব হট-কেক নিয়ে আসবেন সাধারণ মানুষের কাছে, বাংলায়, লিট্‌ল ম্যাগাজিন মারফৎ, এই যদি বাস্তব হয় তবে বাংলার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের মৃত্যু হোক। লিট্‌ল ম্যাগাজিন অ্যাকাডেমিসিয়ানদের তল্পিবাহক নয়। ইংরেজিতে লিখে—এবং কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণ করে—আমার বেশ নামডাক হয়েছে, এইবার আমজনতা আমার নাম জানুক এই মনে করে লেখক লিখল, পাঠক গিলল হালফ্যাশনের দর্শন (অর্থাৎ পশ্চিমী মতাদর্শগত প্রভুত্ব) পৌঁছে গেল বৈঠকখানায়, কিচেনে, হাউসওয়াইফরাও জেনে গেল কার কটা পাবলিকেশন, এই যদি লেখা হয়—লেখা যদি শুধুই পেপার হয় যা আজ ওজনদরে মাপা হবে এবং কাল কলেজ বাথরুমের দেওয়ালে শ্লোগান তবে নচিকেতা কী চেয়েছিল ?

আসল কথা রুখে দাঁড়ান যান্ত্রিক এবং উদ্ধত অ্যাকাডেমিসিয়ানদের বিরুদ্ধে। সত্তরের দশক থেকে ওদের বড় বাড় বেড়েছে—লিট্‌ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের লম্বা কিউ পড়েছে ওদের বৈঠকখানায় ঢোকার জন্য : একটা লেখার অনুবাদ দেবেন, স্যার ? সেই লেখা লেখ যা অ্যাকাডেমিক জার্নাল ছাপতে পারে না। লিট্‌ল ম্যাগাজিন অ্যাকাডেমিক জগতের এক্সটেনসন নয় ; অ্যাকাডেমিক জগতের কঠিন কথাগুলো—কোনো এ্যাকাডেমিক জগতের মুভমেন্ট (দেশী / ফোয়েন)—সহজ করে অর্থাৎ ছোট ও সরলীকৃত করে, বলা নয়। লিট্‌ল ম্যাগাজিন আইডিয়া দেবে, অ্যাকাডেমিসিয়ানরা ইংরেজিতে টুকবে, পেপার করবে, কনফারেন্স করবে (মোড অফ প্রোডাকশন বা বেঙ্গল রেনেসাঁস ডিবেট)। সাহেবরা এখনই যা কিনবে না অ্যাকাডেমিসিয়ানরা তা ভাবে না—অ্যাকাডেমিক পেপার হল উজ্জ্বল চাকরবাকরদের লেখা। ভাঙ, ভাঙ, অ্যাকাডেমিক ডিসকোর্স ভাঙ। লাল পতাকা হাতে নিয়ে যারা ইউনিভার্সিটি ভাঙতে গিয়েছিল তারা তো স্টেজ ছেড়ে চলে গেছে বহুদিন। তবুও তো খসে পড়ে ইট, বালি, চুন, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির শরীর থেকে।

দুই

অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ লেখার একটি নির্দিষ্ট (বাঁধাধরা, গতানুগতিক) ছক আছে।

লেখক একটি আলোচনা প্রবাহে—ডিসকোর্সে—নিজেকে স্থাপিত করেন, ডিসকোর্সের অভ্যন্তরে প্রবেশপথগুলি নির্ধারণ করেন, ঢোকেন, আলোচনায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করেন : ইন্টারভেন করেন। 'এই ছিল,—আমি এই করলাম' অর্থাৎ অ্যাকাডেমিসিয়ান একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন (তৈরি করেন), তার সমাধান করেন—একই সঙ্গে প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা।

লেখক কি এমন প্রশ্ন করতে পারেন যার উত্তর—একটি ফুলপ্রুফ উত্তর—তাঁর জানা নেই। লেখকের মনে একটি প্রশ্ন এসেছে, তিনি উত্তর খুঁজছেন, অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছেন, হোঁচট খাচ্ছেন—এটিই একটি প্রবন্ধের যথেষ্ট উপকরণ হতে পারে না ? শুধু প্রশ্ন করা—প্রবলেম ফর্মুলেট করা—এটিই কি কোনো প্রবন্ধের যথেষ্ট উপাদান নয় ?

পণ্ডিতেরা—যারা বিভিন্ন কমিটির এবং বোর্ডের মেম্বার, মানুষের যোগ্যতার নির্ধারণ করেন, ইন্টারভিউ নেন, থিসিস এগজামিন করেন, জার্নালগুলির রেফারী—বলবেন, না। এমন প্রশ্ন তুমি করতে পার না যার উত্তর তুমি জান না। যার অর্থ দাঁড়ায় : এমন প্রশ্ন তুমি করতে পার না যার উত্তর আমি জানি না। অর্থাৎ প্রশ্ন করতে পার না। এক প্রশ্নহীন এবং জিজ্ঞাসাবিহীন উত্তরপত্রের নাম অ্যাকাডেমিক পাবলিকেশন—কেউ কখনও একটা মডেল দিয়েছিল, তুমি শুধু তাতে ফুটনোট যোগ করে যাবে। আমার ভদ্রবন্ধু বলেছিল যে তার (ক্ষুদ্র) সাফল্যের মূলে আছে সাকসেসফুল—অর্থাৎ প্রভাবশালী ক্ষমতাবান—প্রফেসরদের এমন প্রশ্ন করার ক্ষমতা যার উত্তর তিনি জানেন অথচ ক্লাউড জানে না। অথচ প্রশ্ন করার এই খেলা তো চালিয়ে যেতেই হবে তা না হলে ভগবান বুদ্ধ—যিনি জন্মগ্রহণ করেন শুধুই উত্তর দেবার জন্য—কেমন করে কথা বলবেন।

অতএব আধুনিক গবেষকের প্রথম পাঠ হল মন থেকে সকল জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল মুছে ফেলা—চারিপাশের রিসার্চ পেপারগুলো যেন অফিসের ফাইলমাত্র। তাকে চটপট কিছু প্রশ্ন ভাবতে হবে যার কিছু সহজ এবং দ্রুত উত্তর আছে এবং অবশ্যই প্রশ্নোত্তরগুলি তার সুপারভাইজারের আয়ত্তে। চটপট : কেননা সব রিসার্চপেপারই হল তেলেভাজা বা গণিকার শরীর যা ঠাণ্ডা হলে কেউ কেনে না।

অতএব সেই রিসার্চ ইনপুট কেন যা তুমি আউটপুটে পরিণত করতে পার চটপট এবং যার মার্কেটে একটি চাহিদা আছে। মনে রেখো : রিসার্চ প্রোডাক্টটি মার্কেটেবল হতে হবে—নতুবা তার কোনো মূল্য (ভ্যালু) নেই।

মার্কেটেবল করার ক্ষেত্রে প্রোডাক্টটির গুণ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করার আছে। যেমন : গবেষকের কুল ও গোত্র, কোন স্কুল এবং কলেজে পড়েছে সে, তার নিবাস, তার পিতা মাতা, তার প্রেমিকা কেমন—কলেজ স্ট্রিটের লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকেরাও আজকাল চাইছেন যে তাঁর লেখকদের প্রেমিকারা স্মার্ট

এবং লাস্যময়ী হোন। সফলতর পুরুষের নারীটিকে উচ্চকুলোদ্ভবা এবং সফলতমদের ক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গিনী হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আর এইসব ভীড়ে সেই ছোট শিশুটি হারিয়ে যায় যে তার পিতাকে শুধু জিজ্ঞাসা করত "কেন ?" "আর একবার যদি কেন বলিস তো জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেব তোকে", বাবা বলেছিল। ছোট্ট শিশু নির্বিকার আবারও জিজ্ঞাসা করে "কেন ?" ওরা সবাই জানালা দিয়ে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে বলছে, দেরে ছেলে, একটুখানি শক্তি ধার দে, একবার জানালার শিকগুলো ধরে এসটাবলিশমেন্টের দাদাদের এবং দাদাদের ঘিরে নেচে যায় থার্ডকিড যারা তাদের বলি, "কেন ?"

এই কথাগুলি, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, তোমাদের ইনোসেন্স ভাঙছে (তোমাদের মুখের মাংস সংকুচিত হচ্ছে)—যেন বালক-বালিকারা প্রথম জানছে তাদের জন্মর গুপ্ত বৃত্তান্ত, পিতামাতার পাপ। আধুনিক লেখকের একটি গ্রাম্যতা ছিল : আর সকল কিছুই যখন পণ্যর নিয়ম দ্বারা চালিত, সে, লেখক, পণ্যজগতের নিয়মের ঊর্ধ্বে। অথচ এই বাজার তার লেখা ছাপছে, তাকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে এবং নারী—লেখক ভান করে যে সে বাজারের নয়, সতী। পোস্টমডার্নিজম লেখকের ঘোমটা খুলে নিল : তুমিও আর সকলের মতো—বাজার থেকে জাত, আবার বাজারেই ফিরে আস। লেখা এক খেলা মাত্র, ম্যাজিক। মুখোস কখনও কারও মুখ হয় না এই বলে একটানে ডামির মুখোস খুলে দিয়েছিল ধর্মেন্দ্র, গুড্ডি ছবিতে। লেখক পারেনি।

পোস্টমডার্নিজম খুলে দিল।

অতএব মিথ্যা সতী সাজার ভান কোর না। আসলে সতীত্ব বলে কিছু নেই বোঝাটাই হল সচেতনতা। বাজারকে দেখ, জান, বোঝ, শরীর দিয়ে অনুভব কর, উপভোগ কর, জবালা মায়ের সন্তান তুই, কিসের ভয়, দেখ তো, তোর মা কতবার শুলে পরপুরুষের সঙ্গে, তবু সে কেমন ইনোসেন্ট—কুড়িয়ে পাওয়া মা আমার, জবালা মা : ভারতবর্ষ।

কমোডিটির নিয়ম জান, শেখ, শেখাও, কমোডিটির সঙ্গে ফ্লার্ট কর, গরম থাকতে থাকতে বাজার থেকে তুলে নাও রিসার্চ টাপিকগুলি যাতে বাজারে বিক্রি হয়, ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দাও—তোমার কথা। বাঁচবার জন্য এইসব তোমাদের শিখতে হবে—লেখাপড়া শেখার চেয়ে এই শেখাটা আরও বড়। শিখতে হবে কেমন করে মধ্য বয়সী সাকসেস-ফুল মানুষদের ইমপ্রেস করতে হয়। 'স্যার, আপনি খুব ভাল' বললেই চলবে না। এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে বসের সঙ্গে কথা বলতে সাহায্য করবে। আস্তে আস্তে তুমি শিখে যাবে কেমন করে মেয়ে বসদের (রাণীর) সঙ্গে কথা বলতে হয়, তার শরীরের দিকে তাকাতে হয়। মনে রাখার : অসংখ্য পার্টির মাতালদের ও লম্পটদের মাঝখান দিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানো আপারক্লাস মহিলারা সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করেন বাঙালের নিষ্পাপ অকপট (অকপাট) চাউনি। সফলতা তারই জন্য যে যুবক স্থূলকায়া বসপত্নীর সঙ্গে পার্টিতে নাচতে পারে অপটিমাম বেসামাল : তুমি যাকে

দেখছ, স্পর্শ করছ সে রাণী—তোমার যুবকের চোখ শুধু রাণীকে কনফিডেন্স দিয়ে যাবে যে সে নারী।

আবার প্রফেসরের পিঠ চাপড়ানো এবং বসপত্নীর মিষ্টি হাসি মায়া মাত্র। লক্ষ্য: কমোডিটিটিকে ফরেন মার্কেটে বিক্রি করা। সাহেবদের বাজনায় নাচতে শেখ—সাহেবরা সহজে খায় এমন কিছু (ম্যাজিক, মিস্টিসিজম, ডেভলপমেন্ট ইকনমিক্স) ভাব, লেখ, প্রচার কর—আর সবই মায়া। কলোনিয়াল কালচারে তিনিই লেখক যিনি কোনো না কোনোভাবে সাহেবদের অনুগ্রহ পেয়েছেন। কলার তুলে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের কলার চেপে ধর, দেখবে কলারের তলায় শিকলের দাগ। মাঝে মাঝে সুমন চট্টোপাধ্যায়ের গান শুন "সাহেব, তোমার বাজনায় আমি গাইছি, ভেবো না তুমি আমায় কিনছ"। (এটাই তো সুমনের গান, তাই না?)

আজ এই বিংশ শতাব্দীর শেষে মার্কেটের—অর্থাৎ পশ্চিমী ডিসকোর্সের—বাইরে কোনো স্বাধীন ডিসকোর্স হতে পারে না। যারা এই দাবি করে তারা নিজেদের সঙ্গে ছলনা করে—বা আমাদের সঙ্গে। সেইডের পশ্চিমী ওরিয়েন্টাল ডিসকোর্সের ক্রিটিক পশ্চিমী ওরিয়েন্টাল ডিসকোর্সকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় মাত্র, যেখানে কালোমানুষেরাই সাহেবদের হয়ে ওরিয়েন্টাল ডিসকোর্স লিখছে। নিজেকে ভৃত্যরূপে—চেনো, নিজের জায়গা ভুল কোর না, ডমিন্যান্ট—অর্থাৎ পশ্চিমী ডিসকোর্সের মার্জিনে নিজেকে স্থাপিত কর, ওদের জেরা কর, মার্জিনে নিয়ে আস, খাদের কিনারায়, তখন বিদ্যুৎ চমকাবে, মেঘ ডাকবে, দেখ তো শুনতে পাও কিনা পিতামহর কণ্ঠস্বর: দ, দ দ।

তিন

আসলে আমরা যারা ভৃত্য খুব বেশি দর্শন লেখার প্রয়োজন বোধ করি না। শাসকদের শাসন কায়েম করার জন্য দিস্তের পর দিস্তে মিথ্যে কথা লিখতে হয় যার নাম দর্শন। আমাদের এই দায় নেই। আমরা পশ্চিমী লেখাগুলিকে জেরা করব, বিকৃত করব, আর ফাঁকে-ফাঁকে গুঁজে দেব আমাদের কথা। ওটাই হবে আমাদের লেখা। আমি এক বিখ্যাত পশ্চিমী দর্শনের প্রবন্ধ—ডেরিডার জোনস হপকিন্সের প্রবন্ধ যা পোস্ট স্ট্রাকচারালিজমের জন্ম দেয়—আলোচনা করব এবং তার প্রান্তে আমার কয়েকটি কথা বলব—একদম শেষে। তার আগে—ডেরিডা। আমার কথাগুলি বলব লুকিয়ে-চুরিয়ে। যেমন ডেরিডার বিরুদ্ধে আমি গীতা পোজিট করব, কিন্তু নাম করব মার্কস ও ফ্রয়েডের। আজ এইভাবেই প্রবন্ধ লিখতে হবে: সাদাকালো পাবলিক কনসাসনেসে মার্কস, ফ্রয়েড আছে; গীতা, উপনিষদ নেই। আমাদের কালচার কত ভাল আমি সাহেব ও সাহেবচাটা মানুষগুলোকে বোঝাতে যাব না। আসল কাজ: কথাটা শোনানো, তা সে যে ভাবেই হোক না কেন। আমার কথা আমার মতো ভাবে আমি সকলকে শোনাব না—কেননা কথাগুলি সূর্যালোকে পড়া মাত্র শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে। আমার কথা বলব আমি চুপিচুপি, বন্ধুদের।

মাস-কনসাম্পশনের জন্য কথাগুলি অনিবার্যভাবে বিকৃতভাবে অর্থাৎ পশ্চিমী মোড়কে রাখছি।

অতএব, ডেরিডা।

ডেরিডার ডিকনস্ট্রাকশন হল সব ধরনের স্ট্রাকচারড আলোচনার—স্ট্রাকচারালিজমের—বিরুদ্ধে এক জেহাদ, বিদ্রোহ। ডেরিডা তার 'স্ট্রাকচার, সাইন অ্যান্ড প্লে' প্রবন্ধটিতে এই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেটা ছিল ১৯৬৬ সাল।

তখন স্ট্রাকচারালিজমের হাওয়া বইছিল। স্ট্রাকচারালিস্টরা সাবেক হেগেলীয় এবং মার্কসীয় ধারার আলোচনার ঘরানাগুলো একের পর এক ভাঙছেন, নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। আদিপিতা : সসুর। এই নামগুলো বাতাসে ভাসছে : সসুর, ফ্রয়েড, লেভি স্ট্রাউস, অ্যালথুসার। অ্যালথুসার মার্কসিস্ট স্ট্রাকচারালিজম প্রবর্তন করেছেন—মার্কসীয় ডায়ালেকটিক হেগেলীয় ডায়ালেকটিকস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একটা ব্রেক। ডেরিডা বললেন : যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন—যাহা হেগেল, তাহা স্ট্রাকচারালিজম। শুধু কতকগুলো নাম—ক্যাটিগরী—বদলে বদলে আসছে। দর্শনশাস্ত্র শুধুই তার পোশাক বদলায়।

স্ট্রাকচারালিজম নাম থেকে একটা কথা স্পষ্ট—যে স্ট্রাকচারালিজম একটা ছকের কথা বলে। হেগেলের দর্শনের এক ছক ছিল ; স্ট্রাকচারালিস্টদের আর এক ছক। তবুও ছক। ডেরিডা বললেন যে দর্শনকে, কোনো আলোচনাকে এক নির্দিষ্ট ব্যর্থহীন, বাঁধা ছকে ধরা যায় না। প্রতিপাদ্যটিতে বারুদ ছিল।

হেগেলীয় দর্শন এক **সমগ্রের** কথা বলে যার **অংশ** রূপে মানুষ (রাষ্ট্রের অংশরূপে নাগরিক/বাজারের অংশরূপে মালিক ও শ্রমিক)। হেগেলীয় দর্শন একটি ধারণার মধ্য দিয়ে এই সমগ্রকে প্রকাশ করে যার নাম ইউনিভার্সাল। ইউনিভার্সালের উৎস থেকে অংশরূপে পার্টিকুলারেরা প্রবাহিত হয় (হেগেলীয় মার্কসবাদে : অর্থনৈতিক ভিত থেকে উপরিকাঠামো—রাজনীতি, সংস্কৃতি—বেরিয়ে আসে)। ইউনিভার্সাল, অতএব, একটি কেন্দ্র বা সেন্টার যা পার্টিকুলারগুলিকে ধরে রাখে।

স্ট্রাকচারালিজম বলল : উৎস নেই, সেন্টার নেই। যেমন অ্যালথুসারের স্ট্রাকচারালিজম বলে যে রাজনীতি এবং মতাদর্শগত দর্শনের উৎস কোনো অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত নয়। উৎস নেই : প্রতিটি কাঠামোই অন্য কাঠামোগুলির দ্বন্দ্ব দ্বারা নির্ধারিত (ওভারডিটারমিন্ড)। বেস/গ্রাউন্ড/ইউনিভার্সাল/এসেন্স/সেন্টার নেই।

অথচ কাঠামোগুলি কোলাহল করে, মিলে-মিশে এক—সমাজ—হয়ে আছে, তার মানেই তো সেন্টার আছে, ডেরিডা বললেন। অ্যালথুসারের স্ট্রাকচারালিজম সমাজকে অনেকগুলি স্ট্রাকচারের স্ট্রাকচাররূপে দেখে। অর্থাৎ কোনো কিছু একটা আছে যা এই স্ট্রাকচারগুলিকে—অর্থাৎ অ্যালথুসারের আলোচনাকে—ধরে রাখে যা অ্যালথুসারের স্ট্রাকচারালিজম ব্যাখ্যা করে না। অতএব স্ট্রাকচারালিজমেও একটি সেন্টার

থাকে যা তার আলোচনার বাইরে। হেগেলের স্ট্রাকচারালিজম সেন্টারটিকে ধারণ করে ; স্ট্রাকচারালিজম তাকে বাইরে ঠেলে দেয়। অর্থাৎ সেন্টার থাকে।

ডেরিডা বললেন : সেন্টারটিকে বাইরে ঠেলার চেয়ে স্বীকার করে নাও না কেন যে আলোচনায় সব কিছু মিলবে না—কিছু বাইরে থাকবেই যারা তার চিহ্ন রেখে যাবে আলোচনাটিরই অভ্যন্তরে। আবার এই বর্জন এবং গ্রহণ তো সাবজেক্টই করে, তাই পুরো ব্যাপারটাই সাবজেকটিভ। কেন সাইন্স খোঁজ ?

ডেরিডা অবশ্য তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য অ্যালথুসারকে টেনে আনেননি, এনেছিলেন লেভি স্ট্রাউসকে।

আজকের স্ট্রাকচারালিস্ট সমাজবিজ্ঞানের উদ্‌গাতা লেভি স্ট্রাউস যিনি দেখিয়েছিলেন যে স্যাভেজদেরও মাইন্ড—মনন—আছে যা কাজ করে তার নিজস্ব পদ্ধতিতে, আধুনিক গর্বিত মানুষের চেয়ে ভিন্নতর, অনেক সময় উন্নততর, রূপে। লেভি স্ট্রাউস স্যাভেজের মনন এবং তার পরিবার ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটির কাঠামো ধরতে চেয়েছিলেন। স্যাভেজ ভাবে। তিনি দেখিয়েছিলেন যে কোনো ধ্রুব—ইউনিভার্সাল—নিয়মাবলী দিয়ে স্যাভেজের সংসার বোঝা যায় না। স্যাভেজের মনন এবং সংসারকে নিয়মাবলী দিয়ে ধরা যায় এই অর্থে তার মননের একটি স্ট্রাকচার আছে কিন্তু কোনো বিশেষ নিয়ম দিয়ে তাকে নির্দিষ্ট করা যায় না। শুধু একটি নিয়ম ছাড়া : ইনসেস্ট চলবে না। লেভি স্ট্রাউসের মতে যা ধ্রুব তাই প্রাকৃতিক ; এই অর্থে ইনসেস্টে বিধিনিষেধ প্রাকৃতিক। ডেরিডা এখানেই লেভি স্ট্রাউসকে খপ করে ধরছেন : কোনো কিছুই প্রাকৃতিক নয়, ইনসেস্টে বিধিনিষেধও একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার একটি (রক্তাক্ত) ইতিহাস আছে। প্রাকৃতিক ভাবে তো নয়ই, কোনো শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে মানুষ এই অবস্থানে পৌঁছয়নি। লেভি স্ট্রাউসের আলোচনা ইনসেস্টে বিধিনিষেধ এই সেন্টারটিকে ঘিরে আবর্তিত। ডেরিডা লেভি স্ট্রাউসের আলোচনার সেন্টারটিকে চিহ্নিত করলেন অর্থাৎ ভেঙে দিলেন ; দেখালেন : (লেভি স্ট্রাউসের) স্ট্রাকচারালিজমে একটি সেন্টার থাকে যা স্ট্রাকচারালিজম ব্যাখ্যা করে না। সবসময়েই কিছু না কিছু বাদ থেকে যায়।

ডেরিডা আর একটু বেশি বললেন : লেভি স্ট্রাউসের স্ট্রাকচারালিজম, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো স্ট্রাকচারালিজম নয়—বেজায় এম্পিরিকাল। কিছু তথ্যকে তিনি একটি কাঠামোতে সাজিয়েছেন। নতুন তথ্য এল—কাঠামোটিও বদলে গেল। কোনো তাত্ত্বিক অবস্থান থেকে কাঠামোটিকে তিনি বের করে আনেননি। তাই লেভি স্ট্রাউস যখন বলেন যে স্যাভেজের মননের এবং সংসারের অসংখ্য কাঠামো হতে পারে, প্রতিপাদ্যটির কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকে না।

এখানেই ডেরিডার ইন্টারভেনশন : নিয়মাবলীর কাঠামো অসংখ্য—অসীম—হতে বাধ্য কেননা একটি কাঠামোতে সবসময়েই কিছু বাদ থাকে এবং এই গ্রহণ ও বর্জন যেহেতু

অন্তহীনরূপে হতে পারে—তা সে যেই করুক, স্যাভেজ অথবা লেভি স্ট্রাউস—সামাজিক কাঠামোর সংখ্যাও শেষহীন।
এখান থেকেই ডেরিডা তার ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্বের প্রস্তাবনা রাখেন। যে কোনো কাঠামোই—সমাজের বা পুস্তকালোচনার—গ্রহণ / বর্জন প্রক্রিয়া সাপেক্ষ। সাবজেক্ট (স্যাভেজ, স্ট্রাউস, ডেরিডা) অনুষঙ্গভিত্তিক এই গ্রহণ / বর্জন সমস্যাটির সমাধা(ন) করেন। যেহেতু প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেন সাবজেক্ট, প্রক্রিয়াটি সাবজেকটিভ। পুরো ব্যাপারটাই সাবজেক্টের এক স্বাধীন—স্বেচ্ছাচারী—খেলামাত্র।
ডেরিডা প্রাথমিক ভাবে তাঁর অবস্থানটিকে এইভাবেই রেখেছিলেন। অস্পষ্ট, ভাসা-ভাসা, এলোমেলো, কয়েকটি বিস্ফোরক প্রতিপাদ্যকে ছুঁড়ে দেওয়া হল। যার পরবর্তী দশকগুলোতে পরিশোধিত, পরিমার্জিত, কখনও কিছুটা ভিন্নতর, রূপ দেন। যা আজ ডিকনস্ট্রাকশন নামে বিখ্যাত।

ডেরিডা শুদ্ধ একটি ডিকনস্ট্রাকশন তত্ত্ব (টেকনিক) রাখেন না। তার একটি দার্শনিক অবস্থান আছে : সবকিছুই সামাজিক—প্রাকৃতিক বলে কিছু নেই। ডেরিডা লেভি স্ট্রাউসে শুদ্ধ এক হারিয়ে যাওয়া প্রকৃতি খুঁজে বেড়ান, দেখেন—লেভি স্ট্রাউস স্যাভেজের ভিতর এক প্রকৃতি খুঁজে নেন যা সম্পূর্ণ, কোনো কিছুই বাদ দেয় না। ডেরিডার কাছে এই প্রকৃতি এক অলস কল্পনামাত্র যা কোনোদিনই ছিল না। ডেরিডা কোনো স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো—প্রাকৃতিক অথবা সামাজিক—স্বীকার করেন না। সম্পূর্ণতা এক সম্ভাবনা মাত্র যার প্রকাশ—এবং বিকাশ—অসংখ্য সম্ভাবনার আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। মানুষ শুদ্ধ এই অসংখ্য সম্ভাবনার ঢেউগুলিতে দুলবে, নাচবে, স্নান করবে। এই অবগাহনের নামই স্বাধীনতা, নীটসে বলেছিলেন। ডেরিডা আর একবার বললেন। প্রকৃতি নেই। শুদ্ধ সমাজ আছে তার অসংখ্য ঢেউ নিয়ে। এসো, ঢেউ-এর মাথায় মাথায় নাচি, ডেরিডা বললেন।
ডুব দেবার কথা ডেরিডা বলেননি। তাহলে তিনি প্রকৃতি খুঁজে পেতেন। তার আগে : প্রকৃতি কাকে বলে ?

ডেরিডার দর্শনে শব্দরা কোনো নির্দিষ্ট অর্থ বহন করে না, মেটাফর মাত্র। শুধু একটি শব্দ ছাড়া : প্রকৃতি। অর্থাৎ ডেরিডার দর্শনেরও একটি সেন্টার আছে।
ডেরিডা প্রকৃতি দেখেন বাইরের পৃথিবীতে : স্যাভেজদের জঙ্গলে, মাঠে, ঘাটে বা মহাকাশে। ওখানে ফিরে যাবার কোনো পথ নেই, ডেরিডা বললেন : প্রকৃতি লেভি স্ট্রাউস বা রুশোর এক ঢিলে কল্পনা মাত্র। প্রকৃতি নেই, আছে শুধু—সমাজ।
ডেরিডা দেখলেন না যে প্রকৃতি তাঁর খুব কাছেই ছিল, আপন অভ্যন্তরে। মাঠে ঘাটে জঙ্গলে মহাকাশে প্রকৃতি খুঁজলেন ডেরিডা, বুকের ভিতরটা খুঁজলেন না।
প্রকৃতি মানে স্ব-ভাব। প্রকৃতির কাছে ফিরে চলো মানে স্ব-ভাবের কাছে ফিরে চলো।

স্বভাব ধর্মের কাছে। ফ্রয়েড, মার্কস বা কৃষ্ণের শুদ্ধ পৃথিবীতে মানুষ স্বভাবের কাছে আসতে পারে, তাই সে—আনন্দিত।

মার্কস তার কমোডিটি ফেটিশিজমের আলোচনায় এই প্রশ্নগুলো তোলেন। পণ্য মানুষের আর সব পরিচয় মুছে ফেলছে, তাকে বিমূর্ত শ্রমিকে পরিণত করছে। মানুষ ভুলে যায় তার ভাললাগার মুহূর্তগুলি, তার কনক্রীট সত্তাকে। পণ্য সমাজ তার শরীরে কয়েকটি লেবেল সেঁটে দেয় : ডাক্তার, ইনজিনিয়র, প্রফেসর, শ্রমিক। সে রোগী দেখে, ব্রিজ তৈরি করে, পেপার লেখে—ভুলে যায় যে একসময় কী সুন্দর পুতুল তৈরি করত, তার মাও তাকে দেখিয়েছিল আকাশের চাঁদ। মানুষ তার ভাললাগার কাজের জগৎ থেকে ছিটকে পড়েছে, সে কক্ষচ্যুত। সে ভ্রমণ করে এক সঙ্গহীন পৃথিবীতে যেখানে পণ্য তাকে মাপে, ওজন করে, বড় করে, ছোট করে, গ্রহণ করে, ছুঁড়ে ফেলে, তুলাদণ্ডের বাটখারার ওজনগুলিই সেখানে পরিবর্তনশীল, এক অচেনা পৃথিবীতে ভঙ্গুর অস্তিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মানুষ—তার জীবনের স্বপ্নের মতো দূরে সরে যায় তাঁর ছোটবেলা। অথচ মানুষ তো লুকিয়ে আছে তার স্বপ্ন ও ছোটবেলায়, ফ্রয়েড বলেছিলেন। ভোরবেলার স্বপ্নেই থাকে জীবন।

মার্কস—ইয়ং মার্কস—মানুষের এসেন্সের কথা বলেছিলেন : স্বাধীন সচেতন কর্মবাসনা, স্বভাবকর্ম। পণ্য মানুষকে তার স্বভাব থেকে সরিয়ে আনে। একই কথাই পুনরাবৃত্তি পায় প্রাপ্তমনস্ক ক্যাপিটাল গ্রন্থে : পণ্য সমাজের পরিচয়হীন বিমূর্ত শ্রম মানুষকে তার কনক্রীট সত্তা—অর্থাৎ এসেন্স থেকে সরিয়ে আনছে। মানুষ তার প্রকৃতি, শরীর—মূর্তি—হারিয়ে বিমূর্ত অর্থাৎ প্রেত হয়। কিন্তু মানুষের—বিশেষ একটি মানুষের—এসেন্স কী? মানুষের কি কোনো ইউনিভার্সাল এসেন্স আছে? কনক্রীট সত্তা কাকে বলে? মার্কস উত্তর দেননি।

ফ্রয়েড মানুষের এসেন্সকে আঙুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছিলেন। সমাজ মানুষকে—তার এসেন্সকে—গিলে খায়; মানুষের পরিচয় থাকে সেইখানে যেখানে সমাজ অনুপস্থিত। তার ছোটবেলায় এবং যৌনজীবনে। ফ্রয়েড মানুষকে সেক্সে রিডিউস করেননি—সেক্স এবং শৈশবের স্মৃতির মাধ্যমে তার এসেন্সকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। ফ্রয়েডের কাছে প্রশ্ন এই নয় যে এনভায়রনমেন্ট মানুষকে কী ভাবে প্রভাবিত এবং গঠন করে। ফ্রয়েড জানতে চান একই এনভায়রনমেন্টে মানুষেরা কেন ভিন্নভাবে রিঅ্যাক্ট করে—তার অন্তঃপ্রকৃতি, এসেন্স। মানুষের কোনো ইউনিভার্সাল এসেন্স নেই;—মানুষের এসেন্সকে কতগুলি টাইপে ভাগ করা যায়। তাদের ভাললাগাগুলি আলাদা। প্রতিটি মানুষ তার ভাললাগার জগতে থাকবে, আদর্শ সমাজ এই ভাললাগার জগৎগুলির বিকাশ ঘটাবে। ফ্রয়েডে মার্কসের পরিণতি।

পণ্যসমাজ এই ভাললাগার জগৎগুলি মুছে ফেলতে চায়। কিন্তু কোনো কিছুই কি মুছে ফেলা যায় সম্পূর্ণ? ডেরিডাই তো শিখিয়েছেন যায় না—যাই মোছ তার চিহ্ন থেকে যাবে, ট্রেস। উদ্ধত ক্ষমতা খুন করে মানুষকে, কিন্তু আত্মা—সে তো

মৃত্যুহীন। মানুষের চিহ্ন থেকে যায় তার স্বপ্নে এবং শৈশবের স্মৃতিতে। নিরালম্ব আত্মার মতো মৃতের স্বপ্ন ও স্মৃতি শরীর খুঁজে বেড়ায় : হ্যামলেট, হ্যামলেট।

প্রকৃতি আছে এইখানে, আমার স্বপ্ন ও স্মৃতিতে, অর্থাৎ আধ-জাগরণে। তাকে জাগরিত কর। আদর্শ সমাজ থাকে সেইখানে যেখানে স্বপ্ন অর্থাৎ নিদ্রা মানুষকে জাগিয়ে রাখবে—জাগরণ নিদ্রার এক এক্সটেনসন। কাজ নেই। আমি ঘুমিয়ে থাকি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাজ করি। ভালবাসি। ঢেউগুলি আসছে। আমি ডুবে যাচ্ছি। তুমি ডুবে যাচ্ছ। ঘুম। ঈশ্বরের মতো যোগনিদ্রায় শুয়ে থাকে মানুষ। কথাগুলি এলেমেলো লাগছে, বোকা বোকা, সেন্টিমেন্টাল, অদ্ভুত, তাই না? আমি কিন্তু আদর্শ সমাজ আর কোনোভাবেই বুঝতে পারি না। সাবেক সমাজবিজ্ঞান আদর্শ সমাজ খুঁজেছে একটা জাগরণ থেকে আর এক জাগরণে—ক্যাপিটালিজম থেকে সোস্যালিজম। এই প্রচেষ্টা মানুষকে ছোট করে, তার আরও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে সাপ্রেস করে। ক্যাপিটালিজমের প্রান্তে—মার্জিনে—যে সম্ভাবনাগুলি ছিল তাকে বিনষ্ট করে।

ক্যাপিটালিজম মন্দ ; সোস্যালিজম ভাল। একবার সোস্যালিজমে পৌঁছলেই মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে এই চিন্তাই মানুষকে ভুলপথে চালিত করেছে। এই সমাজের প্রান্তেই—কিছুটা অন্য—জীবনযাপনের চিহ্ন থাকবে যাতে নতুন আদর্শ সমাজের কিছুটা ছবি থাকবে। ক্যাপিটালিজমে লড়াই, সোস্যালিজমে আদর্শ জীবন-যাপন—এরকম নয়। কমোডিটি ফেটিশিজম পুঁজিবাদের অনিবার্য পরিণতি নয়—আমার চেতনা আমাকে কমোডিটি ফেটিশিজমের উপরে তোলে, আমি অন্যরকমের জীবনযাপনের চেষ্টা করি—কিছুটা করিও—পণ্য সমাজের মানদণ্ড আমাকে (এবং আমার কমরেডদের) নির্ধারিত করে না। প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়া মানে এই জীবনযাপন করা। মানুষ পণ্যের নিয়মকে অস্বীকার করে কিছুটা নিজের মতো বাঁচার চেষ্টা করে, বাঁচেও।

যতদূর দেখতে পাই, এই পণ্য সমাজের শেষ নেই। অতএব, এই পণ্য সমাজেই নিজেকে কিছুটা খুঁজে পেতে হবে। আজকের মানুষের কাছে এটাই চ্যালেঞ্জ : পণ্য সমাজের অভ্যন্তরেই নিজেকে আবিষ্কার করা। রুশো এটাই চেয়েছিলেন, লেভি স্ট্রাউস চান, আমি চাই যা ডেরিডা বোঝেন না। ওঁরা আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলতে পারেনি, আমি আছি। পণ্য সমাজের স্তুতি করতে-করতেই আমি গুঁজে দিই এক নিষিদ্ধ ইস্তাহার কমরেডদের হাতে। আমি পণ্য সমাজকে ডিসিভ করি। একই লেখার প্রান্তে থাকে অন্য লেখা ; যে ভেবে নাও—বন্ধুরা, শত্রুরা।

চার

কেউই শেষ কথা বলে না। ডেরিডাও না।

ডেরিডা বললেন নেচার নেই। কেন বললেন? কেননা ডেরিডা নেচার কথাটিকে

একটিমাত্র অর্থে—এক্সটার্নাল ফিজিকাল নেচার অর্থে—বোঝেন, অর্থাৎ বোঝেন না। যে ডেরিডা সকল অর্থই কনটেক্সট নির্ভর বলেন, নেচার কথাটির অর্থও যে কনটেক্সট নির্ভর, বুঝলেন না—নিজেকে কনট্রাডিক্ট করলেন।

আমরা এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানের কনটেক্সট বদলালাম—পদার্থবিদ্যা থেকে জীববিদ্যা। তখন নেচার কথাটির অর্থ বদলে গেল, শরীরী হল। নেচার আছে—এইখানে, আমার শরীরে। তখন নেচার / সোসাইটি দ্বন্দ্ব মূর্ত হয় : সমাজ শরীরের উপর হামলে পড়ছে, রেপ করছে। নেচারে ফিরে যাওয়া মানে শরীরে প্রত্যাবর্তন, শরীরী জীবন-যাপন। নেচারকে আমরা স্বভাব অর্থে বুঝি। নেচার / সোসাইটি অপোজিশন মানে সমাজ ও স্বভাবধর্মের দ্বন্দ্ব। মানুষ স্ব-ভাবে ফিরতে চায়।

কেমন করে এই প্রত্যাবর্তন হবে, কোথায় বাধা, কেন, কীসের—এইসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর, করছি না। আমরা শুধু সমস্যাটিকে রাখলাম : মানুষের ভিতরেই নেচার আছে। মানুষের এক স্বভাব ধর্ম আছে ; এই সমাজ মানুষকে তার স্বভাবধর্ম থেকে বিচ্যুত করছে। মানুষের স্বভাবধর্ম অনুযায়ী বাঁচার আকাঙ্ক্ষাই অগণন ঢেউ হয়ে সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ে প্রতিমুহূর্তে। মনীষীরা—কৃষ্ণ, মার্কস এবং ফ্রয়েড : আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। পোস্টমডার্নিজম আমার ভাললাগার ধারণাটিকে—স্বভাব-ধর্মকে—একটি রবারের ছোঁয়ায় মুছে ফেলতে চাইছে।

অর্থাৎ ওরা শরীর মুছে ফেলতে চাইছে। এসো, আমরা শরীরের কাছে যাই, স্বভাবের কাছে।

অথচ এই শরীর তো আমার শরীর নয় ; অন্য শরীর, যে কোনো শরীর, বিমূর্ত শরীর। —অর্থাৎ অশরীরী। কেমন করে জানব আমার এই শরীর কী চায়, চেয়েছিল ? চলো, যাই ছোটবেলার কাছে, নদীর কাছে, পুষ্করিণীর কাছে, বাথটাবে যেখানে মা তার শিশুটিকে স্নান করায়, শিশুটি সাঁতার কাটছে বাথটাবে, মাতৃগর্ভে। মাতা, দ্বার খোল।

নদীটি কি পারে তার উৎসে ফিরে যেতে ? এটিই ছিল ফ্রয়েডের প্রধান প্রশ্ন। ফ্রয়েড আমাদের ছোটবেলার কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন : চাইল্ড ইজ দি ফাদার অফ ম্যান। ছোটবেলাকে খুঁজে বার কর।

নেচারের কাছে যাওয়া মানে শৈশবে এক প্রত্যাবর্তন যেখানে সমাজ সংকুচিত হয়ে ছিল। শৈশবকে ফিরিয়ে আন, ছোটবেলাকে, শরীরকে। সমাজ ক্রমশ ছোটবেলাকে আক্রমণ করে, ছোট করে, খাটো করে, হত্যা করে। আর যখন শৈশবই নেই, তখন তো আর স্মৃতি বলে কিছু রইল না—কেমন করেই বা আমাকে খুঁজে পাব আমি। শৈশবের মৃত্যুর আর এক নাম ইতিহাসের মৃত্যু। শৈশব নেই, তাই স্মৃতি নেই অতএব অবশেষ নেই ইতিহাস নেই।

এই পৃথিবীর সবাই জেগে উঠছে : গাছপালা, বাতাস, পাখি, নারী। সকলেই শুদ্ধ বাঁচার দাবি করছে। তখন শিশুটিকে কেন জেলখানায় বন্দী করে রাখ, ইস্কুলে ?

সোস্যালিস্ট নয়, ফেমিনিস্ট নয়, একমাত্র শিশুরাই পারে এক মুক্ত পৃথিবীর সন্ধান দিতে। শিশুদের বই না পড়িয়ে বই-এর মতো শিশুদের পড়, বোঝ, জান। শিশুদের চেন, শৈশবকে জান—তাহলেই বুঝবে তোমাকে, তোমার কনক্রীট যার আলোতে বাঁচ,—যদি ওরা বাঁচতে না দেয় (অবশ্যই দেবে না) বাঁচার দাবি তোল। মার্কস, ফ্রয়েড এবং শিশুদের হাত ধরে এক শুদ্ধ পৃথিবীর সন্ধান কর।

এই প্রবন্ধে আমি দাবি করব না যে আমি এক রত্ন ভূখণ্ড পেয়েছি যেইখানে আমার সঙ্গীদের নিয়ে যেতে পারি। আমি শুধু বলব যে এইখানে খনন কর—তামা, অভ্র এবং তেল পাবে। একটি পূর্ণ প্রবন্ধ লিখব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তো লেখাটি শুরু করি না। ওদের কথার ফাঁকেতে ফাঁকিতে আমাদের কথাগুলি গুঁজে দেব : আমরাও আছি। ব্যস এইখানেই তো প্রবন্ধ শেষ। এটি একটি 'অ্যাকাডেমিক পেপার' হতে পারত যদি আমি প্রবন্ধটিকে অংশ দুই এবং তিনেতে—ডেভিডার প্রবন্ধটির সারাংশ এবং তার সমালোচনায়—সীমিত রাখতাম। তার পরের বিচার্য বিষয় থাকত আমি সঠিক যুক্তি রাখছি কিনা, কতটা নতুন কথা বলছি, অর্থাৎ পেপারটি গ্রহণযোগ্য এবং পাবলিকেশনযোগ্য—কিনা। যা বিচার করবেন অ্যাকাডেমিক জগতের রেফারীরা।

কিন্তু পেপার তো আমি লিখছি না। আমি ফ্যাশনের জগৎ থেকে তুলে আনি কয়েকটি রুমাল যারা, সমবেত দর্শকেরা দেখে, পায়রা হয়ে যায় আমার মন্ত্রপূত হাতে। ফুকো, ডেরিডা, লাকাঁ, লিওটার্ড, বড্রিলার্ড—এইসব সুধীজনেরা নামমাত্র (বিগ নেইমস) যাদের প্রান্তে আমি আমার কথাগুলি বলে যাব। সামান্যই কথা : আমি স্বভাবের কাছে যেতে চাই। তোমরা যারা ক্যাপিটালিস্ট, বুরোক্র্যাট, প্রফেসর দার্শনিক, পুরোহিত তা হতে দেবে না। তাই আমার সত্তাকে আমি খণ্ডিত করলাম : একটি সত্তা তোমার সুপার মার্কেটের সামনে ম্যাজিক দেখায়—দেখাতে দেখাতে ফুসলে নিয়ে যায় তোমাদের ছেলেমেয়েদের। ওরিয়েন্টালিজম বা থার্ড ওয়ার্ল্ডিজম আমি কিছুই করি না। আমাদের কথা,—প্রাচ্যের কথা—বলার কোনো মানে নেই : সাহেবদের ফান্ডামেন্টালিজমের বদলে হিন্দু বা মুসলিম ফান্ডামেন্টালিজম। ওসব করবে সেইড এবং তার শিষ্যরা : সাহেবদের পাল্টা টোটালিটেরিয়ান সিস্টেম যা, প্রকৃত প্রস্তাবে, সাহেবদের কথা। আমার কথা বলার চেষ্টা আমি খুব করছি না : যা বাজারে রাখব,—গীতা বা রামায়ণ—শুয়োরের মাংস হয়ে যাবে। তার বদলে চুপসাড়ে রেখে যাচ্ছি আমাদের কয়েকটি শ্লোক সাহেবদের প্রান্তে—ওরা বুঝতেও পারবে না যে আমি কখন ওদের ভিতর ঢুকে গেছি। সাধারণ মানুষ : খুব বেশি সিরিয়াস কথা তুমি বলতে যেও না। সেক্স, ভায়োলেন্স, বিদ্রোহ, অত্যাচার, ব্যাভিচার—যা বাজার নেয়—তার পাশে তোমার দুটি শ্লোক তুমি ভাসিয়ে দাও। তার বাইরে, ওগো ওয়ার্ল্ডের নাগরিক, অধিক কী? বাজার : বাজারকে দেখ, বোঝ, জান, তাতে অংশগ্রহণ কর (অর্থাৎ আত্মগোপন কর) তারপর মার্কেট প্লেসে নগরীর যুবকদের বেচ নিষিদ্ধ মাদক ড্রাগ। আমি সক্রেটিস, এক ড্রাগ পেডলার, হেমলক পান করার জন্য প্রস্তুত।

আর তখন অন্য সত্তা ধ্যান করে আন্ডারগ্রাউন্ডে। কী ভাবে, বলে, লেখে সে? ঘুমিয়ে থাকে? বিদ্রোহের জন্য তৈরি হয়? আসলে এই যে বিগ নেইমসের পাশে কয়েকটি কথা গুঁজে দিচ্ছি এগুলি কিন্তু আমার নয়, সবই মাটির তলা থেকে পাওয়া—যেমন মাটি খুঁড়ে পেয়েছি কয়লা, তেল এবং সোনা। মৃত গাছ মাটি চাপা পড়ে কয়লা হয়; মাটিতে পিণ্ট সভ্যতার কথাগুলি—সোনা। দ্বি-সহস্র বৎসর ব্যাপী একটি সভ্যতা স্ব-ভাব খুঁজেছিল—স্ব-ভাব নিয়ে ডিসকোর্স তৈরি করেছিল। বাজারের মদে তারই দুই-একটি বটিকা মিশিয়ে বিক্রি করি আমি। দেখো তো—নেশাটা আর একটু জমে কিনা? একমাত্র এইভাবেই থার্ড ওয়ার্ল্ডের লেখক কথা বলতে পারে—তার কথা। তা না হলে তো কথাগুলি বিক্রি—অর্থাৎ কম্যুনিকেটেড—হবে না। আর আগেই বলেছি যা বিক্রি হয় না তার কোনো ভ্যালু নেই। সেই আশ্চর্য সংকলনে আমারও দু-একটি শ্লোক থাকবে। তার বাইরে কে আমি?

লেখক বলতে তোমাদের মাথায় আসে কোনো এক বীরের কথা যে যুদ্ধজয় করে বা নারী, বিপ্লব করে বা তোলপাড় করে বেশ্যাবাড়ি, যে সমাজের মুখোস খুলে দেয়, ভিতর থেকে টেনে আনে শোষক এবং কামুককে, অত্যাচার এবং যৌনতা। তো, আমি এ সমস্ত পারি না—আমি শুধু আমার মুখোস খুলে যাই। এই আমি, খুলে ফেলেছি আমার মুখোস—আমার হাতে কোনো কলম নেই বা বন্দুক—দেখো তো, আমায় চিনতে পার কিনা?

আমি সমস্ত মুখোস খুলে তোমার কাছে দাঁড়াই। তখন তো আমি লেখক নই, আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। ফ্রম রাইটিং টু স্পীচ। স্পীচ: সে তো একটা মেটাফর। কলম দিয়ে লিখলেই লেখা হল, আর মুখে বললেই স্পীচ—এ আবার কেমন কথা! স্পীচ হল কনটেক্সট অর্থাৎ অর্থের সংকোচন—কাছের লোকের জন্য বলা, লেখা। এটাই রুশো বলেছিলেন তার কনফেসনে—ডেরিডা বোঝেননি। উনি সকল শব্দকে মেটাফর অর্থে বোঝেন—শুধু বোঝেন না যে নেচার/স্পীচ শব্দগুলিও মেটাফর, তাদের বিশেষভাবে বোঝ, লেভি স্ট্রাউস বা রুশোকে পাবে।

তোমরা আমার লেখা পড়ছ, কিছু বুঝছ না তো? কেন ধরে নাও সকলকে সবকথা বোঝাবার জন্য আমি লিখছি। লেখা শুধু কম্যুনিকেট করে না, ডিসিভও করে। বিভিন্ন কমিটির মেম্বার, মধ্যবয়স এবং পঞ্চায়েত প্রধানদের অতিক্রম করে লেখা তার প্রেমিক খোঁজে। (কোথায় প্রেমিক তুমি: দীপ্তির ভিতরে।) এ লেখা তারই জন্য যে সব কিছু বুঝতে চায় না। কিছু বুঝলাম, কিছু না বোঝা রইল—তখন শরীরে এক আবেশ আসে, নেশা। ড্রাগ ছেড়ে লেখাটি তুলে নেয় সে যাকে তুমি ছুড়ে ফেলেছ মার্জিনে, আস্তাকুড়ে। আয়ারল্যান্ডের মানুষ, কলমকে ড্রাগে পরিণত কর। লেখা শুধু বন্ধদের সিগন্যাল পাঠাচ্ছে। বিকেল বেলার রোদ বেশ

এসে পড়েছে তোমার মুখে, হঠাৎ পোস্টম্যান নিয়ে এল আমার এই লেখা তোমার কাছে, তোমার মুখ বদলে গেল, তুমি হঠাৎ দরজা বন্ধ করলে। তোমার মেয়ে তখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মশগুল, জানল না যে ঘরে মার প্রেমিক এল।* □

* বুদ্ধিমানদের জন্য : এই লেখার শেষ অংশটি ডেরিডার রুশোর ডিকনস্ট্রাকশনের এক পাল্টা ডিকনস্ট্রাকশনের আইডিয়া রাখছে। বুদ্ধিমানেরা ইচ্ছা করলে পেপার করতে পারেন। আমার কোনো কপিরাইট নেই।

সেমিওলজি এবং গ্রামাটোলজি : জাক দেরিদার সঙ্গে জুলিয়া ক্রিস্তেভার সাক্ষাৎকার

অনুবাদ : প্রিসিলা রাজ

[প্রিসিলা রাজ কৃত এই সাক্ষাৎকারটির অনুবাদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রান্ত', সংখ্যা : ৫, আগস্ট, ১৯৯৩ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এখানে তা পুনর্মুদ্রিত হল। —সম্পাদক।]

[অবিনির্মাণ (Deconstruction) একটি দার্শনিক প্রতীতি, দেরিদা যা শুরু করেন ফ্রান্সে। এ-সম্পর্কিত প্রধান প্রকাশনাগুলো বের হয় ষাটের দশকের শেষের দিকে : অবিনির্মাণ হচ্ছে উচ্চক্রমিকতার সমালোচনা—যারা নিশ্চিত, অভেদ এবং সত্যের মতো ঐতিহ্যানুযায়ী বিষয়ের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু দেরিদার মতে এ-পদগুলো এদের বর্তমান আসন লাভ করেছে শুধুমাত্র অন্যান্য সব উপাদানকে চাপা দিয়ে। এ-সব উপাদান সম্পর্কে চিন্তা না-করার কারণে এক সময় পশ্চিমা দর্শনে এরা পরিণত হয় অ-ভাবিত বিষয়ে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তার ক্ষমতাও পশ্চিমা দর্শন হারিয়ে ফেলে কখনও কখনও। নিৎসে এবং হাইডেগারকে অনুসরণ করে দেরিদা পশ্চিমা দর্শনের এই বিশেষ পক্ষপাতকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন 'অর্থকেন্দ্রিকতা' পদটি দিয়ে। এ-পদটির দুটি দিক—একটি কেন্দ্রীভূত হওয়া, ও অপরটি কেন্দ্র হিসেবে অর্থের (Logos) অবস্থান—সমান তাৎপর্যপূর্ণ।]

ক্রিস্তেভা : আজকের চিহ্নবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে চিহ্নের মডেল এবং এর অপরাপর অনুষঙ্গ জ্ঞাপন ও কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এসব মডেলের "অর্থকেন্দ্রিক" (Logocentric)* ও প্রত্নকেন্দ্রিক (ethnocentric) সীমা কী কী, আর তাছাড়া অধিবিদ্যাকে এড়িয়ে একটি নতুন সঙ্কেতলিপির ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে এরা কিভাবে অসমর্থ ?

*লোগোস একটি গ্রীকপদ। নির্দিষ্টভাবে শব্দটির অর্থ "শব্দ"। কিন্তু সেই সাথে এটি যে ইঙ্গিতগুলো বহন করে তা হলো যুক্তি এবং সাধারণভাবে প্রজ্ঞা এবং কখনও কখনও পারমার্থিকতার ইঙ্গিত। খৃস্টধর্মের শুরুতে গ্রুপদী দর্শনকে যুগপৎ ধারণ ও অতিক্রম করার জন্যে "লোগোস" শব্দটিকে ঈশ্বরের বাণী অর্থে ব্যবহার করা হয়। এভাবেই সৃজনীক্ষমতাসম্পন্ন স্বর্গীয় উচ্চারণে প্রজ্ঞা যোগ করা হয় (উদাহরণ, গসপেল)। ঈশ্বরই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, তাঁর বাণী বা শব্দ একই সাথে অর্থের উৎস এবং অর্থের সূচক এবং একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণী। লোগোসের প্রভাব পড়েছে বহুদূর। ইতিহাসকে হিসাবে রেখে এর মূল্যবিচারে বেরিয়ে এসেছে পুরো একগুচ্ছ অর্থ। মাধ্যমহীন অভিব্যক্তি হিসেবে বচন ভেজালহীন—এই ধারণা থেকে একে স্থাপন করা হয়েছে লেখার চেয়ে উচ্চাসনে, এবং লেখাকে গ্রহণ করা হয়েছে উচ্চারণের বিশুদ্ধতার একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু সন্দেহজনক সম্পূরক হিসেবে। উচ্চারণ ও অর্থের এই পার্থক্য গ্রীক দর্শনেও লক্ষণীয়। উচ্চারণকে বেশি মূল্য দেয়ার মধ্যে যে-প্রবণতা বিদ্যমান তা হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, অনারোপিত ও ভেজালহীনতার আকাঙ্ক্ষা। —অনুবাদক

দেরিদা : এখানে যে-কোনো প্রয়াসই অনিবার্যভাবে একাধিক অর্থবাহী। যদি এমনটা ধরা হয় যে অধিবিদ্যাকে একদিন স্রেফ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে—যাতে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই—তবে চিহ্নের ধারণা সেদিন অর্জন করবে প্রগতি ও একইসাথে সম্মুখীন হবে কিছু বাধার। কেননা যদি কোনো চিহ্ন উৎস ও সবধরনের প্রয়োগের দিক থেকে আধিবিদ্যক হয়ে থাকে, যদি কৃচ্ছবাদী মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে পদ্ধতিগতভাবে সুসম্পর্কিত হয়, তবে সামগ্রিকভাবে যে কাজ ও বিচ্যুতির শিকার একে হতে হবে—এবং চিহ্ন নিজেই যে-প্রক্রিয়ার একটি হাতিয়ারও বটে, সেই কাজ ও বিচ্যুতির প্রভাবে চিহ্নের অর্থসংকোচ ঘটবে। এ কাজ ও বিচ্যুতি আবার অধিবিদ্যায় এসব চিহ্ন যে-সব নিয়মের অধীন গবেষককে তা বুঝতে সাহায্য করে। এ-নিয়মগুলো আবার চিহ্নের জন্ম ও কাজ যে-পদ্ধতির মধ্যে শুরু হয়েছিলো তার সীমা ও সীমার শিথিলতা কেও বোঝায়। সুতরাং সেই সূত্রে এরা একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত উৎস থেকে চিহ্নের সরে যাওয়াকে বুঝিয়ে থাকে। এ কাজকে অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে যতদূরসম্ভব ; কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে যিনি কাজটা করছেন তাঁকে অবশ্যম্ভাবীভাবে এ-ধরনের একটি মডেলের "অর্থকেন্দ্রিক ও প্রত্নকেন্দ্রিক" সীমার মুখোমুখি হতে হবে। সে-মুহূর্তে খুব সম্ভবত এ-ধারণা তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে সীমার এই বিন্দু নির্ধারণ করাটা খুবই কঠিন, আর করলেও কখনোই তা একশভাগ নির্ভুল হয় না। চিহ্নের ধারণার সব জটিল ও সম্ভাব্য উৎসে তন্নতন্ন অনুসন্ধান চালাতে হবে, প্রত্যেক ক্ষেত্র ও পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত করতে হবে এ-অনুসন্ধানের কাজ। এখন, শুধুমাত্র বিষম বিকাশ নয় (যা সবসময়ই ঘটবে), বরং কিছু নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনেই অন্যত্র ব্যবহৃত কোনো মডেলের শরণাপন্ন হয়তো হতে হবে, কৌশলগত কারণে যা হয়ে উঠবে অপরিহার্য। আর এজন্যই এমনকি অনুসন্ধানের সবচাইতে নতুন পর্যায়গুলোতেও এ-প্রয়োজন বাধার সৃষ্টি করবে।

স্যসুরীয় চিহ্নবিজ্ঞানের দ্বৈতচরিত্র একটি উদাহরণেই স্পষ্ট হবে। একদিকে এর রয়েছে একটি চরম অনড় জটিল ভূমিকা যা :

১. প্রথমবারের মতো ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে দ্যোতিতকে দ্যোতকের সাথে অচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করেছিলো, দেখিয়েছিল যে উভয়ই একই উৎপাদনের দুটি পিঠ। স্যসুর নিজে ঐ বৈপরীত্য বা "দ্বৈত একতা"কে দেহ ও আত্মার সম্পর্কের সাথে এক করে দেখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, "এই দ্বৈত একতাকে প্রায়ই তুলনা করা হয় মানবসত্তার একতার সাথে, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে যার সৃষ্টি। এই তুলনা খুব সন্তোষজনক নয়।" (*Cours de linguistique generale.* পৃ: ১৪৫)

২. চিহ্নের কর্মপ্রক্রিয়ার পার্থক্যমূলক (differential) ও রূপবন্ধগত (formal) চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে, "ভাষার বস্তুগত উপাদান ধ্বনির পক্ষে কোনোমতেই নিজে থেকে ভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়" ও "ভাষিক দ্যোতকের মর্মবস্তু কখনোই ধ্বনিমূলক নয়" (পৃ: ১৬৪)

দেখিয়ে এবং দ্যোতিত বিষয় ও "প্রকাশমান উপাদান" উভয়কে বস্তুনিরপেক্ষ করে, (যে-কারণে প্রকাশমান বস্তুর চরিত্র আর বিশুদ্ধ ধ্বনিমূলক থাকে না) সস্যুর ভাষা-তত্ত্বকে সমগ্র চিহ্নবিজ্ঞানের শাখামাত্রে পরিণত করেছেন (পৃ: ৩৩)। এভাবে সস্যুর তাঁর চিহ্নের ধারণা যে-অধিবিদ্যা থেকে ধার করেছিলেন তার বিরুদ্ধেই একে কাজে লাগিয়ে আধিবিদ্যক ঐতিহ্যবিরোধী সামগ্রিক অভিযানেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

কিন্তু সস্যুর তাঁর প্রথা ভাঙার প্রথাকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেননি, যতোটা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন চিহ্নের ধারণার ব্যবহার। কারণ, যুগপৎ সম্পূর্ণ নতুন ও গতানুগতিক ধারায় অন্য যে-কোনো ধারণার চেয়ে একে বেশি কাজে লাগানো সম্ভব নয়। সহজ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে অন্তত কয়েকধরনের প্রয়োগের নিয়ম চিহ্নর পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। তাঁর জটিল গবেষণাকর্ম থেকে সস্যুর যে-উপসংহারগুলো টেনেছেন অন্তত একটি পর্যায়ে তাঁকে সেসব ত্যাগ করতে হয়েছে, এবং তাঁকে যে উপযুক্ত বিকল্পের অভাবে "চিহ্ন" শব্দটির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হয়েছিলো তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। "দ্যোতিত" (signified) ও "দ্যোতক" (Signifier) শব্দদুটো চালু করার কারণ ব্যাখ্যা করে সস্যুর লিখছেন : "চি হ্ন র প্রসঙ্গে বলতে হয় : যদি এ-শব্দ শেষ পর্যন্ত আমাদের রাখতেই হয় তবে তার কারণ হবে আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় একে প্রতিস্থাপিত করার মতো এর চেয়ে ভালো কোনো শব্দ নেই" (পৃ: ৯৯-১০০)। ফলে দ্যোতিত-দ্যোতকের বিপ্রতীপ চালু করে দেওয়ার পর চি হ্ন কে দূর করে দেয়ার চেষ্টা অনেকের কাছে স্বাভাবিকভাবেই অযৌক্তিক মনে হতে পারে।

এখন, "দৈনন্দিন ভাষা" নির্দোষ বা নিরপেক্ষ নয়। আবার এটিই পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার ভাষা, যাতে শুধু যে প্রচুর পরিমাণে এবং সবধরনের পূর্বানুমান রয়েছে তাই নয়, বরং এ-পূর্বানুমানগুলি অধিবিদ্যার সাথে রয়েছে অচ্ছেদ্য এবং একটি পদ্ধতিতে জট-পাকানো অবস্থায়; যদিও এর প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি এ-পর্যন্ত খুব কমই আকৃষ্ট হয়েছে। আর সেজন্যই অ প র দি কে :

১। Signans (সস্যুরের দ্যোতক) ও signatum (সস্যুরের দ্যোতিত) একটি অনড় ও বিচারমূলক পার্থক্যের লালন এবং Signatum ও ধারণার সমীকরণ (পৃ: ৯৯)[১] উৎসগতভাবে আরেকটি ধা র ণা র অবকাশ তৈরি করে, যা নি জে ই নি জে কে চি হ্নি ত ক রে। এ-ধারণা ভাষা অর্থাৎ দ্যোতকের কাঠামোর সাথে কোনো সম্পর্ক ছাড়াই আমাদের চিন্তায় প্রেফ উপস্থিত থাকে। সস্যুর এই সম্ভাবনার (যা এমনকি দ্যোতক/দ্যোতিতের বিপ্রতীপ অর্থাৎ চিহ্ন যা সহজাতভাবেই ধারণ করে) পথ খুলে দিয়ে আমরা এতোক্ষণ যে বিচারমূলক সিদ্ধান্তগুলোর ওপর কথা বলছিলাম তার সাথে বিরোধ ঘটিয়েছেন। আমি যাকে "স্বাতিক্রমী দ্যোতিত" বলে অভিহিত করার প্রস্তাব করেছি সস্যুর তার ধ্রুপদী অপরিহার্যতা মেনে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, "স্বাতিক্রমী" দ্যোতিত নিজেকে দ্যোতক হিসেবে বা নিজের জন্য অপর কোনো দ্যোতককে নির্দেশ করে না।

এটি চিহ্নের শেকলকে অতিক্রম করে। দ্যোতক হিসেবে এর আর কোনো ভূমিকা থাকে না। পক্ষান্তরে যে-মুহূর্তে কেউ স্বাতিক্রমী দ্যোতিতের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও স্বীকার করে নেন যে, প্রত্যেক দ্যোতিত দ্যোতকের অবস্থানে বিরাজমান, সে-মুহূর্তে দ্যোতিত ও দ্যোতক২-এর পার্থক্য গোড়াতেই সমস্যাসঙ্কুল হয়ে ওঠে। এ-বিষয়টি অত্যন্ত বিচক্ষণ বিচারের দাবী রাখে এজন্যে যে : (ক) একে অবশ্যই অধিবিদ্যার সমগ্র ইতিহাসের দুঃসাধ্য অবিনির্মাণ (Deconstruction) প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে, যে-অধিবিদ্যা অতীতে এবং ভবিষ্যতেও চিহ্নবিজ্ঞান ও সামগ্রিকভাবে "স্বাতিক্রমী দ্যোতিত"র মৌলিক গবেষণা এবং একটি ভাষানিরপেক্ষ ধারণা সৃষ্টির পথে সমস্যা সৃষ্টি করবে। মনে রাখতে হবে এই অনুসন্ধানের প্রয়োজনের জন্ম কোনো দার্শনিক কচকচি থেকে নয়। বরং এর সৃষ্টি হয়েছে যেসব সূত্র অধিবিদ্যার ইতিহাস ও পদ্ধতির সাথে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আমাদের "ভাবনা সংগঠন"কে গ্রথিত করেছে তাদের দ্বারা ; (খ) তাছাড়া এটা সব জায়গায় ও সব সরল ক্ষেত্রেই দ্যোতিত ও দ্যোতককে গুলিয়ে ফেলার প্রশ্নও নয়। এ বিপ্রতীপ বা পার্থক্য র‍্যাডিক্যাল বা পরম হতে পারবে না—এ-সিদ্ধান্তও এদের সক্রিয় হওয়ার বেলায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না, এমনকি একটা নির্দিষ্ট পরিধিতে এর প্রয়োজন একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়ে—যে-পরিধি আবার খুবই বিস্তৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এর অনুপস্থিতিতে কোনো অনুবাদই সম্ভব নয়। ফলে স্বাতিক্রমী দ্যোতিতের ধারণাটি রূপ লাভ করেছে একটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও ব্যর্থকতাহীন অনুবাদের সম্ভাবনার দিগন্তে। যে সীমার মধ্যে স্বাতিক্রমী দ্যোতিতের অস্তিত্ববান হওয়া সম্ভব বা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব বলে মনে হয়, সেই সীমার আওতায়ই অনুবাদে দ্যোতক ও দ্যোতিতের পার্থক্য অনুশীলিত হয়। কিন্তু যদি এ-পার্থক্য কখনোই শুদ্ধ না-হয় তবে বুঝতে হবে অনুবাদও শুদ্ধ নয়। তখন অনুবাদের জায়গায় একে প্রতিস্থাপিত করতে হবে রূপান্তর-এর ধারণা দিয়ে, যা বোঝাবে : এক ভাষা কর্তৃক অপর ভাষার নিয়ন্ত্রিত রূপান্তর বা এক রচনা কর্তৃক অপর রচনার। আর দ্যোতনা-যন্ত্রের স্পর্শীবহীন অক্ষতযোনি দ্যোতিতদের একভাষা থেকে আরেক ভাষায় বা সে-ভাষাতেই "চালান" করার ব্যাপারে অতীতে যেমন আমাদের করার কিছু ছিলো না তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবে না।

২. ধ্বনিমূলক উপাদানকে বন্ধনীর ভেতরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সত্ত্বেও ("ভাষার জন্য যা অপরিহার্য, অবশেষে আমরা দেখব ভাষাচিহ্নের ধ্বনিমূলক চরিত্রে তা আবার প্রকৃতিগত নয়" [পৃ: ২১])। "মৌলিক চরিত্রে"র দিক থেকে এটি [ভাষাতাত্ত্বিক দ্যোতক] একেবারেই ধ্বনিগত নয় [পৃ: ১৬৪])) সস্যুর সম্পূর্ণ আধিবিদ্যক যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বচন এবং সেইসাথে ধ্বনি র সাথে চিহ্নকে যুক্ত করে এমন সবকিছুকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি চিন্তা ও কণ্ঠস্বর এবং অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে "প্রাকৃতিক যোগসূত্র"র কথা বলেছেন (পৃ: ৪৬)। তিনি এমনকি "ভাবনা-ধ্বনি"র কথাও উল্লেখ করেছেন (পৃ: ১৫৬)। এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি

কিভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয় এবং কোন কোন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে অন্যত্র আমি তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। যে-ক্ষেত্রেই ভাষাতত্ত্বকে সাধারণ চিহ্নতত্ত্বের নিয়ন্ত্রক মডেল এবং "ছাঁচ" হিসেবে উপস্থিত ক'রে, এটি *Course*-এর জটিল উদ্দেশ্যের সাথে বিরোধ ঘটায়, যেখানে ন্যায়ত ও তত্ত্বগত দিক থেকে এর (ভাষাতত্ত্বের) অধিকার রয়েছে চিহ্ন-বিজ্ঞানের অংশমাত্র হওয়ার। স্বৈরীর (arbitrary) থিম এভাবেই এর সবচেয়ে ফলদায়ক পথ (বিন্যস্তকরণ) থেকে সরে গিয়ে একধরনের ক্রমবর্ধমান উচ্চক্রমিক সম্পর্কের পথ ধরে : "এভাবে আমরা বলতে পারি সম্পূর্ণ স্বৈরী চিহ্নসমূহই চিহ্নতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে ; কারণ, ভাষা অভিব্যক্তির পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও বিস্তৃততম ; এবং সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলকও বটে। এদিক থেকে ভাষাতত্ত্ব সব চিহ্নতত্ত্বের সাধারণ ছাঁচ হতে পারে, যদিও ভাষা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিমাত্র" (পৃ: ১০১)। হেগেলে আমরা ঠিক একই প্রয়াস ও একই ধারণা পাই। *Course*-এর দুই মুহূর্তের এই স্ববিরোধ সস্যুরের দৃষ্টি এড়ায়নি। অন্যত্র তিনি বলেছেন : "ব্যাপারটা এরকম নয় যে ভাষার কথ্যরূপ মানুষের জন্য স্বাভাবিক। মানুষের জন্য যা স্বাভাবিক তা হলো তার মধ্যে সৃষ্ট ভাষাগঠনের একটি বিভাগ, অর্থাৎ কতোগুলি নির্দিষ্ট চিহ্নের একটি পদ্ধতি…" অর্থাৎ যে-কোনো উপাদান, যেমন ধ্বনির নিরপেক্ষ সঙ্কেতন ও উচ্চারণ (articulation) এর সম্ভাবনা।

৩. চিহ্নের ধারণার (দ্যোতক/দ্যোতিত) অন্তর্গত প্রকৃতির মধ্যেই ধ্বনিবস্তুকে তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্য দেয়ার ও ভাষাতত্ত্বকে চিহ্নতত্ত্বের "ছাঁচ" হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন বিদ্যমান। ফলে দ্যোতিত-ধারণার চিন্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত উপাদান ধ্বনি দ্যোতনাকারী উপাদান হিসেবে সচেতনে প্রেরিত হয়। বিষয়টিকে এভাবে দেখলে কণ্ঠস্বরকে সচেতনের সাথে এক করে ফেলতে হবে। যখন আমি কথা বলি, তখন নিজের ভাবনার সাথে উপস্থিত আছি সে-বিষয়েই যে শুধু সচেতন থাকি তাই নয়, বরং আমার কথা যেন ভাবনা বা "ধারণা"র যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে সচেতন থাকি সে-বিষয়েও। এ-"ধারণা" হচ্ছে একটি উপযুক্ত দ্যোতকের ধারণা, যা উচ্চারিত হয়েই হারিয়ে যায় না, বরং প্রকাশ করা মাত্রই যাকে আমি শুনতে পাই, যা নির্ভর করে আমার বিশুদ্ধ ও স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর এবং যে-দ্যোতকের জন্য দরকার নেই কোনো যন্ত্রের, বাইরের জগত থেকে ধার করা কোনো অনুষঙ্গের। এখানে দ্যোতক ও দ্যোতিতকে শুধু যে একাত্ম মনে হয় তাই নয়, এই বিভ্রান্তির মাঝে থেকে ধারণা নিজে যা, তা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য দ্যোতক নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলে বা স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং নির্দেশ করে শুধুমাত্র ধারণার উপস্থিতিকে। এখানে দ্যোতিকের বহিরাঙ্গিকতা যেন হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই এ-ধরনের অভিজ্ঞতা একধরনের টোপের কাজ করে, তবে এটা এমন এক টোপ যার প্রয়োজন সংগঠিত করেছে একটি সম্পূর্ণ কাঠামো কিংবা একটি সম্পূর্ণ যুগের, এবং এই যুগের ওপর

ভিত্তি করেই একটা চিহ্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ধারণা ও মৌলিক পূর্বানুমানসমূহকে আরিস্তুতল, রুশো, হেগেল প্রমুখ—প্লেটো থেকে হুসার্ল পর্যন্ত সব দার্শনিক—থেকে সহজেই আলাদা ক'রে চিনে নেয়া যায়।

৪. দ্যোতকের বহিরাঙ্গিকতাকে হ্রাস করার অর্থ মনোগত নয় এমন সবকিছু থেকে চিহ্নতাত্ত্বিক অনুশীলনকে বের করে দেয়া। এখন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নকে যে-অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতেই সস্যুরের "ভাষিক চিহ্ন হচ্ছে দ্বিপিঠ সংবলিত একটি মনোগত সত্তা" (পৃ: ৯৯) প্রস্তাবটি উচ্চারিত হতে পারে। ধরা যাক এ-প্রস্তাবের স্বগত ও সম্ভাব্য উভয়তই একটি অনড় মানে রয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে ধ্বনিভাষিক বা অন্য যে-কোনো চিহ্নের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব আদৌ প্রযোজ্য কিনা। একইভাবে একমাত্র ধ্বনিতাত্ত্বিক চিহ্নকে সবধরনের চিহ্নের "ছাঁচ" না-ধরে চিহ্নশাস্ত্রকে মনোবিজ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক, এ-বিষয়ে সস্যুর যা বলেছেন : "এভাবেই একজন একটি বিজ্ঞানকে ধারণ করবেন যা সমাজজীবনের অন্তর্প্রদেশে চিহ্নের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবে; গঠন করবে সমাজমনোবিজ্ঞানের একটি শাখার, এবং যা অবশেষে পরিগঠিত হবে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে; আমরা একে চিহ্নশাস্ত্র (গ্রীক *semeion* থেকে "চিহ্ন") নামে আখ্যায়িত করবো। এ-শাস্ত্র আমাদের চিহ্ন কী দিয়ে তৈরী, কোন কোন নিয়মে এরা নিয়ন্ত্রিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দেবে। যেহেতু এখনও এর অস্তিত্ব নেই, তাই কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় এটি কী রকম হবে; কিন্তু এর থাকার অধিকার রয়েছে, এবং এর জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ভাষাতত্ত্ব এই সাধারণ বিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র, চিহ্নশাস্ত্র যে-নিয়মগুলো আবিষ্কার করবে সেগুলো ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং এটি অবশেষে মানবজীবনের সামগ্রিক বাস্তবতায় নিজের জন্য একটি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ক্ষেত্র খুঁজে নেবে। আর মনোবিজ্ঞানীরই কাজ হবে চিহ্নতত্ত্বের জন্য সঠিক স্থানটি নির্ধারণ করা" (পৃ: ৩৩)।

অবশ্যই আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ও চিহ্নতাত্ত্বিকরা সস্যুরের অনুগামী নন, তাঁদের কাছে সস্যুরীয় "মনস্তত্ত্ববাদ"-এর কোনো মূল্য নেই আর কোপেনহেগেন ঘরানা ও মার্কিনী ভাষাতত্ত্বে তো রয়েছে সস্যুরের বিস্তারিত সমালোচনা। কিন্তু সস্যুরের ওপর আমার জোর দেয়ার কারণ একেবারেই এই নয় যে যাঁরা তাঁর সমালোচনায় পঞ্চমুখ তাঁরাও তাঁকে চিহ্নতত্ত্বের জনক হিসেবে স্বীকার করেন এবং তাঁদের বেশিরভাগ ধারণা সস্যুরের কাছ থেকেই ধার করা। বরং এ-কারণেই যে, চিহ্নের ধারণার "মনস্তাত্ত্বিক" ব্যবহারকে খারিজ করার মতো বিষয় বলে আমার মনে হয় না। মনস্তত্ত্ববাদ একটা ভালো ধারণার খারাপ ব্যবহারমাত্র নয়, বরং এটি চিহ্নের ধারণার মধ্যেই উৎকীর্ণ থাকে আর এর প্রয়োগেও মনস্তত্ত্ববাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেই একই স্ব্যর্থক ভঙ্গিতে—এ-প্রশ্নের উত্তরে শুরুতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। চিহ্নের মডেলের ওপর এ-দ্ব্যর্থকতা একধরনের বোঝার মতো। কিন্তু এ-দ্ব্যর্থকতাই আবার স্বয়ং "চিহ্নতাত্ত্বিক"-প্রকল্প

ও এর ধারণাসমূহের গাঠনিক সমগ্রতাকে শনাক্ত করে। বিশেষত জ্ঞাপনের সমগ্রতাকে যা কার্যত, চলনসঙ্গাত এক পরিবহতার ইঙ্গিত দেয়—যে-পরিবহতা সরণপ্রক্রিয়া ও চিহ্নিতকরণক্রিয়া থেকে পৃথকযোগ্য দ্যোতিত বস্তু, অর্থ বা ধারণার পরিচয় এক বিষয়ী থেকে অপর বিষয়ীতে প্রেরণ করে। জ্ঞাপন আগে থেকেই বিষয়ী (যার পরিচয় ও উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া শুরুর আগেই গঠিত হয়ে গেছে) এবং বিষয় (দ্যোতিত ধারণা ও একটি ভাবনা-অর্থ যাকে গঠন বা রূপান্তর করার ক্ষমতা জ্ঞাপনের সরণক্রিয়ার থাকে না) ধরে নেয়। *A* জ্ঞাপন করে *B*-কে *C*-এর কাছে। চিহ্নের মাধ্যমেই প্রেরক গ্রাহককে কোনো কিছু জ্ঞাপন করে, ইত্যাদি।

কিন্তু এছাড়া কাঠামো র ধারণার যে প্রসঙ্গ আপনি তুলেছেন তা আরও ধোঁয়াটে। পুরো ব্যাপারটিই নির্ভর করছে একে (কাঠামোর ধারণা) কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন তার ওপর। চিহ্ন ও সেইসূত্রে চিহ্নতত্ত্বের ধারণার মতোই কাঠামোর ধারণাও অর্থ-কেন্দ্রিক ও প্রক্সকেন্দ্রিক নিশ্চিতকে দৃঢ় করতে পারে—আবার একইসাথে পারে কাঁপিয়ে দিতে। তাছাড়া আমাদের সমস্যা এ-ধারণাগুলোকে ফেলে দেয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নয়, আর এ-কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলোও আমাদের হাতে নেই। নিঃসন্দেহে আজকে যে-বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব পাবার অধিকার রাখে তা হলো চিহ্নতত্ত্বের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে আমাদের কাজের একটি সংশোধিত ক্ষেত্র ও নতুন সব পরিকল্প গঠন করা। এই সংস্কার সাধিত হবে ধারণার রূপান্তর ও বিচ্যুতি, যেসব পূর্বানুমানের ওপর এরা প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদের বিরুদ্ধেই এদের প্রয়োগ এবং নতুন শৃঙ্খলায় এদের পুনর্স্থাপনের মাধ্যমে। আজকাল যাকে বলা হয় "জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাঙন" সে-ধরনের কোনো দ্ব্যর্থহীন ভাঙচুরে আমি বিশ্বাসী নই। যে-কোনো ভাঙচুরই সবসময়ই ফিরে আসে পুরোনো পোশাকে, আরও মারাত্মকভাবে। একে ক্রমাগত ও বারবার উন্মোচন করে যেতে হবে। এই উন্মোচন কোনো আকস্মিক বা অনিশ্চিত ব্যাপার নয় বরং তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রয়োজনীয় ও পদ্ধতিগত ক্রিয়া। এটি নির্দিষ্ট কিছু ভাঙচুরের প্রয়োজনীয়তা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং নতুন কাঠামোসমূহের আবির্ভাব ও সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব কোনো অর্থেই হ্রাস করে না…

ক্রিস্তেভা : "উপস্থিতিহীনতার নতুন কাঠামো" হিসেবে লিখনচিহ্নের সংজ্ঞা কী? অপেক্ষা হিসেবে লেখার সংজ্ঞা কী? চিহ্নতত্ত্বের এই ধারণাগুলো এর চাবিধারণা (ধ্বনিতাত্ত্বিক) চিহ্ন ও কাঠামোয় কী কী ফাটল ধরিয়েছে? লিখনতত্ত্বে রচনার ধারণার প্রচলন কিভাবে প্রতিস্থাপিত করেছে প্রস্তাবনার ভাষাতাত্ত্বিক ও চিহ্নতাত্ত্বিক ধারণাকে?

দেরিদা : লেখার সংকোচন দ্যোতকের বহিরাঙ্গিকতার সংকোচনের মতোই ধ্বনি-তত্ত্ববাদ ও অর্থকেন্দ্রিকতাবাদের অপরিহার্য অংশ। আমরা জানি সস্যুর কিভাবে প্লাতো, আরিস্ততল, রুশো, হেগেল ও হুসার্ল প্রমুখের ঐতিহ্য অনুসরণ করে লেখাকে

ভাষা ও বচন (speech) তথা ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র থেকেই বিদায় করেছিলেন। পূর্বোক্ত পূর্বসূরীদের মতোই লেখা তাঁর কাছে ছিলো বাইরের উপস্থিতির মতো অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক ঘটনা : "ভাষাকে লিখিত ও উচ্চারিত শব্দসংযোগে গঠিত বস্তু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না— এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দ্বিতীয়টিই একে গঠন করে" (পৃ: ৪৫); "[ভাষার] অভ্যন্তরীণ সংগঠনে লেখা একটি বহিরাগত বস্তু" (পৃ: ৪৪); "লেখা ভাষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তমসাচ্ছন্ন করে : ভাষাকে এটি কোনো পোশাক পরায় না, বরং এর অক্ষম অনুকরণ করে" (পৃ: ৫১)। ভাষার সাথে লেখার বন্ধন আসলে "ভাসা ভাসা," "কৃত্রিম।" এটা একটা "অদ্ভুতুড়ে" ব্যাপার যে লেখার যেখানে হওয়ার কথা ছিলো একটা "প্রতিফলন" মাত্র তাই "দখল করে বসেছে মূল ভূমিকা" ফলে "উল্টে গিয়েছে স্বাভাবিক সম্পর্ক" (পৃ: ৪৭)। লেখা হচ্ছে একটা "ফাঁদ," এর কাজ "বীভৎস," "স্বৈরাচারী।" রাক্ষুসে কুকর্মের কারণে এতে জন্ম নিয়েছে "বিকলাঙ্গ বস্তু"। "ভাষাতত্ত্বের উচিত এদের একটি বিশেষ বিভাগে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা" (পৃ: ৫৪), ইত্যাদি। এসব বিবৃতি লেখা সম্পর্কে যে-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে স্বাভাবিকভাবেই তা ("ভাষা ও লেখা বস্তুত দু'টি স্বতন্ত্র চিহ্নপদ্ধতি, যেখানে দ্বিতীয়টির অ স্তি ত্বে র উ দ্দে শ্য ই হচ্ছে প্রথমটির প্র তি নি ধি ত্ব করা" (পৃ: ৪৫) ধ্বনিবর্ণমালাকেন্দ্রিক লেখার চর্চার সাথে যুক্ত—যে-বিষয়ে সস্যুর উপলব্ধি করেছেন তাঁর পড়াশোনা "সীমিত" (পৃ: ৪৮)। ফলে বর্ণমালাকেন্দ্রিক লেখা বচনকে উপস্থিত করে বলে মনে হয় এবং একই সাথে এও মনে হয় যে বচনের উপস্থিতিতে লেখা নিজেকে মুছে ফেলে। আসলে যা প্রমাণ করা যেতো এবং যা আমি চেষ্টাও করেছি—বিশুদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক লেখা বলে কিছু নেই এবং ধ্বনিতত্ত্ববাদ যতোটা একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে অক্ষর অনুশীলনের ফল, তার চেয়ে বেশি ওই অনুশীলনজাত একটি নির্দিষ্ট নৈতিক ও স্বতোসিদ্ধমূলক অ ভি জ্ঞ তা। লেখার উচিত প্রাণময় বচনের পূর্ণতার কাছে নিজেকে মুছে ফেলা, যে প্রাণময় বচন (Living speech), সঙ্কেতলিপির স্বচ্ছতায় নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয় যে-ব্যক্তি এটি উচ্চারণ করছে ও যে-ব্যক্তি গ্রহণ করছে এর অর্থ, বিষয় ও মূল্য উভয়েরই তাৎক্ষণিক প্রতিনিধি হিসেবে।

এখন, কেউ যদি ধ্বনিতাত্ত্বিক লেখার মডেলে নিজেকে সীমিত রাখা থেকে বিরত হন—আমাদের প্রত্নকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণেই যে-মডেলের প্রতি আমরা পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি—এবং বিশুদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক লেখা বলে কিছু নেই এই সত্যি থেকে যদি সব উপসংহারগুলো টানি (লেখ একক ইত্যাদির কাজে অপরিহার্য চিহ্ন, যতি, বিরতি ও পার্থক্যের বিন্যাসের কারণে) তাহলে ধ্বনিতত্ত্ববাদ ও অর্থকেন্দ্রিকতার সমস্ত যুক্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। এদের বৈধতার পরিসর হয়ে ওঠে সঙ্কীর্ণ ও ভাসা-ভাসা। সস্যুরের মতোই কেউ যদি ন্যূনতম সংগতির সাথে পার্থক্যের নীতিগুলোকে বুঝতে চায় তবে তার জন্য এই সঙ্কীর্ণতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এ নীতি আমাদের একটি

উপাদানকে বাদ দিয়ে (এখানে লৈখিক—তথাকথিত স্থানিক উপাদান) অপরটিকে (এখানে ধ্বনি—তথাকথিত কালিক উপাদান) অগ্রাধিকার না-দিতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, পার্থক্যের এ নীতির কারণেই আমরা চিহ্নিতকরণের প্রত্যেক প্রক্রিয়াকে পার্থক্যের রূপবন্ধগত অনুশীলন হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হই। একে সুপ্তচিহ্নের অনুশীলনও বলা যায়।

সুপ্তচিহ্ন কেন? আর কী-অধিকারেই বা আমরা লিখনতত্ত্বের পুনঃপ্রচলন ঘটাচ্ছি—যখন ধ্বনিগত, লৈখিক ও অন্যান্য সব উপাদানের পূর্ণ নিরপেক্ষায়ন ঘটিয়েছি বলে মনে হচ্ছে? এটা অবশ্যই লেখার সেই একই পুরোনো ধারণায় আশ্রয়গ্রহণ কিংবা যে-অপ্রতিসাম্য এখন সমস্যাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে অবস্থান উল্টে দিয়ে তার সমাধানের প্রশ্ন নয়। লেখার একটি নতুন ধারণা দাঁড় করানোকে ঘিরেই এখনকার প্রশ্ন। এই ধারণাকে লি খ ন চি হ্ন বা অ পে ক্ষ খা নামে ডাকা যেতে পারে। পার্থক্যের অনুশীলনের পরিণতিতে অনুমিত সংশ্লেষক ও নির্দেশকের যে-কোনো মুহূর্তে বা যে-কোনো অর্থে প্রত্যেক সাধারণ উপাদানেরই শুধুমাত্র নিজের জন্য অথবা নিজেকে নির্দেশ করে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বচন বা লেখা উভয় শৃঙ্খলাতেই কোনো মৌল উপাদান স্রে ফ উ প স্থি ত নয় এমন আরেকটি উপাদানকে নির্দেশ করা ছাড়া চিহ্ন হিসাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে না। আন্তর্বুননের ফলে কাঠামোর প্রত্যেক "মৌলিক উপাদান" তথা লেখ একক বা ধ্বনি একক শৃঙ্খলার (বা পদ্ধতির) অন্যান্য মৌলিক উপাদানগুলোর সুপ্তচিহ্ন বহনের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই আন্তর্বুনন বা বুনটই হচ্ছে রচনা, যা উৎপন্ন হয়েছে শুধুমাত্র আরেকটি রচনার রূপান্তরের মধ্যে। তাই উপাদান বা পদ্ধতির কোথাও স্রেফ উপস্থিত বা অনুপস্থিত বলে কিছু নেই, বরং সর্বত্র যা আছে, তা হলো সুপ্তচিহ্নের পার্থক্য ও সুপ্তচিহ্নের সুপ্তচিহ্নসমূহ। আর তাই চিহ্নতত্ত্বের সবচেয়ে সাধারণ ধারণা হচ্ছে লিখনচিহ্ন—যা এভাবে অবশেষে হয়ে ওঠে লিখনতত্ত্ব এবং সঙ্কীর্ণতম অর্থে লেখার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সমগ্র ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। লিখনচিহ্নের ধারণার নিজেকে চিহ্নিত করা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষমতা অন্যান্য ধারণাগত উপাদান থেকে বেশি নয়—তাই সবসময়ই এর একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক পরিপ্রেক্ষিত থাকবে —এ-শর্তে লিখনচিহ্নের ধারণার যে-সুবিধাটি তৈরি হয় তা হলো, এটি নীতিগতভাবে "চিহ্ন" র ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রবণতাকে নাশ করে এবং "লৈখিক-বস্তু" পুরো বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকে (অর্থাৎ পশ্চিম অতিক্রম করে লেখার পদ্ধতি ও ইতিহাস) উন্মুক্ত করে ভা র সা ম্য নি য়ে আ সে। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রের সম্ভাবনা একেবারেই সঙ্কীর্ণ না-হওয়া সত্ত্বেও একে এতোদিন অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিলো।

সুতরাং অ পে ক্ষ খা হিসেবে লিখনচিহ্ন পরিণত হচ্ছে এমন একটি কাঠামো ও চলনে, উপস্থিতি/অনুপস্থিতির বিপ্রতীপের ভিত্তিতে, যার স্বরূপ আর ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। পার্থক্য, পার্থক্যের সুপ্তচিহ্ন ও বিন্যাসের (যার মাধ্যমে মৌলিক

উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়) পদ্ধতিগত ক্রিয়া হচ্ছে অপেক্‌খা। বিন্যাস হচ্ছে বিরতিসমূহের যুগপৎ সক্রিয় ও অক্রিয় (উল্লেখ্য এখানে differance (অপেক্‌খা) এর a, এই সক্রিয়তা ও অক্রিয়তাসংক্রান্ত দ্বিধার প্রতি ইঙ্গিত করে। অপেক্‌খার ওপর এ-বিপ্রতীপের যেমন নিয়ন্ত্রণ নেই তেমনি একে এদের মধ্যে ভাগও করে দেয়া যায় না)৩ উৎপাদন, যাকে ছাড়া "পূর্ণ" পদগুলো (term) অর্থবহ হবে না বা ক্রিয়া করবে না। আবার এটা বাচনিক শৃঙ্খলার হয়ে ওঠা স্থানও বটে, যাকে কালিক (temporal) বা রৈখিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই হয়ে ওঠা স্থানই সম্ভব করে তোলে লেখাকে, এবং বচন ও লেখার একটি থেকে আরেকটিতে গমন ও এদের মধ্যে সবধরনের যোগাযোগকে।

এখানে Différance (অপেক্‌খা)-এর a দিয়ে যে-সক্রিয়তা ও উৎপাদনশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা পার্থক্যের (difference) অনুশীলনের সৃজনশীল চলনকে নির্দেশ করে। পরেরটি (difference) আকাশ থেকে পড়েনি কিংবা এটি অংশও নয় কোনো বদ্ধ পদ্ধতির, যা খতিয়ে দেখার জন্য একটা শ্রেণীবিভাজিত ও সমলয়ী ক্রিয়াই যথেষ্ট ছিলো। পার্থক্য হচ্ছে রূপান্তরেরই ফল। এর এই সুবিধাজনক অবস্থানের কারণেই অপেক্‌খার থিম স্থায়ী, সমলয়ী, বৈজ্ঞানিক-শ্রেণীবিভাজিত ও ঐতিহাসিক মোটিফসম্বলিত কাঠামোর ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এটা বলাই বাহুল্য, কাঠামো শুধুমাত্র এই মোটিফ দ্বারাই সংজ্ঞায়িত হয় না, এবং পার্থক্যের ফসল অপেক্‌খা কাঠামোবিহীন নয়: অপেক্‌খা জন্ম দেয় পদ্ধতিগত ও নিয়ন্ত্রিত রূপান্তরসমূহের, যা একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কাঠামোগত বিজ্ঞানের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়ায় সক্ষম। অপেক্‌খার ধারণা এমনকি "কাঠামোবাদ"-এর জন্য সবচাইতে বৈধ নৈতিক পরিস্থিতিও তৈরি করে।

সুতরাং ভাষা এবং সাধারণভাবে যে-কোনো চিহ্নতাত্ত্বিক সঙ্কেত হচ্ছে কার্য, সস্যুর যাদের অভিহিত করেছেন "শ্রেণীবিভাজন" নামে—কিন্তু অপেক্‌খার চলনের বাইরে কোথাও উপস্থিত কোনো বিষয়, বস্তু কিংবা সত্তা এই কার্যের কারণ হিসেবে কাজ করে না। যেহেতু চিহ্নতাত্ত্বিক অপেক্‌খার বাইরে বা আগে কোনো "উপস্থিতি" নেই, সেহেতু চিহ্নের সাধারণ সংগঠন সম্পর্কেই সস্যুরের ভাষাসম্পর্কিত এই বিবৃতিটি খাটতে পারে: "বচনকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করা এবং এর আর-সব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভাষার প্রয়োজন; কিন্তু ভাষাপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বচনের, ঐতিহাসিকভাবে যদিও বচনই আসে আগে।" এখানে একটি চক্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, কেউ যদি ভাষা ও বচন, সঙ্কেত ও সংবাদ, পরিকল্প ও ব্যবহারের প্রত্যেক জোড়কে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে এদের প্রত্যেকটির নিরপেক্ষ বিচারে ব্রতী হয় তবে সে শুরুর বিন্দু খুঁজে পাবে না, বুঝতে পারবে না ভাষা বা বচনের—সাধারণভাবে কোনোকিছুরই—শুরু কিভাবে ঘটে থাকে। সুতরাং ভাষা ও বচন, সঙ্কেত ও সংবাদ ইত্যাদিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন (এবং বিচ্ছিন্নের আনুষাঙ্গিকসহ) করার আগে পার্থক্যের একটি পদ্ধতিগত

উৎপাদন, পার্থক্যের পদ্ধতির উৎপাদন—অর্থাৎ অপেক্খাকে স্বীকার করে নিতে হবে—আর অপেক্খার কার্যকারিতার আওতায় বিমূর্ততা ও স্থির উদ্দেশ্যের সাহায্যে একসময় আমরা সক্ষম হবো ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও বচনের ভাষাতত্ত্বের পরিধিনির্ণয়ে, ইত্যাদি।

তাই অপেক্খা ও বিন্যাস (spacing)-এর পূর্ববর্তী উপস্থিত ও পার্থক্যহীন কোনো সত্তা নেই। অপেক্খার মধ্যস্থতাকারী, রচয়িতা বা প্রভু বলে এমন কোনো জিনিস নেই শেষ পর্যন্ত যার স্থান অভিজ্ঞতাবাদী অপেক্খা দখল করতে পারে। বিষয়ীমুখীনতা—বিষয়মুখীনতার মতোই—অপেক্খার ফল, এবং এটি অপেক্খার পদ্ধতিতেই ফল হিসেবে উৎকীর্ণ থাকে। তাই *différance* (অপেক্খা) এর *a* এও নির্দেশ করে যে বিন্যাস আবার কালিক বিন্যাসও, এবং একই সাথে নির্দেশ করে একটি পথের ছক ও বিরতিকে, যার মাধ্যমে স্বজ্ঞা, অবধারণ ও সম্পূর্ণতাকে—এক কথায়, বর্তমানের সাথে সম্পর্ক, বর্তমান বাস্তব ও একটি অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ—স্থগিত করা হয়। পার্থক্যের মৌল নীতি অনুযায়ীই স্থগিতকরণ সম্পন্ন হয়। এ-নীতি অনুসারে একটি মৌল উপাদান সুপ্তচিহ্নকে যথাসম্ভব কম ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আরেকটি কোনো উপাদানকে নির্দেশ কোরেই কেবলমাত্র এর যাবতীয় কাজ অর্থাৎ দ্যোতিত করা, অর্থগ্রহণ ও জ্ঞাপন ইত্যাদি সম্পন্ন করতে পারে। অপেক্খার এই মিতব্যয়ী প্রবণতা একটি নির্দিষ্ট অসচেতন হিসাবকে একাধিক শক্তির একটি ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য নিয়ে আসে। অপেক্খার এই মিতব্যয়ী দিক এর অপর তুলনামূলক সঙ্কীর্ণ চিহ্নতাত্ত্বিক দিকের সাথে অচ্ছেদ্য। বিষয়ী, বিশেষত চেতন ও কথক যেন পার্থক্যের পদ্ধতি ও অপেক্খার চলনের ওপর নির্ভর করে তা অপেক্খার মিতব্যয়িতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সাথে বিষয়ী যাতে উপস্থিত না থাকে, সর্বোপরি এর নিজের কাছে নিজের উপস্থিতি যেন অপেক্খার সামনে নেই হয়ে যায় এবং বিষয়ী যেন নিজের থেকে বিভাজিত হয়ে স্থান, কালিকবিন্যাস ও নির্দেশক-এ রূপায়িত হয় সেদিকেও এটি লক্ষ্য রাখে এবং নিশ্চিত করে ভাষাসম্পর্কিত সসুরের এ-সিদ্ধান্তটিকে : "ভাষা [যা শুধুমাত্র পার্থক্য দিয়ে তৈরি] কথকের ক্রিয়া নয়।" যে-মুহূর্তে অপেক্খা ও এর সাথে যুক্ত শূন্যস্থল সক্রিয় হয়ে ওঠে সে-মুহূর্তে অধিবিদ্যার সবকটি বিপ্রতীপ (দ্যোতক/দ্যোতিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য/বুদ্ধিগ্রাহ্য, লেখা/বচন, অক্রিয়তা/সক্রিয়তা ইত্যাদি) মূল্যহীন হয়ে পড়ে ততোদূর পর্যন্ত যতোদূর এরা শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো 'উপস্থিতি'র (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিষয়ীর সব ক্রিয়ায় এর নিজের উপস্থিতির ধরনে, প্রত্যেক আপাতিকতা ও ঘটনা, এর "সজীব বচন" ও প্রস্তাবনাসমূহ, এর ভাষায় উপস্থিত বিষয় ও ক্রিয়ার পেছনে এর উপস্থিতি) প্রতি নির্দেশ করে। এ বিপ্রতীপগুলো কোনো-এক-সময়ে প্রাক্-অপেক্খা একটি মূল্য বা অর্থের মূল্যায়ন করে অপেক্খার চলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অপেক্খার পূর্ববর্তী এ-অর্থ বা মূল্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অপেক্খার চেয়ে

মৌলিক, অতিক্রমী ও এর নিয়ন্ত্রক। এ হচ্ছে এখনো পর্যন্ত তারই উপস্থিতি, ওপরের আলোচনায় যাকে আমরা অভিহিত করেছি "স্বাতিক্রমী দ্যোতিত" নামে।

ক্রিস্তেভা : বলা হয় যে "অর্থ"র অবভাসতাত্ত্বিক ধারণা এবং চিহ্নতত্ত্বে "অর্থ"র ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন দিক থেকে তাহলে এরা পরস্পরের সম্পূরক, এবং চিহ্নতাত্ত্বিক প্রকল্পের আন্তঃআধিবিদ্যক সীমা কতোদূর ?

দেরিদা : এটা ঠিকই যে "অর্থ"র ধারণার অবভাসতাত্ত্বিক বিস্তারকে প্রথম দৃষ্টিতে খুবই বিস্তৃত ও অনেক কম অনড় বলে মনে হয়। সব অভিজ্ঞতাই অর্থ করার (meaning = Sinn) অভিজ্ঞতা। সচেতনে ধরা পড়ে এবং সচেতনের-জন্য-গৃহীত এমন সবকিছুই হচ্ছে অর্থ। অর্থ হচ্ছে অবভাসের অবভাসিকতা। হুসার্ল তাঁর *Logical Researches*-এ Frege-কৃত *sinn* ও *Bedeutung*-এর পার্থক্যকে নাকচ করে দিয়েছেন। পরে অবশ্য এ-পার্থক্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিলো, যদিও একে তিনি Frege-র মতো করে বোঝেননি। এ-স্বাতন্ত্র্য তাঁর জন্য অর্থের দু'দিকের বিভাজনরেখা হিসেবে কাজ করেছে—যার এপারে রয়েছে সবচেয়ে বিস্তৃত পরিসরে অর্থের *(sinn)* সাধারণ তাৎপর্য, আর অপরপারে রয়েছে চিহ্নিতকরণরূপে *(Bedeutung)* অর্থ ; যা যৌক্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রস্তাবনার একটি উপাদান। এই মুহূর্ত থেকেই আপনি যাকে সম্পূরকতা বলেছেন, তার শুরু হতে পারে। নিচের উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

১. হুসার্ল উচ্চারণ (enunciation) বা চিহ্নিত করার যে ইচ্ছা (intention of signification = *Bedeutungs-intention*) থেকে উচ্চারণ "প্রাণময়" হয়ে ওঠে তা থেকে অর্থকে *(sinn* কিংবা *Bedeutung)* আলাদা করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি চিহ্নিতকরণ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) ক্ষেত্র—যার মৌলিকত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও একে নির্বাসিত করেছেন নিজের ন্যায়ব্যাকরণগত সমস্যা থেকে—এবং দ্যোতিত অর্থের ক্ষেত্রের (যা বুদ্ধিগ্রাহ্য, আদর্শ ও "আধ্যাত্মিক") মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানার প্রয়োজন বোধ করেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যদি *Ideas* থেকে উদ্ধৃত প্যারাটিতে আমরা চোখ বুলাই :

> শুরু করা যাক অভিব্যক্তির দু'দিকের সুপরিচিত পার্থক্য দিয়ে। এগুলো হচ্ছে অভিব্যক্তির সংবেদ অর্থাৎ শারীরিক দিক ও অসংবেদ অর্থাৎ "মানসিক" দিক। প্রথমটির বিস্তারিত আলোচনা কিংবা দু'টির সংযোগপন্থার বিশদ ব্যাখ্যায় যাওয়ার দরকার নেই। যদিও এখানে শিরোনাম-আকারে আমরা এমন কিছু অবভাসতাত্ত্বিক সমস্যার ইঙ্গিত পেয়ে গেছি যেগুলো উপেক্ষা করার মতো নয়। এখন আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র "অর্থ" [*Bedeutung = meaning*] এবং "কিছু-একটা-বোঝানো"র *Bedeuten = meaning something*] ওপর নিবদ্ধ রাখবো। এ-শব্দদুটো মূলত বচনের [*sprachliche Sphare = sphare of speech*] "অভিব্যক্তি"র ক্ষেত্রের [*des Ausdruckens = expression*] সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু জ্ঞানের দিকে

প্রায় একটি অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, এসব শব্দের অর্থকে সংশোধন কোরে এমন রূপ দেয়া, যাতে করে এরা একটা নির্দিষ্ট উপায়ে পুরো noetico-noematic ক্ষেত্রের পরিধিতে ও সব কাজের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে, তা এরা অভিব্যক্তির সাথে অন্তর্বিজড়িত [interwoven=*verflochten*] হোক বা না হোক। স্বেচ্ছায় অংশ-নেয়া অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সময় আমরা এ-ব্যাপারটিকেই মাথায় রাখি, ফলে সবই তখন আমাদের "বো ধ" কে অনুসরণ করে বলি। এখানে বো ধ (*sense=sinn*) হচ্ছে সেই শব্দ, যা সাধারণভাবে "অর্থ" (meaning=*Bedeutung*) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথকীকরণের সুবিধার্থে আমাদের প্রস্তাব *Bedeutung*-কে (ধারণার স্তরে অর্থ) পুরনো ধারণা নির্দেশ করার কাজে এবং নির্দিষ্টভাবে বাচনিকরূপে "যৌ ক্তি ক" বা "প্র কা শ মূ ল ক" এই জটিল পদদুটো দিয়ে যা বোঝানো হয় সেই অর্থে গ্রহণ করা হোক। *Sinn* (বোধ বা অর্থ সহজকারী) শব্দটি ভবিষ্যতেও আমরা ব্যবহার করবো; তবে তা আরও বিস্তৃত প্রায়োগিক পরিসরে।[৪]

এভাবেই আমরা দেখি, "দ্যোতিত" বা "অভিব্যক্ত" হোক বা না-হোক এবং চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে আন্তর্বিজরিত হোক বা না-হোক "অর্থ" হচ্ছে একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য কিংবা আধ্যাত্মিক আদর্শিকতা। শেষ পর্যন্ত দ্যোতকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকের সাথে যার সংযুক্তি ঘটতে পারে, কিন্তু এ-সংযুক্তি এর নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় নয়। এর উপস্থিতি, অর্থ বা অর্থের নির্যাস এই আন্তর্বয়নের বাইরে বোধগম্য হয় তখনই, যখন চিহ্নতাত্ত্বিকের মতো রূপতাত্ত্বিকও অর্থ বা দ্যোতিতের একটি বিশুদ্ধ ঐক্য ও সুস্পষ্টভাবে শনাক্তযোগ্য দিকের উল্লেখ করেন।

২. হুসার্লে স্পষ্টভাবে এবং চিহ্নতাত্ত্বিক অনুশীলনে অন্তত পরোক্ষভাবে বিশুদ্ধ অর্থ বা বিশুদ্ধ দ্যোতিতের স্তর নির্দেশ করে অর্থের একটি প্রাকচিহ্ন ও ভাষাপূর্ব স্তরের প্রতি (হুসার্ল যাকে বলেছেন প্রাক—অভিব্যক্তিশীল), যার উপস্থিতি অপেক্ষার ক্রিয়া ও চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির বাইরে ও আগেই উপলব্ধ হয়। চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার কাজ হল এই অর্থকে আলোয় নিয়ে আসা, অনুবাদ ও পরিবহন করা, জ্ঞাপন করা, আকার দেয়া, একে প্রকাশ করা, ইত্যাদি। যে-কোনো দিক থেকেই অবভাস-তাত্ত্বিক এ-ধরনের একটি অর্থ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সচেতনে প্রেরিত হয় অবধারণগত স্বজ্ঞার মাধ্যমে। এ-অর্থ শুরু থেকেই দ্যোতকের অবস্থানে থাকে না, থাকে না অন্বয় ও পার্থক্যের আন্তর্বুননের ভেতর—প্রথম থেকেই যারা এই অর্থ থেকে একটি নির্দেশক, সুস্পষ্টচিহ্ন, লিখনচিহ্ন ও একটি বিন্যাস তৈরি করে। এটা দেখানো যেতো যে অপেক্ষা থেকে অর্থের উপস্থিতিকে যে-কোনো ছন্দে নির্মূল করার প্রচেষ্টার মধ্যেই অধিবিদ্যা নিহিত থাকে এবং একটি বিশুদ্ধ অর্থ বা বিশুদ্ধ দ্যোতিতের স্তর বা এলাকা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এ-প্রয়াস আবার ফিরে আসে। এ-অবস্থায়

চিহ্নতত্ত্বের পক্ষে দ্যোতিতের পরিচয়কে স্রেফ বাতিল করে দেয়া কিভাবে সম্ভব ? ফলে অর্থের সাথে চিহ্নের এবং দ্যোতিতের সাথে দ্যোতকের সম্পর্ক অন্যতম ব হি রা ঙ্গি ক তা বা আরো ভালো হয় বললে হয়ে দাঁড়ায় : হুসার্লের মতে, পরেরটি প্রথমটির অভিব্যক্তি *(Ausdruck)* বা বহির্বয়নে *(Ausserung)* পরিণত হয়। অ ভি ব্য ক্তি র সাথে যখনই ভাষার সমীকরণ ঘটানো হয় যার অর্থ ভেতরের অন্তরঙ্গ দিকটির নির্বাসন, তখনই আমরা আবার ফিরে আসি সেই জটিলতা আর পূর্বানুমানে, যেগুলো এতোক্ষণ সস্যুর প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছিলাম! অ ভি ব্য ক্তি র প্রতি বেশি পক্ষপাত, বিশুদ্ধ ভাষার ক্ষেত্র (ভাষার "যৌক্তিকতা") থেকে "ইঙ্গিত"-এর নির্বাসন ও স্বরের প্রতি বেশি মনোযোগ ইত্যাদির সাথে সমগ্র অবভাসতত্ত্বকে সম্পর্কিত করে যে-ফলাফলগুলো, তাদের সম্পর্কে আমি অন্যত্র ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেছি। এ-পক্ষপাত ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে *Logical Researches*-এ, "বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক ব্যাকরণ" -এর ওপর যা একটি অভূতপূর্ব কাজ এবং সতেরো-আঠারো শতকের "সাধারণ নৈয়ায়িক ব্যাকরণ" থেকে যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্ট ; যদিও এসব পুরোনো ফরাসি প্রকল্পের প্রতি কিছু আধুনিক ভাষাবিদ যথেষ্ট গুরুত্ব নির্দেশ করে থাকেন।

ক্রি স্তে ভা ঃ ভাষা যদি সবসময়েই "অভিব্যক্তি" হয় এবং এর সীমা যদি নির্ধারিত হয় এভাবেই, তাহলে কী ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমে এবং কতোদূর পর্যন্ত অভিব্যক্তি-শীলতাকে অতিক্রম করা সম্ভব ? অনভিব্যক্তির পক্ষে কতোদূর পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব ? লিখনতত্ত্ব কি ভাষাতাত্ত্বিক সঙ্কেতলিপির বদলে যৌক্তিক-গাণিতিক সঙ্কেত-লিপির ওপর ভিত্তি করে অনভিব্যক্তিক "চিহ্নতত্ত্ব" হিসেবে গড়ে উঠতে পারতো না ?

দে রি দা : আমার লোভ হচ্ছে একটি আপাত-বিরোধী পথে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে। এ ক দি কে, অভিব্যক্তিবাদকে কখনোই অতিক্রম করা সম্ভব না, কারণ বাহির-ভিতরের জুটিকে বিপ্রতীপের সহজ কাঠামোয় সংকুচিত করা অসম্ভব ব্যাপার। এই জোড় আসলে অপেক্খার একটি ফল, যেমন ভাষার ফল হচ্ছে এটি নিজেকে প্রকাশমূলক পুনরুপস্থাপন হিসেবে ভেতরে গঠিত বস্তুর বাহ্যিক অনুবাদ হিসেবে উপস্থিত হতে বাধ্য করে। "অভিব্যক্তি" হিসেবে ভাষার উপস্থাপন কাকতলীয় কোনো সংস্কার নয়, বরং এক ধরনের কাঠামোগত আবেশ—কান্ট হলে যাকে হয়তো বলতেন স্বাতিক্রমী বিভ্রম। এই কাঠামোগত আবেশ ভাষা, যুগ ও সংস্কৃতির সাথে বিবর্তিত হয়। এ কথা খুবই সত্যি যে পশ্চিমা অধিবিদ্যা এ-বিভ্রমকে একটি শক্তিশালী পদ্ধতির মধ্যে গ্রথিত করেছে, কিন্তু যদি বলি একমাত্র পশ্চিমা অধিবিদ্যাই এ-কাজ করেছে, তাহলে আবার একটু বেশি বলা হবে। আ রে ক দি কে এবং বিপরীত-ভাবে আমি বলব, যদি অভিব্যক্তিবাদকে কখনো পুরোপুরি অতিক্রম করা সম্ভব না-ও হয়, তাহলেও আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইতিমধ্যেই অভিব্যক্তিশীলতাকে অতিক্রম করা হয়ে গেছে। "অর্থ" (যা "অভিব্যক্ত" হবে) বলতে যা বোঝায় যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থক্যের বুনট দিয়ে তা তৈরি থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত

একটি রচনা অর্থাৎ অন্যান্য রচনার প্রতি রাচনিক উল্লেখের বিন্যাস অর্থাৎ একটি রাচনিক রূপান্তরের অস্তিত্ব থাকে, যেখানে প্রত্যেক কথিত "সহজ পদ" শনাক্ত হয় এতে নিহিত অপর পদের সুপ্তচিহ্ন দ্বারা, বুঝতে হবে অর্থের পূর্বনির্মিত নিগূঢ় অংশকে এর বহিরাঙ্গিকতা দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

এটি সব সময়ই—ইতিমধ্যেই—নিজেকে বহন করে বাইরে নিয়ে আসে। কোনো অভিব্যক্তি ঘটানোর আগেই এটি (নিজের থেকে) পার্থক্য সৃষ্টি করে। এবং শুধুমাত্র এই শর্তেই এটি একটি বাক্যান্বয় বা রচনা গঠন করতে পারে। একমাত্র এ শর্তেই এটি পারে "চিহ্নিত" করতে। এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের সম্ভবত এ-প্রশ্ন করার দরকার হবে না যে চিহ্নিতকরণে অনভিব্যক্তিশীলতার ক্ষমতা কতদূর। একমাত্র অনভিব্যক্তিশীলতাই চিহ্নিতকরণে সক্ষম। কারণ সংশ্লেষণ, বাক্যান্বয়, অপেক্ষা ও রচনা না থাকলে ন্যূনতম চিহ্নিতকরণ বলেও কিছু থাকে না। এবং রচনার ধারণাকে এর যাবতীয় প্রয়োগসহ ধারণ করার পর এটি অভিব্যক্তির অব্যর্থক ধারণার সাথে অসমঞ্জস হয়ে পড়ে। কেউ যখন চিহ্নিতকরণকে একমাত্র রচনারই কাজ বলে অভিহিত করেন তখন অবশ্যই বুঝতে হবে তিনি ইতিমধ্যে চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। কারণ, চিহ্নকে এর সঙ্কীর্ণতম ধ্রুপদী সীমায় বুঝে থাকলেও এর বিপরীততা বলাই স্বাভাবিক যে: চিহ্নিতকরণই অভিব্যক্তি; রচনা, যা আসলে কিছুই প্রকাশ করে না—একেবারেই গুরুত্বহীন, ইত্যাদি। রচনাশাস্ত্র হিসেবে লিখনতত্ত্ব তখন পরিণত হবে একটি অনভিব্যক্তিশীল চিহ্নতত্ত্বে। যে-শর্তের ওপর এটি গড়ে উঠবে তা হল চিহ্নের ধারণার রূপান্তর এবং চিহ্ন থেকে এর জন্মগত অভিব্যক্তিবাদের উৎপাটন।

আপনার প্রশ্নের শেষ অংশ আরও কঠিন। এটা এখন পরিষ্কার যে এই সংযম অর্থাৎ ন্যায়গাণিতিক সঙ্কেতলিপির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসলে অর্থকেন্দ্রিকতা ও ধ্বনিকেন্দ্রিকতার কাজ, যেখানে এরা অধিবিদ্যা, ধ্রুপদী চিহ্নতত্ত্ব ও অন্যান্য ভাষিক প্রকল্পে প্রাধান্য বিস্তার করে। রুশো, হেগেল প্রমুখের করা অধ্বনিমূলক গাণিতিক লেখার (যেমন লিবনিৎসের "Characteristic") মূল্যায়ন অনেকটা অনিবার্যভাবেই সস্যুরের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, একইসাথে প্রাকৃতিক ভাষার প্রতি যাঁর ছিল প্রকাশ্য পক্ষপাত (দেখুন: Cours, পৃ: ৫৭)। লিখনতত্ত্ব পূর্বানুমানের এ-পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে মুক্তি দেবে ভাষার গাণিতিকীকরণকে এবং সেইসাথে ঘোষণা করবে যে, "বিজ্ঞানের অনুশীলন পরমধ্বনির সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ কখনোই করেনি, যেমন, এটি ক্রমাগত আরো বেশি করে অধ্বনিভাত্ত্বিক লেখার শরণ নিয়েছে।"[৫] অর্থ ও ধ্বনি সংযুক্তকারী প্রত্যেক উপাদানই গণিত কর্তৃক সীমায়িত হয়েছে, যার প্রগতি আবার সবসময়ই অঙ্গাঙ্গী জড়িত অধ্বনিমূলক লিপির অনুশীলনের সাথে। এ-ধরনের "লিখনতাত্ত্বিক" নীতি ও কাজ সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। গাণিতিক সঙ্কেতলিপি তার এ-যাবৎ হারানো সাম্রাজ্য আবার ফিরে পাক—অন্তত এটুকু যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে গাণিতিক সঙ্কেতলিপির বিস্তার ও

সাধারণভাবে লেখার কাঠামোদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে খুবই ধীরে ও বিবেচনার সাথে। আমার মনে হয় "প্রাকৃতিক" ভাষার মাধ্যমে "প্রাকৃতিক" ভাষার ওপর বিচারমূলক গবেষণা, ধ্রুপদী সঙ্কেতলিপির একটি সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ রূপান্তর, লেখা ও "প্রাকৃতিক" ভাষার মধ্যে বিনিময়ের একটি পদ্ধতিগত অনুশীলনের মাধ্যমে এবং সহযোগিতায় এ-ধরনের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা উচিত। এটি একটি অসীম কাজ, একদিকে এটি সম্পন্ন করা কখনোই সম্ভব হবে না, অপরদিকে কিছু অপরিহার্য কারণে সম্ভব হবে না প্রাকৃতিক ভাষা ও অগাণিতিক সঙ্কেতলিপির পুরোপুরি সংকোচন ঘটানো। এছাড়া আকারবাদ ও গণিতবাদের আনাড়ি দিকগুলো সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এ-দিকগুলোর একটি হচ্ছে অধিবিদ্যায় এদের গৌণক্রিয়া, যার ফলে অর্থকেন্দ্রিক ধর্মতত্ত্ব পূর্ণতা পেয়েছে এবং হয়েছে দৃঢ়, যেখানে এরা অধিবিদ্যার বৈধতা ও যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। এভাবেই লিবনিৎস-এ একটি বিশ্বজনীন, গাণিতিক ও অধ্বনিমূলক চরিত্রের পরিকল্প অবিচ্ছেদ্য অবস্থায় বিরাজ করে সহজিয়ার অধিবিদ্যা ও সেই সূত্রে স্বর্গীয় প্রজ্ঞা,[৬] ব্র হ্ম ধ্ব নি র সাথে।

এভাবেই অধিবিদ্যার অবিনির্মণক্রিয়ার সাথে হাত ধরাধরি করে চলে গাণিতিক সঙ্কেত-লিপির অগ্রগতি। এর সাথে যুক্ত হয় স্বয়ং গণিতের আমূল নবায়ন এবং বিজ্ঞান-ধারণা, অঙ্ক যার মডেল হিসেবে সবসময়ই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

ক্রিস্তেভা : চিহ্নের নিরিখে বিচার যদি বিজ্ঞানসম্মতার একটি বিচার হয় তবে কতদূর পর্যন্ত আপনি লিখনতত্ত্বকে একটি "বিজ্ঞান" বলবেন অথবা বলবেন না? আপনি নির্দিষ্ট কিছু চিহ্নতাত্ত্বিক কাজকে লিখনতাত্ত্বিক প্রকল্পের কাছাকাছি বলবেন কি? যদি বলেন তবে কোনগুলোকে বলবেন?

দেরিদা : লিখনতত্ত্বকে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মতার ধারণা ও রীতির সাথে সত্তাধর্মতত্ত্ব, অর্থকেন্দ্রিকতা ও ধ্বনিবাদের বন্ধন সৃষ্টিকারী সবকিছুর অবিনির্মাণ ঘটাতে হবে। এটি একটি অকল্পনীয় রকমের বিশাল ও ক্লান্তিকর কাজ—অতিক্রমের লক্ষ্যে সৃষ্ট বিজ্ঞানের ধ্রুপদী প্রকল্পনাকে যেক্ষেত্রে অবশ্যই ক্রমাগত ও অবিরত বিজ্ঞানপূর্ব অভিজ্ঞতাবাদে ফিরে যাওয়ার প্রত্যেকটি সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে হবে। এর জন্য লিখনতাত্ত্বিক অনুশীলনে দরকার এক ধরনের ডবল রেজিস্টারের : এটি একইসাথে আধিবিদ্যক প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে অতিক্রম করবে এবং বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও চলনে এ-যাবৎ জন্মানো যাবতীয় আধিবিদ্যক বন্ধন থেকে বিজ্ঞানের ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ডকে মুক্ত করার কাজে যা কিছুই অবদান রেখেছে প্রতিপাদন করবে তাদেরও। বিজ্ঞান অনুশীলনে যা ইতিমধ্যেই অর্থকেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে, লিখনতত্ত্বকে অবশ্যই তার অনুসরণ ও তাকে দৃঢ় করতে হবে। এ-কারনেই লিখনতত্ত্ব "বিজ্ঞান" কিনা, এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর নেই তবে এটুকু বলতে পারি, বিজ্ঞানকে এটি নিজের অন্তর্ভুক্ত ও সীমায়িত করে। এটি অনিবার্যভাবে বিজ্ঞানের

শর্তগুলোকে নিজের লেখায় কঠোর ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করাবে এবং (আবারও বলতে হচ্ছে) ধ্রুপদী বিজ্ঞানসম্মতার সীমাকে চিহ্নিত ও শিথিল করবে।

একই কারণে, লিখনতত্ত্বের জন্য সহায়ক হয়নি এমন কোনো বৈজ্ঞানিক চিহ্নতাত্ত্বিক কাজ নেই। এবং চিহ্নতত্ত্বে বিজ্ঞান যে-সব লিখনতাত্ত্বিক মোটিফ উৎপন্ন করেছে সেগুলোকে সবসময়েই চিহ্নতাত্ত্বিক আলোচনায় আধিবিদ্যক পূর্বানুমানগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবে। সস্যুরের *Cours*-এ বিদ্যমান আকারবাদী ও পার্থক্যশীল মোটিফের ওপর ভিত্তি করে এতে সমপরিমাণে উপস্থিত মনস্তত্ত্ববাদ, ধ্বনিতত্ত্ববাদ ও লেখার বিতাড়নের সমালোচনা করা যায়। কেউ যদি হেল্‌মস্লেভের আহরণবাদের মতোই সস্যুরের মনস্তত্ত্ববাদ ও অভিব্যক্তিমুখী সব উপাদানের সমালোচনার নিরপেক্ষায়ন, সেই সূত্রে ধ্বনিবাদ অর্থাৎ "কাঠামোবাদ", "অন্তর্বর্তিতা", অধিবিদ্যার সমালোচনা, "অনুশীলনের প্রসঙ্গতত্ত্ব" ইত্যাদি বিষয়ে সব ফলাফলগুলো নির্ণয় করতেন তাহলে যে-আধিবিদ্যক ধারণা এতোদিন আনাড়িভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে (যেমন দ্যোতক/দ্যোতিতের ঐতিহ্যে অভিব্যক্তি/সারের জোড়, দ্যোতক/দ্যোতিতের উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রূপবন্ধ/বস্তুর বিপ্রতীপ; "অভিজ্ঞতাবাদী নীতি" ইত্যাদি)[৭] পারতেন তাদের চিরতরে দূর করতে। প্রত্যেক পূর্বানুমান বা চিহ্নতাত্ত্বিক গবেষণার এমন একটি অভিজ্ঞতাপূর্ব স্তরের কথাও আবার কেউ বলতে পারেন, যেখানে আধিবিদ্যক পর্বানুমানগুলো সহাবস্থান করে বিচারমূলক মোটিফের সাথে, যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ আমার চেয়ে আপনিই ভালো দিতে পারবেন। এ সরল কারণেই একই ভাষার একটি পর্যায় পর্যন্ত এটি বাস করে। নিঃসন্দেহে লিখনতত্ত্ব যতো-না একটি নতুন বিজ্ঞান কিংবা একটি নতুন বিষয়বস্তু বা ক্ষেত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি নতুন শৃঙ্খলা, তার চেয়ে বেশি এই রাচনিক বিভাগটির সতর্ক অনুশীলন।

১. জাক দেরিদা : অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য যা। দ্যোতক ও দ্যোতিতের পার্থক্য সবসময়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্যের পার্থক্যকে সূচিত করেছে। এ-ঘটনা এর কুচ্ছ্রবাদী উৎসের চেয়ে বিংশ শতাব্দীতে কোনো অংশে কম নয়। "আধুনিক কাঠামোবাদী ভাবনা যা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে : ভাষা হচ্ছে চিহ্নের একটি পদ্ধতি, এবং ভাষাতত্ত্ব হচ্ছে চিহ্নের শাস্ত্র—অর্থাৎ চিহ্নতত্ত্বের (বা সস্যুরের ভাষায় Semiology) একটি অচ্ছেদ্য অংশ। মধ্যযুগীয় সংজ্ঞায় যাকে বলা হয়েছে alioquid stat pro aliquo এবং আমাদের যুগ যাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, তা এখনও কার্যকরী এবং ফলদায়ক। তাই সাধারণভাবে প্রত্যেক চিহ্নের এবং বিশেষত ভাষিকচিত্রের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে এর দ্বৈতচরিত্রে : প্রত্যেক ভাষিক অভেদ দুই অংশবিশিষ্ট এবং আচরণ করে দু'প্রকারে : একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে এবং অপরদিকে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে—প্রথমটিকে বলা হয় signans (বা সস্যুরের Signifier) এবং অপরটি Signatum (বা সস্যুরের Signified)।" (রোমান জ্যাকবসন, Essais de linguistique generale [প্যারিস : Editions de Minuit, ১৯৬৩], পৃঃ ১৬২।)

২. Ed. N. দেখুন De la grammatologie, পৃ: ১৯৬-৮।

৩. T. N. অন্যভাবে বললে অপেক্ষা "পার্থক্যকরণ" ও "স্থগিতকরণ"কে সংযুক্ত ও দ্বিধান্বিত করে এদের সক্রিয় ও অক্রিয় উভয় অর্থে।

৪. T. N. Edmund Husserl, *Ideas* অনুবাদ W. R. Boyce Gibson (New york : Collier Books), পৃ: ৩১৯।

৫. Ed. N. দেখুন De la grammatologie, পৃ: ১২।

৬. জাক দেরিদা : "তবে এ-মুহূর্তে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, আমার চারিত্র্যের ভিত্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশেরও ভিত্তি, কারণ চারিত্র্যের উপাদান হচ্ছে সরল চিন্তাসমূহ ; এবং সরল আকৃতিসমূহ আবার বস্তুর উৎস। এখন, আমি মনে করি, সব সরল আকারই একটি অপরটির সঙ্গে মানানসই। এটা আবার এমন একটি প্রস্তাবনা যার প্রমাণ শেষপর্যন্ত চারিত্র্যের ভিত্তি ব্যতিরেকে আমার পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি স্বীকৃত হয় তাহলে এ-থেকে অবশেষে এ-ও অনুধাবিত হবে ঈশ্বরের প্রকৃতি —যিনি সব সরল আকারের পরম রূপকে বেষ্টন করেন—তিনি সম্ভব। এখন, ওপরে আমরা প্রমাণ করলাম যে ঈশ্বর আছেন—এই শর্তে তার পক্ষে অস্তিত্ববান হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি বিরাজমান। Q. E. D." (রাজকুমারী এলিজাবেথের কাছে লেখা চিঠি, ১৬৭৮।)

৭. Ed. N. দেখুন De la grammatologie, পৃ: 83 ff.

প্রথম প্রকাশ : Information Sur les Sciences Sociales 7.3 June 1968।

অ্যালান বাস সম্পাদিত জাক দেরিদা position থেকে।

একমাত্রিক সমালোচক

শিবাজীপ্রতিম বসু

প্রাককথন

॥ ক ॥

পর্দা ফুঁড়ে স্প্যানার হাতে বেরিয়ে আসছে চার্লি চ্যাপলিনরা, দলে দলে। ওদের লক্ষ্য জগতের যাবতীয় নাটবল্টুর দিকে। ওদের শেখানো হয়েছে, ওদের একমাত্র কর্তব্য : নাটবল্টু টাইট দেওয়া। প্রশ্নহীনভাবে, অবিরাম···

এই বিখ্যাত ভয়ঙ্কর রূপকচিত্র কল্পনা করে ছয়ের দশকের শেষপাদে জার্মান-মার্কিন ছাত্রকুলের চোখের মণি হারাবার্ট মারকুজে কখনো শিউরে উঠেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে তাঁর সবচেয়ে পরিচিত দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু হল, 'একমাত্রিক মানুষ', যে কেবল এই আনন্দময় ভুবনের রূপরসগন্ধ [এবং পুরীষ] গ্রহণ করবে ; পৃথিবীর 'অধুনা' অস্তিত্ব হবে তাদের সকল প্রজ্ঞার আকর এবং সেই প্রজ্ঞা [ও বিশ্ববীক্ষা] তারা পুনরুৎপাদন করে চলবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ; কখনো ঘুরে দাঁড়াবে না ; ফিরিয়ে দেবে না নিজস্ব বমন ও ভালবাসা ; উল্টো করে দেখবে না আয়নার ভিতরের অলীক অস্তিত্বকে। এককথায় তারা হেগেল বর্ণিত মানুষের 'দ্বিতীয় মাত্রাটি (অর্থাৎ বর্জন করার সাহস বা সম্যক বিচারে বর্জন-গ্রহণের প্রক্রিয়া) মানে 'ক্রিটিকাল পাওয়ার' হারিয়ে 'প্রত্যক্ষ' জগতের বশংবদ, অর্ধমানবে পরিণত হবে।

অতএব, মারকুজের সতর্কীকরণ : দ্বিতীয় মাত্রাটি হারিয়ে ফেলো না, আনুগত্যের নিরাপদ আশ্রয়ে বর্জনে-গ্রহণে প্রতি পলকে যাচাই করে নেওয়া নিয়ত পরিবর্তনশীল হাতিয়ারে জং ধরিও না। প্রশ্ন ও সমালোচনার অধিকারকে উদ্ধে মেলে ধরো, কারণ সমালোচনার অর্থ নানা বিন্দু থেকে বস্তুগত বা মননগত অবয়বকে অবলোকন করা, সত্যের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে সত্যের একটি পূর্ণাঙ্গ কোলাজ গড়ে তোলা।

কথাগুলো, যে কোনো সচেতন মানুষের পক্ষে যদি প্রাসঙ্গিক হয়, তবে তা অবশ্য-মান্য সাহিত্যকর্মের স্বঘোষিত 'বিচারক' ; সমালোচকদের ক্ষেত্রেও। সাহিত্য রসিক কোনো পাঠক স্থান (ভৌগোলিক / সামাজিক), কাল ও ব্যক্তিগত [অ] পছন্দের ভিত্তিতে সাহিত্যকৃতি গ্রহণ-বর্জন করতে পারে, বৃহত্তর সমাজের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে। সমালোচকও একজন পাঠক—একজন দায়িত্ববান 'বহুমাত্রিক' পাঠক, যিনি 'বস্তুসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে বইটি পড়বেন' এবং তাঁর পঠন প্রক্রিয়া যেহেতু ব্যক্তি পাঠকের স্বেচ্ছাচারী পাঠ নয়, তা অনেক বেশি 'অবজেকটিভ', অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। তাই স্বৈরী বিচারকের মতো মসির একটি আঁচড়ে কাউকে নস্যাৎ করা বা মাথায় তুলে নাচার নাম সাহিত্য সমালোচনা নয়। সমালোচনার অর্থ হল দর্শন, [সমাজ]

বিজ্ঞান, ইতিহাস, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিন্দু থেকে লিখিত টেক্সটের বিভিন্ন পাঠান্তর উপস্থাপন করা এবং রলাঁ বার্থ আমাদের শিখিয়েছেন, যেহেতু সাহিত্যের ভাষা স্বয়ং বাস্তবতা নয়, বাস্তবতা সম্বন্ধীয় মন্তব্য বা ধারাভাষ্য, তাই সমালোচনার ভাষা—যা ওই [বাস্তবতা সম্বন্ধীয়] মন্তব্যের ওপর আরেকটি মন্তব্য বা ধারাভাষ্য—তা একটি দ্বিতীয় মাত্রিক ভাষা বা 'মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ'[১] [যেহেতু তা 'মন্তব্যের ওপর মন্তব্য'], তাই লিখিত বস্তুর [বাস্তব নির্ভর] সত্যাসত্য বিচার নয়, লিখিত গদ্য / পদ্যের আভ্যন্তরিক যুক্তি কাঠামোটি কতদূর সবল বা দুর্বল, তা বিচার করাই সমালোচনার প্রধান প্রতিপাদ্য। একই বিচারে লেখকের ব্যক্তিপরিচয় [যেমন, বঙ্কিম কোথায় ডেপুটি থাকাকালীন কোন উপন্যাস রচনা করেন] বা তাঁর চরিত্র [যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায় দিনের কতটা সময় খালাসিটোলায় কাটান বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়/সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়রা কোন-কোন সমালোচককে নিয়মিত কুর্ণিশ করেন] তাঁর সাহিত্যকৃতি পাঠ ও সমালোচনার ক্ষেত্রে অবান্তর বিষয়।

॥ খ ॥

পত্র-পত্রিকায় সাম্প্রতিক বাঙলা গদ্য সমালোচনা বিষয়ে এ প্রবন্ধের অবতারণা। গদ্য বলতে এখানে মূলত Fiction-কে বোঝানো হয়েছে, পত্র-পত্রিকা বলতে বোঝানো হয়েছে বাণিজ্যিক / বহুল প্রচারিত / পঠিত পত্র-পত্রিকার কথা এবং 'সাম্প্রতিক' বলতে বিগত এক বছরে প্রকাশিত কয়েকটি সমালোচনার খতিয়ান। বর্তমান প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসর ও আমাদের শারীরিক-বৌদ্ধিক সীমাবদ্ধতা এইসব শর্ত আরোপের প্রধান কারণ।

বহুল প্রচারিত বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকারও কিছু স্বতঃসিদ্ধ নির্ধারক/সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, পাঠক সমাজের গড় রুচি ও মান অনুযায়ী লেখা, ফলে, বহু সংবাদ, তথ্য, ফিচারের চাপে 'সমালোচনার' (যাকে 'ক্রিটিসিজম' না বলে 'রিভিউ' বা 'পুস্তক পরিচিতি' বলা ভাল) ক্ষুদ্র পরিসর এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক স্বার্থবুদ্ধি—যা পূর্বোক্ত নির্ধারকগুলির নিয়ন্তা এবং নিজস্ব (প্রতিষ্ঠানভিত্তিক গোষ্ঠী) স্বার্থবিরোধী রচনা বরদাস্ত করে না।

অন্যদিকে পাঠককুলের বহুস্তরী বিস্তৃতির জন্য লঘু জলবৎ লেখার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সিরিয়াস প্রবন্ধ / সমালোচনাও বৃহৎ পত্রিকার পাতাগুলি প্রশ্রয় দেয়। ফলে, পপকর্ন চিবুতে চিবুতে শেষ করা যায় এমন রচনার পাশাপাশি থেকে যায় 'সিরিয়াস' লেখকদের এমন অনেক রচনা, যা 'ধুত্তোর' বলে ফেলে দেওয়া যায় না। এই শেষোক্ত রচনা সমূহের কয়েকটি আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এবং/ অতএব আমাদের রচনা হল, মেটা-মেটা ল্যাঙ্গুয়েজ।

১. বার্থের মতে, বাস্তবতার ধারাভাষ্য (comment) হল 'প্রাথমিক' ভাষা [অর্থাৎ সাহিত্য]। 'সমালোচনা' ও একটি ভাষা, যার মূল দায়িত্ব ওই 'প্রাথমিক' ভাষার ওপর মন্তব্য করা / ধারাভাষ্য দান, ফলে তা মাধ্যমিক (Secondary) ভাষা বা *Meta* language,

এক

'সাতের দশক শুধু অগ্নিমূর্তিই ছিল না, সে অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়েছে কিছু কম নয়। সে এসেছিল অনেক পুরনো ভাব-প্রতিমা ভাঙতে ভাঙতে, সে ধরিয়ে দিয়েছিল আমাদের বহু প্রবঞ্চনার স্বরূপ।...আজ যখন গত দুই দশকের কথা সাহিত্যের মূল্যায়ন জরুরি হয়ে পড়ে একবিংশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, তখন সেই প্রথম সত্তরের উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির অন্তত এই চাক্ষুষ জরিপও দরকার। এজন্য দরকার যে, **সেদিন যে সমস্যা ছিল বাস্তবেরই ছুঁড়ে দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ, সেটাই কথাশিল্পে দেখা দিল ফর্মের সমস্যা হিসাবে।**.....গোল গল্পের দিন টোল খেতে খেতে ভেঙে গেল। দেশ ভেঙেছে, পার্টি ভেঙেছে—ভেঙেছে সমস্ত দিক থেকে নিয়ামক নিশ্চিন্ততা—বৃদ্ধেরা উপেক্ষায় বিবর্জিত, যুবকেরা স্বপ্নহত। **এমন অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছে যে সাহিত্য তার মূল্যায়ন জীবনভাষ্যের মূল্যায়ন বলেই ভাষ্যকারকে জীবনের প্রেক্ষাপটেই বুঝে নিতে হবে।** এখানে যে সমস্ত কথা বলা হল, সে সমস্তই ছিল সে ভাষ্যকারের সেদিনের অস্তিত্বের অংশ।' [সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিপন্ন সীমান্ত : উদ্বিগ্ন সৈনিক', **দেশ ১১** বৈশাখ, ১৪০০ ; মোটা হরফগুলি ব্যবহৃত হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধলেখক দ্বারা।]

অর্থাৎ, দেশ ভাঙছে, পার্টি ভাঙছে, সমাজ ভাঙছে—গল্প [এবং ফর্ম] ভাঙছে—ইত্যাকার প্রায় সমীকরণ উদ্ধৃত প্রবন্ধের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমি। যদিও 'দেশ' সত্তরে ভাঙেনি—পাকিস্তান ছাড়া [এবং তা ভেঙে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ তো সত্তরের প্রথমার্ধে রোমান্টিক আশাবাদের কল্প-বাস্তব দেশ] ; পার্টিও [যদি তা কমিউনিস্ট বা কংগ্রেস হয়] ষাটে ভেঙেছে, সত্তরে নয় ; সামাজিক ভাবপ্রতিমা ভাঙাভাঙির সূত্রপাত আরো আগে। তাহলে 'এমন অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছে যে সাহিত্য' তার সূচনা তো ষাটের দ্বিতীয়ার্ধেই ঘটে যাওয়ার কথা (কারণ, বাস্তবের 'ছুঁড়ে দেওয়া নানা চ্যালেঞ্জ'), 'সত্তর' অব্দি অপেক্ষা করতে হল কেন, দশকওয়ারি 'মূল্যায়ন' পেশ করতে হবে বলে ?

আসলে 'বাস্তববাদী' লাঁসোনীয়[২] (Lansonian) সমালোচনার প্রধান অসুবিধা এইখানে। যতই গভীর সুবেদী লেখক হোন বা সাহিত্যিক পরিভাষা যতই তাঁর দখলে থাকুক, শেষপর্যন্ত [নিজের অজান্তে] এই রকম অস্তিবাদী প্রত্যক্ষবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছন যে ধরে নেন, লেখকরা 'যদ্দৃষ্টং [ফর্মের একটু মোচড়ে] তল্লিখিতং'। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে 'জীবনী' মানেও তো স্বয়ং 'জীবন' নয় আর গল্প-উপন্যাস—যা কোনো সময়ই বাস্তবজীবনের অর্থকল্পিত ধারাভাষ্য বই কিছু নয়, তার উৎস সন্ধানে যদি বারবার স্বয়ং জীবনের [তাও সমালোচক মশাইয়ের পছন্দসই জীবনের] কাছে ফিরে যাই তাতে না হয় ইতিহাসচর্চা, না হয় সাহিত্যের বহু মাত্রিক পাঠ-বিচার।

২. গুস্তাভ লাঁসোঁ (১৮৫৭-১৯৩৪) ছিলেন ফরাসি সাহিত্য সমালোচনা জগতে বাস্তবতাপন্থীদের অন্যতম গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। এঁর মতে, সাহিত্য বুঝতে হবে লেখকের জীবন ও পরিপার্শ্ব অনুযায়ী, লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে লেখকচরিত খুঁজে পাওয়া যাবে।

সুতরাং গল্প উপন্যাসের সত্য-মিথ্যা বিচার করতে হবে প্রদত্ত গল্প-উপন্যাসের যৌক্তিক কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে। সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, রচনাশৈলী প্রভৃতি নানান বিন্দু থেকে তার পাঠান্তর সম্ভব, কিন্তু বাস্তব ও সাহিত্যের সম্পর্ক একধরনের 'বিম্ব-প্রতিবিম্বের' সম্পর্ক—'একবিংশের মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে এমন ধারণা অনাধুনিক। [অথচ দীর্ঘদিন ধরে প্রখ্যাত ফরাসি সমালোচক লাঁসোঁ ও তাঁর ভাবশিষ্যরা এই দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকেই সাহিত্য বিচার করেছেন, অর্থাৎ, তাঁদের মতে, বস্তুজগতের বাস্তবতার ভিত্তিতে কাহিনীর (fiction) বাস্তবতা বিচার করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, লেখক সৃষ্ট চরিত্রগুলি আসলে লেখকের চরিত্রেরই নানা রূপ, যেগুলো সঠিক-ভাবে মেলালে লেখকের জীবন ফুটে উঠবে।]

যদিও আমাদের সাহিত্য আলোচনার জগতে রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, কবিকে তার জীবনচরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু এদেশে বহু বিদগ্ধ [বেনামা] লাঁসোঁপন্থী সেভাবেই সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। এর মধ্যে যদি কারো মার্কসবাদী [সরলীকৃত] ইতিহাসের স্তরভাগটা রপ্ত হয়ে থাকে তবে তো কথাই নেই। একবার বিচার্যলেখার রচনাকাল জানতে পারলেই হয়ে গেল। অতঃপর সেইকালের সামাজিক [ও বৈপ্লবিক] চরিত্র বিশ্লেষণ করে কিছু নিয়ামক নির্দিষ্ট করতে পারলেই কেল্লা ফতে। তখন বলতে পারা যাবে, অমুক সময়, অমুক লেখক অমন লেখা কেন লিখলেন, না 'মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া' ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবে, অথবা নয়া ঔপনিবেশিক পণ্য সর্বস্বতার ফলস্বরূপ। এতে সুবিধা হল এই যে, প্রচুর পরিশ্রম বেঁচে গেল, অথচ কেবল একটি কলম ও বিশ্ববীক্ষার জোরে দিব্যি দিব্যি সাহিত্য পর্যালোচনা প্রকাশ করা গেল। অন্য পথটা যে এত সহজিয়া নয়, কিছুদিন আগে ডেভিড লজ হেমিংওয়ের একটি ক্ষুদ্র গল্প—'ক্যাট ইন দ্য রেইন' পর্যালোচনার সময় দেখিয়েছেন কত জটিল, পরিশ্রমসাধ্য অথচ বুদ্ধিদীপ্ত ও আকর্ষক সেই পথ। হেমিংওয়ের মূল গল্পটির যুক্তিকাঠামো আলোচনা করেই লজ ক্ষান্ত দেন-নি, দু-তিনটি ভিন্ন বিন্দু [বিভিন্ন চরিত্রের perspective থেকে] থেকে তিনি মূল গল্পটিরই পুনর্গঠন করেছেন দু-তিনবার, সেগুলি পড়লে বোঝা যায়, কেবল লেখককেই নয়, ভাল লেখার জন্য সমালোচককেও 'অনেক রক্তপাত' ঘটাতে হয়।

বাঙলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'শ্রীকুমার' পন্থী সমালোচনার বদলে এক ঝলক তাজা বাতাস এনেছিলেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর 'বাঙলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে। কিন্তু সেই গ্রন্থ থেকে অন্যান্য বহু সমালোচনার ফুটে উঠল তাঁর তাত্ত্বিক কেন্দ্রভূমি, যা সিরিয়াস গদ্যের আড়ালে, সহজমর্মী আলোচনায় বিশ্বাসী।

গত ২৯ ফাল্গুন ১৩৯৯-এর **দেশে** সমরেশ বসু [অসমাপ্ত] শিল্পী রামকিঙ্করের জীবনাভিত্তিক উপন্যাস 'দেখি নাই ফিরে'র সমালোচনায় সরোজবাবুর তাত্ত্বিক অবস্থান আরো স্পষ্ট হয়। এই রচনায় সমালোচক [সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়] নিজেই একজন চরিত্র : 'সমরেশের কিন্তু পরিকল্পনা ছিল আরও বড় মাপের একটা ব্যাপার

দাঁড় করাতে হবে। এ সূত্রে যে পরিকল্পনা সমরেশের ছিল তা হয়তো কিছুটা অনুমান করতে পারা যায় আমাকে লেখা ৮-১২-৮৬ দিনাঙ্কিত একটি চিঠি থেকে। চিঠিতে সমরেশ আমাকে বলছেন…'—এটুকু পড়ে মনে হতেই পারে, ভাগ্যিস সরোজবাবু আলোচনা করলেন, নইলে এ 'রিভিউ' অন্য আর কে করত! কারণ, তাদের কাছে তো সমরেশের ব্যক্তিগত চিঠি ছিল না। তাই তাদের 'আমি' জাতীয় কোনো প্রাতিস্বিক অহং এরও বালাই নেই, যদিও উদ্ধৃত চিঠিটি মূল্যবান, সন্দেহ নেই।

শুধু এই নয়, সুন্দর বাক্য বিন্যাসে গড়া রচনাটির ছত্রে-ছত্রে সমালোচক—লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং উপন্যাস ও লেখকের জীবনের যোগাযোগ খোঁজার চেষ্টা চলেছে।

'…একথা আমার মনে করার কারণ আছে যে, সমরেশের ভাগ্যবিধাতা সমরেশকে দিয়ে এ-কাজ করিয়ে নেবেন বলে যেন তা আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। কিশোর সমরেশ বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। তিনি আর্টিস্ট হবেন। আর্ট স্কুলে ভর্তি হবেন।… অত্যন্ত দুরন্ত ছেলে ছিল সে। আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাইপো অনাদিভূষণ ভট্টাচার্য সেই দুরন্ত ছেলেটিকে খুব স্নেহ করতেন। সমরেশের দুরন্তপনা সামাল দেবার জন্য মাস্টারমশাই সমরেশকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য চিত্রকলার মূল্যবান বই। তখনও ছবিই ছিল সমরেশের প্রধান 'প্যাশান'। …প্রথমা পত্নী গৌরী বসুর একটি রঙিন প্রতিকৃতি এখনও বোধহয় হারিয়ে যায় নি, সুতরাং বলা যেতে পারে ছবির জগৎ তাকে হাতছানি দিয়েছে ছোটবেলা থেকে।'

শুধু চিত্রকলা নয়, বাঁকুড়ার ডায়ালেক্ট নিয়ে সমরেশের ব্যক্তিগত পাঠও আছে সমালোচকের স্মৃতিতে এবং সবশেষে তিনি লেখক সমরেশ ও লিখিত রামকিঙ্করের জীবনেরও অভেদ ঘটিয়েছেন। 'লেখক সমরেশ ও শিল্পী রামকিঙ্কর অভেদ সিদ্ধ ছিলেন জীবনে।… রামকিঙ্করের মতোই অপমান লাঞ্ছনায় হার মানেননি সমরেশ। একদা দারুন লড়াই করেছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে। রামকিঙ্কর যেমন শিল্পকে, সমরেশও তেমনি সাহিত্যকেই একমাত্র অবলম্বন করে লড়াই করে গিয়েছেন, যা একালের আর কোনও লেখক করতে পারেন নি। [জানি না, 'একালের আর কোনও লেখক' বলতে সরোজবাবু কাদের কথা বুঝিয়েছেন। কেবল গণমাধ্যম নির্ভর জনপ্রিয় সাহিত্যকুলের কথা ?] তাই রামকিঙ্করের মধ্যেই সমরেশ খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মনের মানুষকে, বোধহয় নিজেকেও'। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে :

'এখানেও লেখক সমরেশের সঙ্গে তাঁর [অর্থাৎ রামকিঙ্করের] ভাবৈকরস—যা দেখা যাচ্ছে। সেটাই সব নয়, আরও আছে, বুঝি ভিতরে আছে—সমরেশ জেনেছিলেন, বুঝেছিলেন তা নিজের আলোয়। নানা মূর্তির সমারোহ সমরেশেরও চরিত্র-চিত্রমালায়'। এরপরই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ-রামকিঙ্কর সত্তার একটি মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন :

'বাস্তব মানে কি অবিকল? কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে...' —এই **তফাৎটুকু**—যা শিল্পমাধ্যম রচনা করে, তা যে একটি নির্মিত-কল্পিত বাস্তব অর্থাৎ তার একটি নিজস্ব অবয়ব আছে, একটি নিজস্ব যুক্তিক্রম আছে, যার দুর্বলতা-সরলতার ওপরেই লিখিত গদ্যের গুণাগুণ নির্ভর করে—এ কথার ওপর মুখ্যগুরুত্ব না দিয়ে বাস্তববাদী সমালোচক খুঁজে চলেন লেখার আড়ালে লেখককে, অথবা কোনো দশকের বেছে নেওয়া সমস্যাকে তাঁরা বসান সাহিত্যের নায়কের আসনে।

অবশ্য সমালোচনার ঘরানা বাছবার অধিকার সমালোচকের আছে। কিন্তু দশকওয়ারি বাঙলা উপন্যাস আলোচনায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ঘরানা অনুযায়ী বিশ্লেষণও কি বজায় রাখতে পেরেছেন? নতুবা সাতের দশকের 'উত্থাপিত জিজ্ঞাসাগুলির' সন্ধান তিনি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পান কোন ম্যাজিকে? বাস্তববাদীদের মতোই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এই বিস্ময়কর ব্যবস্থার (accommodation) 'পিছে ক্যা হ্যায়'? প্রাতিষ্ঠানিক সৌগন্ধ? জানি না, তবে যে ভাবে তিনি জনা কুড়ি প্রবীণ-নবীন লেখকের সাহিত্যকৃতির আলোচনা করেছেন, তাতে রসজ্ঞ পাঠকের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরীতে লেখা উপন্যাস রচনার সহজ-মজার কৌশলটির কথা মনে পড়তে পারে। মানিক বলেছিলেন, উপন্যাস লেখার আগে মূল চরিত্রগুলির নাম একটা কাগজে লিখে, তাদের গুরুত্ব অনুযায়ী সংখ্যা (পাওয়ার) বসাতে হবে। যেমন, 'ক' এর পাশে ১০০০, 'খ' এর পাশে ১০০—এই সংখ্যাই বলে দেবে কে কত পাতা অধিকার করবে বা কার বরাতে জুটবে দু-এক লাইন। এই পদ্ধতি আত্মস্থ করে তিনি যেভাবে দুচার শব্দ প্রয়োগে কারো ওপর 'ধৌতি' (শব্দটির নতুন ব্যঞ্জনার জন্য আমরা শিশির দাশের কাছে কৃতজ্ঞ) প্রয়োগ করেছেন বা কারো ওপর চাপিয়েছেন প্রশংসার নতুন প্রলেপ, তা থেকে অনুজ কলমচিরা অনেক শিখতে পারবে। যেমন, (১) "সুব্রত মুখোপাধ্যায় 'রসিক' উপন্যাসে সমরেশ বসুর জোব্বাটাকে গায়ে দিতে চেয়েছিলেন। সেটা তাঁর গায়ে ঢলঢল করছে।" [সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নাম না করে সমালোচক অন্যত্র একই মন্তব্য করেছেন।]; (২) "'পূর্ব-পশ্চিম' সমকালীন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান, এই উপন্যাসে কখনও-কখনও ইতিহাস ও মানুষ একাকার হয়ে গেছে। তথাপি এক অভাবনীয় অকাল সন্ধ্যায় কালান্তরের মুদ্রিত পাঞ্জায় চরিত্রগুলি জীবিতকল্প। এমন বিস্তার নিয়ে আর কোনও বাংলা উপন্যাস লেখা হয়েছে বলে জানি না।" সরোজবাবু বাস্তববাদী বলেই এই প্রসঙ্গে বলতে সাহস পাচ্ছি, বেশ কিছুদিন আগে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে 'পূর্ব-পশ্চিমের' একটি মিঠে-কড়া সমালোচনা বেরিয়েছিল, যার সম্পর্কে সুনীল সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে (আ. বা. পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১২।১২।৯৩) ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন, সরোজবাবুর লেখায় তার কিছুটা উপশম হওয়ার কথা ছিল।

দুই

সম্প্রতি আর একজন সমালোচক [সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়, **দেশ**, ২৫ সেপ্টেম্বর, ৯৩]

অতি সোচ্চারে বাস্তবতাবাদী [জানি না, কেন লেখায় তিনি 'বাস্তববাদী' কথাটি ব্যবহার করলেন] প্রকরণ ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি খানিক আরোপিত কর্তৃত্বময় কথার ফুলঝুরি শুনিয়েছেন। শুরু থেকেই উদ্ধৃতি দিতে হল : 'উপন্যাস ভাল বা মন্দ হয় কিসের গুনে ? অবশ্যই জীবনানুগ বাস্তববাদী উপস্থাপনার গুণে।' পাঠক লক্ষ করবেন, পরপর ব্যবহৃত 'জীবনানুগ' ও 'বাস্তববাদী' শব্দ দুটি। তাহলে স্যাঁ এক্সুপেরির 'ছোটরাজপুত্র' শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভাল উপন্যাস নয়, 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'ই বা কোন পর্যায়ভুক্ত ? তবে আলোচ্য রচনা-লেখকের একটি শৈলী যথেষ্ট আয়ত্ত আছে। তা হল, কোনো সহজিয়া প্রশ্ন নিক্ষেপ এবং তার চটজলদি কর্তৃত্বপূর্ণ উত্তরদান, [পাঠক, আপনারা সকলেই যে পাঠশালার গবেট ছাত্র, এ ধরনের লেখা না পড়লে তা মনে থাকে না।] আরো উদ্ধৃতি :

(ক) "বিষয়বাদীরা বলবেন উপন্যাসের উৎকর্ষ নিহিত থাকে বিষয়ে। কথাটা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, প্রকৃত উপন্যাসে [পাঠক, আবার খেয়াল করুন 'প্রকৃত' ও 'ভাল'র পাশাপাশি অবস্থান—কী বিশুদ্ধতাবাদী প্রয়াস !] বিষয় আর ফর্মটাকে কি পৃথক করা যায় ? বলা বাহুল্য বিষয় আর ফর্মের সম্পর্কটা অনেকটা সীবন শিল্পে ছুঁচ-সুতোর সম্পর্কের মতোই [হা হতোস্মি ! অবশেষে অ্যানালজি !]··· জীবনের মাইমেটিক ছবি তুলে ধরার একটি শিল্প আছে, একটা টেকনিক আছে ঠিকই ; কিন্তু উপন্যাসে যেন টেকনিক-সর্বস্বতার ছাপ না ফুটে ওঠে [সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় হুঁশিয়ার !] ফর্ম এবং বিষয় সূক্ষ্ম এবং নিবিড়ভাবে [পাঠক আবার পাশাপাশি শব্দ দুটির দিকে তাকান] মিশে যাওয়াটাই কাম্য।"

(খ) "'ভাল' বা 'মন্দ' নয়, উপন্যাসের একটাই শ্রেণী বিভাজন হতে পারে—যে উপন্যাসে জীবন নেই এবং যে উপন্যাসে জীবন আছে। বলা বাহুল্য, জীবন ও বাস্তবতা এখানে সমার্থক।"

এইভাবে পরস্পর-বিরোধী নিরর্থক বাগাড়ম্বরে [বাঙলার সঙ্গে 'execution', 'air of reality', solidity of specification'—ইত্যাকার ঈঙ্গ শব্দেরও ছড়াছড়ি—অবশ্যই, অজ্ঞাত কারণে] আলোচ্য লেখক কেবল বাস্তবতাবাদের জয়গানই গান না, আলোচ্য গ্রন্থগুলির মাথায় চাপিয়ে দেন 'বাস্তববাদী' উপন্যাসের তকমা, তারপর নিজেই বিচার করতে বসেন 'বাস্তববাদী' উপন্যাস হিসেবে তাদের সার্থকতা, ব্যর্থতা।

তিন

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখায় যদি তাত্ত্বিক ফ্রেবার পরিবেশন করার পণ্ডশ্রম করে থাকেন, তবে কোনো তত্ত্বের বড়াই না করেও নলিনী বেরা স্বল্প পরিসরে (**প্রতিক্ষণ**, এপ্রিল, ১৯৯৩) আসল কাজটি করেছেন—উপন্যাস [অমর মিত্রের লিখিত] কাঠামোর মধ্যেই তার সত্যাসত্য গুণাগুণ দেখার চেষ্টা করেছেন। তবে তার ভিতরেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর সমালোচনা তত্ত্ব :

'অমর চাকরিসূত্রে রাঢ় অঞ্চলে পরিভ্রমণ করলেও মূলত তিনি ঔপন্যাসিক, তাঁর চোখ

যথার্থ সাহিত্যিকেরই। হামেশাই শুনি, যেহেতু চাকরিসূত্রে তাঁর ঐ অঞ্চলে ভ্রমণ, কাজেই তৎ-লিখিত তৎ-বিষয় ভিত্তিক গল্প উপন্যাসও ট্যুরিস্টের চোখ দিয়েই লেখা—আমি এরকম ধারণায় একমত নই।'

তার মানে, লেখকের জীবনযাত্রাভিত্তিক সমালোচনা লেখার যে প্রচুর [পণ্ড] শ্রমসাধ্য ধারাটি বাস্তববাদীদের অহংকারী অধিকার, নলিনী এক্ষেত্রে তাকে অন্তত নস্যাৎ করেছেন। রচনার শেষদিকেও শ্রী বেরা আর একটু বলিষ্ঠভাবে একই চিন্তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন : "একাধিক উহ্য-অনুহ্য কারণে সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকায় গ্রামভিত্তিক গল্প ছাপাছাপির বাহুল্য দেখা দেওয়ায় অনায়াস ক্ষমতালিপ্সু অত্যুৎসাহী তরুণ তরুণতর লেখকের দল নিজ নিজ রচনাটিকে আরো বেশি মাত্রায় 'রিয়েলিস্টিক' করে তোলার বাসনায় ব্যতাজনের মুখের 'ডায়ালেক্ট' লেখার সময় যাহোক তাহোক ভাবে ক্রিয়াপদের শেষে 'ক' 'য-ফলা' 'চন্দ্রবিন্দু' ইত্যাদির সংযোগ ঘটিয়ে লেখাটিকে দুর্বোধ্যতর করে গড়ে তুলেছেন। সখেদে বলতেই হচ্ছে—যাদের মুখের 'ডায়ালেক্ট' বসাতে এত তৎপরতা, পরিবেশের 'ফ্লেবার' তোলার বাসনায় এত কষ্ট সহিষ্ণুতা—সেই তারা লেখাপড়া শিখে যদি কোনদিন 'আপনার মুখ আপনি দেখে' তবে সে যে বড় লজ্জার হবে, তরুণ লেখক বন্ধুরা।"

বিগত এক বছরে বৃহৎ পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কয়েকটি উপন্যাসের সমালোচনার (**দেশ ১১** বৈশাখ ১৪০০) অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। বর্তমান প্রবন্ধের শুরুতে আমরা একমাত্রিকতা বনাম দ্বি / বহুমাত্রিকতার যে সমস্যা উত্থাপন করেছিলাম সেখান থেকেই পার্থপ্রতিম তাঁর লেখা শুরু করেছেন। মুখ্যত তিনি সাহিত্যে 'জনপ্রিয়তা' ও 'বাণিজ্যায়নের' যোগসূত্র অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন যে যদিও অতীতে জনপ্রিয় ও সিরিয়াস উপন্যাসের মেরুকরণ হয়নি, কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে একমাত্রিকতা, জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যায়নের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য সমীকরণ ঘটে গেছে। এবং এই সমীকরণের প্রধান অনুঘটক হল ভাষা। এই কারণেই পার্থপ্রতিম নিম্নোক্ত সাহসী মন্তব্য করতে পারেন :

'উপন্যাস শেষ পর্যন্ত ভাষা ছাড়া কিছু নয়। উপন্যাসের অর্থ, যাকে বিষয় বলা যায় তা বিশেষ অর্থে কনটেন্ট হয়ে ওঠে ঐ ভাষা, ফর্মের কাঠামোর চাপে।' [মোটা হরফ বর্তমান লেখকের] এত বেশি আধুনিক কথা সাম্প্রতিক কালে খুব কম সমালোচক বৃহৎ পত্রিকায় লিখতে পেরেছেন। তিনি জানান, 'জনপ্রিয় উপন্যাসে এই ভাষা ও ন্যারেশান খুব বড় ব্যাপার। সুনীলের জনপ্রিয়তার প্রধান ভিত্তি তাই, তিনি এমন একটি ভাষায় লেখেন, যাতে হোঁচট খেতে হয় না, ভাবতে হয় না। তরতর করে পড়া যায়। এ ভাষার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনা অবশ্যই আছে : জীবন-শিল্পের দ্বান্দ্বিক দুন্দুভিতে এ ভাষাই সর্বভারক্ষম এক ভাষায় পরিণত হতে পারে। কিন্তু সুনীলের উপন্যাস ঐ দুন্দুভি বাজাতে চায় না। তার লক্ষ্য অন্য : তাই ঐ সম্ভাবনাকে ভেঙে

দেন। অথচ ঐ সম্ভাবনার কথাও জানিয়ে দেয় ক্বচিৎ কখনও…'। এরপর পার্থপ্রতিম সুনীলের দুটি ভাষার পার্থক্য দর্শান : একটি ভাষায় আছে 'কবিতার স্পর্শ', উপন্যাসের কবিতা', অন্যটির উদ্দেশ্য 'খবর দেওয়া, ইনফর্মেশন মিডিয়ায় নিমজ্জিত মধ্যবিত্ত পাঠক এটাই চায়, ভাষার এই তরল ভারহীনতা। আর এই ভাষায় সুনীল চলচ্চিত্রের মতো সব কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে চান।' এরপর তিনি দেখান কীভাবে বিভিন্ন সিরিয়াস ইস্যু, যেমন ফেমিনিজম বা নকশাল আন্দোলন সুনীলের উপন্যাসে জনপ্রিয়তার উপাদান হিসেবেই প্রক্ষিপ্তভাবে ব্যবহার হয়। এর সঙ্গেই আরেকটি উপাদানের (যৌনতা) হিসেবে ব্যবহারের উদাহরণ দেন : 'কালচার ইন্ডাস্ট্রির এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ সিনেমায় জনপ্রিয়তার উপাদান তিনটি, গোলগল্প, ভায়োলেন্স ও যৌনতা। উপন্যাসে প্রথম ও তৃতীয়টির দক্ষ ব্যবহার দরকার, কারণ, ভায়োলেন্স দৃষ্টিগ্রাহ্য করতে না পারলে আকর্ষক হয় না। সুনীল ঐ দুটি উপাদানকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের মন ও রুচি অনুযায়ী ব্যবহার করেন'। এছাড়া, যেহেতু জনপ্রিয় উপন্যাসের অন্যতম কাজ 'খবর দেওয়া', তাই পার্থপ্রতিম সুনীল প্রদত্ত উপন্যাসে কিছু পরিচিত তথ্যগত [বাস্তব] অসঙ্গতির ভিত্তিতে সকৌতুক প্রশ্ন তোলেন গড় পাঠকের অজানা তথ্যগুলির ক্ষেত্রেও এইরকম ভুল আছে কিনা ?

লেখার শেষে অবশ্য পার্থপ্রতিম মাঝে-মাঝে ঝিলিক দেওয়া সুনীলের সার্থক শিল্পভাষা এবং কোনো কোনো নায়কের [বিশেষত নীললোহিতের] অসম্পূর্ণ স্বপ্ন/ইউটোপিয়া ও সর্বোপরি সদর্থক মানবিক আবেগের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন 'বাণিজ্যায়নের নির্বাসনেও প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন'। তাই একটা ক্ষীণ আশাবাদ [বাণিজ্য নিগড় ভাঙার] নিয়ে লেখাটি শেষ হয়েছে।

চার

অতি সম্প্রতি সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসের একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং কিমাশ্চর্যম্ ! তিনি অন্তত এক্ষেত্রে তাঁর পূর্বকৃত-মার্গ অনুসরণ করেননি। কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতি, চিঠিপত্র নেই, নেই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে লেখা এবং লেখার আড়ালে লেখককে খোঁজার চেষ্টা। বাদবাকি যা রইল, তা হল, ভাষা, রচনাশৈলী, রচনার উপাদানসমূহ, কাহিনী কাঠামোর যুক্তি বিন্যাস এসবই তাঁর আলোচনার নিরিখ এবং এসবের জোরে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান : '…উজ্জ্বল গদ্য, শক্ত কলম, সন্দীপনের দুটোই আছে। এর সঙ্গে দরকার সংগঠন, চিন্তার সংগঠন, বক্তব্যের সংগঠন। স্বতন্ত্র হবার অলীক সাধনায় মাঝে মাঝে সন্দীপন তা ভুলে যান কেন ?' অস্যার্থ, ভাষা ঠিক আছে, সাহস আছে কিন্তু চিন্তা অবিন্যস্ত, বক্তব্য অসংলগ্ন / পৌনঃপুনিক / ক্লিশে। এবং স্বতন্ত্র হবার মিথ্যা চেষ্টায় সন্দীপন 'মাঝে মাঝে' তা ভুলে যান। অর্থাৎ, চিন্তা ও বক্তব্যে গঠন-দৈন্য কিছু-কিছু ক্ষেত্রে আছে, অনেক ক্ষেত্রেই নেই। আমাদের দুর্ভাগ্য সরোজবাবুর মতো খ্যাতনামা সমালোচকের মূল্যায়ন বুঝতে এতটা পরিশ্রম করতে হল, বিশেষত এমন একজন লেখক সম্পর্কে,

যার নাম তিনি মাত্র কয়েকমাস আগে প্রকাশিত গল্প উপন্যাসের দশকওয়ারি আলোচনায় একবারের জন্যও উল্লেখ করেননি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অতি যত্ন সহকারে সন্দীপনের আলোচ্য দুটি গ্রন্থ পড়েছেন। এমনকি উৎসর্গপত্রের হাস্যকর 'আমাদের সম্পাদক' জাতীয় শব্দদুটির প্রতিও বর্ষিত হয়েছে তাঁর সজাগ কটাক্ষ, যেমন গল্প সংকলনটির গোড়ায় প্রকাশিত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবের কয়েকটি ক্ষেত্রের [যেমন, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে] যাথার্থ ও কিছুক্ষেত্রে সন্দীপনের সুবিধাবাদী মনোভাবের ইঙ্গিত দান প্রভৃতি যত্নবান পাঠক / সমালোচক হিসেবে তাঁকে নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করবে। মূলগল্প না হলেও [উত্তর] আধুনিক বিচারে এগুলিও টেক্সটের অন্তর্গত। যেমন, গ্রন্থের প্রচ্ছদপটও [অন্য কেউ আঁকলেও] টেক্সটের সহায়ক অংশ [বোধগম্যতার দিক থেকে]। আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতে আঁকা রয়েছে একটি কলম-তীরের ছবি [আগেও সরোজবাবুর একটি লেখায় প্রায় একধরনের প্রতীক দেখা গেছে]। জানি না, কোন লক্ষ্য ভেদ করবে ? সন্দীপন কে ?

কারণ, লেখার টেকনিক, ভাষা, 'ক্ষোভ যন্ত্রণা ক্রোধে ফর্ম কনটেন্ট ভেঙে চুরমার করে দেবার নিরীক্ষায় আলোচ্য লেখকের সাহস ও দুর্জয় দুরন্তপনাকেও তিনি স্বীকৃতি দেন। কিন্তু বিদ্ধ করেন, যখন কয়েকটি [যৌনাঙ্গ, মূত্রত্যাগ, রমণ] উপাদানের পৌনঃপুনিকতার অভিযোগ করে তিনি 'পেচ্ছাপ' সংক্রান্ত 'প্রায় কুড়িটি' [আসলে এগারটি] উদাহরণের ডালি সাজান। [পরপর এতবার 'পেচ্ছাপ' কথাটা সম্ভবত আর কোনো বাঙালি লেখক / সমালোচক লেখেননি, সন্দীপনও নন।]

সরোজবাবু এসবের জন্য ক্যামু ও সার্ত্রের 'অস্তিবাদ'কে [জানি না, এটা ছাপার ভুল কিনা, কারণ ক্যামু / সার্ত্রের অস্তিবাদ (positivism) ছিল না, ছিল 'অস্তিত্ববাদ' (existentialism)] দায়ী ঠাউরেছেন। অতি সম্প্রতি, সন্দীপন মার্কেজের ম্যাজিক-বাস্তবতায় আক্রান্ত। সরোজবাবু তার খোঁজও রাখেন নিশ্চয়ই। কথা হল, লেখক শুরু থেকে এ অবধি যে লেখক [বিদেশী ঋণ মাথায় নিয়েই] 'গোল গল্প' [কথাটা সরোজবাবুরই] ভাঙার সর্বাধিক চেষ্টা চালিয়েছেন [সরোজবাবুকে আরেকবার 'কবি কর্ণপুর' জাতীয় 'ফর্মসর্বস্ব' লেখা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি], জনপ্রিয়তার একটি প্রধান উপাদান [যৌনতা] তাঁর অনায়াসলব্ধ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর সাহিত্য যে 'বাণিজ্যায়নের নির্বাসন' লাভ করেনি, এজন্য বোধহয় সন্দীপন আরেকটু বেশি প্রশংসা দাবি করতে পারতেন, তাঁর 'কল্পনার দৈন্য' কিছু কিছু শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহার সত্ত্বেও।

উপসংহারের বদলে

এইভাবে, বাস্তবতাবাদী সমীকরণ ধার করে বলতে হয়, দেশ পাল্টাচ্ছে, যুগ পাল্টাচ্ছে, সংকটের চেহারা পাল্টাচ্ছে প্রতিনিয়ত ; সব গান গাওয়া হয়ে গেছে, সব কথা সাঙ্গ হয়েছে—এই যে আবিল, অ-সরল উত্তর-আধুনিক সভ্যতা এখানে কোনো প্রেমিক সহজ-ভাবে 'আই লাভ য়ু ম্যাডাল' বলে আর প্রেম নিবেদন করতে পারে না, কারণ সে

(যদি মোটামুটি শিক্ষিত হয়) জানে যে এটি তার 'নিজস্ব' কথা নয়, বারবারা কার্টল্যান্ড কর্তৃক অনেক আগেই তা লিখিত ভাষা [এবং তার প্রেমাস্পদও তা জানে]। অতএব [উমবার্তো একোর মতে] এই ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করতে তাকে উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েই বলতে হয়, যেমনটা, বারবারা কার্টল্যান্ড বলতেন, 'আই লাভ য়ু ম্যাডলি।'

এই অসহায়, জটিল, বহুমাত্রিক সংকটের যুগে সমালোচনার ভাষা, তার তাত্ত্বিক পৃষ্ঠভূমি অজর, অচল থাকতে পারে না, এক পাঠকের মধ্যে বিভিন্ন পাঠকের সন্নিবেশ করাই আধুনিক সমালোচনার প্রধান চ্যালেঞ্জ। □

আমাদের নন্দনতত্ত্ব

প্রীতিগোপাল দত্তরায়

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে"— হিরণ্ময় পাত্রের আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে রয়েছে সত্যের স্বরূপ। হে পূষণ সেই আচ্ছাদন তুমি অপাবৃত কর। আমি সেই সত্য প্রত্যক্ষ করতে চাই—যে সত্য ধর্মরূপে সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে রয়েছে।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেনৈব জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।" —একমাত্র আনন্দ হতেই সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের জন্ম ও জীবন এবং আনন্দেই সবকিছুর পরিণতি।

বস্তুত এই আনন্দই সেই একক ও অনির্বচনীয় সত্য। এই সত্যই ধর্ম—যা বিশ্বচরাচরের ধারণপালনপোষণকারী নিয়ন্ত্রণী শক্তি—বৈদিক পরিভাষায় যার নাম 'ঋত'। এই আনন্দ বা ধর্ম বা ঋত—ভারতীয় জীবনসাধনার এটাই হল পরম ও চরম মর্মকথা। ভারতীয় দৃষ্টিতে, শিল্পসাধনা হল সমগ্র জীবনসাধনার অন্যতম ফলিত রূপ। তাই, যৌক্তিক পরম্পরায়, ভারতীয় শিল্পসাধনার মর্মকথাও হল এই আনন্দ বা ধর্ম বা ঋত। এই আনন্দই ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের উপায় ও উপেয়। শিল্পের ভুবনে এই আনন্দের-ই অপর অভিধা—রস। রসো বৈ সঃ। শিল্পের মাধ্যমে সেই রসই সহৃদয়হৃদয়-সংবেদ্য হয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তাই একে বলা হয় 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'।

জীবন-আনন্দ-শিল্প এই সূত্রের স্বীকৃতি আমরা পাই ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শিল্পের এক বিশিষ্ট পরিভাষায়: 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। আত্মসংস্কৃতিই হল সমস্ত শিল্পকর্মের আসল কথা। মানুষের দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সমন্বয়সূত্রে যে আত্মা, তার সংস্কৃতির অর্থ হল—সমস্ত তুচ্ছ ও তাৎক্ষণিক সংবেদনের ভিতর দিয়ে তার স্বরূপসত্তার উন্মোচন উদ্‌ঘাটন ও সমুজ্জ্বল প্রকাশ। ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়। নামরূপে অভিব্যক্ত আত্মাই শিল্পের প্রাণ। শিল্পীর ব্যক্তি-আত্মা শিল্পের মাধ্যমে বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তাই তখন শিল্প হয়ে ওঠে সর্বজনীন। শিল্পীসত্তার এই উত্তরণ—ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, ভূমি থেকে ভূমায়—যে উপলব্ধি বহন করে আনে তাই হল আনন্দ। অথবা, বলা যায় আত্মসংস্কৃতি বা শিল্পের মাধ্যমে শিল্পী সেই পরম সত্যধর্ম আনন্দের সন্নীপবর্তী হন, প্রত্যক্ষ করেন।

ভারতের সনাতন ধ্যানের বস্তু—জীবন। জীবনের প্রকৃত ও পরম অর্থকে আবিষ্কার করা—এই হল ভারতের জীবনসাধনা। ভারত মনে করে—গোটা জীবনটাই একটা শিল্প, এবং শিল্পের কর্ম হল—জীবনের সত্যস্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করা। আনন্দই সেই স্বরূপ। এই আনন্দে সুখও আছে, দুঃখও আছে। মিলনও আছে, বিরহও আছে। হাসিও আছে, কান্নাও আছে। সমস্ত বিপরীত যুগলেরই সেখানে

সহাবস্থান—এক সর্বান্তরশায়ী সত্যের মহিমায় সমাহিত এক পরম বোধের অনুবেদনায়। এই পরম বোধই আনন্দ। সকল খণ্ডিত বাস্তব-ই সেখানে আছে, কিন্তু আছে অখণ্ড সত্যের পূর্ণতায়। তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই। এই হল আনন্দ। সসীমকে অসীমের বিস্তারে, খণ্ডিতকে অখণ্ড পূর্ণতার আলোকে, ক্ষুদ্রকে বৃহতের প্রেক্ষাপটে যে অবেক্ষণ তাই আনন্দের নিধান।

অতএব দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের শিল্প তথা জীবনসাধনার মর্মবস্তু যে আনন্দ—তা ভারতীয় মনীষার লক্ষ্যবস্তু সত্যের অপর নাম। আবার এই আনন্দ-সত্যের মন্দিরেই প্রতিষ্ঠা শিব ও সুন্দর যুগলদেবতার। এই শিব হল সেই কল্যাণ—প্রতিক্ষণের হাজারো স্খলন-পতন-ত্রুটি, চ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা, দুরিত ও দুর্গতি পরিণামে যে মহাক্ষেমংকর ধ্রুবলোকে গিয়ে শাশ্বত উত্তরণ লাভ করে। এই সুন্দর হল সেই বিশ্বমোহন সুষমা যেখানে সুশ্রী ও বিশ্রী সমস্তই এক অদ্রোহী মিত্রতায় সমাহিত। সেই আনন্দলোকের মঙ্গলালোকে ওই সত্যশিবসুন্দরের সাক্ষাৎকারই ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের অন্বেষা।

বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এসবের সঙ্গে শিল্পের প্রকরণ ও প্রক্রিয়াগত বৈসাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এদের মধ্যে কোনো ঐকান্তিক বা আত্যন্তিক বিরোধের অস্তিত্ব ভারতীয় চিন্তাধারায় স্বীকৃত নয়। বহু বিশেষের মধ্যে যে সামান্য সত্যের অস্তিত্ব তাকেই আবিষ্কার করে বিজ্ঞান; কিন্তু প্রতিটি বিজ্ঞান-প্রস্থানের ক্ষেত্র বা গণ্ডী স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট। বিজ্ঞান যে সত্যগুলিকে খুঁজে বার করে, দর্শন তাদের সবগুলিকে একই সূত্রে গ্রথিত করে এবং সমগ্র জীবনের সঙ্গে তাদের সুসঙ্গতি স্থাপনা ক'রে একটা সার্বিক মহাসত্যের দ্বারে পৌঁছুতে চেষ্টা করে। তারই পথ ও পাথেয় নির্ধারণ করে দেয় তর্কশাস্ত্র। নীতিশাস্ত্রের কাজ হল—মানুষের ব্যষ্টিজীবন ও সমষ্টিজীবন যাতে করে সুশৃঙ্খল, কল্যাণময় ও শুভপ্রসূ হতে পারে তার বিধিবিধান পরিশীলিত ধীশক্তির দ্বারা অধিগত করে সকলের জন্য অনুশাসনিক শৈলীতে উপস্থাপিত করা। প্রভুসম্মিত অথবা সুহৃৎসম্মিত উপায়ে অনুচিতের পথ পরিহার করে উচিতের পথে অনুপ্রাণিত করাই নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য।

শিল্পের প্রকরণ হল মানুষের সর্বজনীন ও সমগ্র চিৎসত্তা, প্রক্রিয়া হল কল্পনা ও কারুকৃতি এবং কলাকৌশলগত চারুতা। এখানেই বৈসাদৃশ্য।

কিন্তু শিল্পের লক্ষ্য-ও হল সত্য—যে সত্যের স্বরূপ হল আনন্দ। শিল্পকলার মাধ্যমে যে কল্যাণবোধনা জাগ্রত হয় তার গভীরতা ও নিবিড়তা এবং বিস্তৃতির মাত্রাগত ও গুণগত পরিমিতি বিশালতর। যে প্রাণশক্তি ও প্রেরণাসম্বেগ শিল্পকলা থেকে সঞ্চারিত হয় তার দ্রাবণ ও সঞ্জীবন শক্তি অনেক বেশি তীব্র, ত্বরিত ও অমোঘ।

জগৎ ও জীবনকে বিভিন্ন দার্শনিক তাঁদের নিজ নিজ বোধ ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখেন। তাই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকের অনুবেদন

ও ব্যাখ্যা বিভিন্ন। দার্শনিকদের ভাবস্পন্দন, ভাষা ও ভাষ্যও ভিন্ন রকমের। জগৎ ও জীবনকে নিয়েই শিল্পীদেরও কারবার। শিল্পীরাও নানা রূপে পরিবেশন করেন তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন আলেখ্য। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যে ভিন্নতা তা একান্তই বাহ্য। তদতিরিক্ত যে সত্য তার নাম আনন্দ—তা কিন্তু অভিন্ন। তার স্ফুরণ সৌন্দর্যের ছটায়। কীটসের কথায়—Truth is Beauty, Beauty Truth। এই সুন্দরই শিব—এবং তাই শান্তি। শিল্পী ও ঋষি—উভয়ের কণ্ঠেই তখন একই বাণী—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ……। বিশ্বময় ছড়ানো অজস্র বস্তু ও তথ্যসম্ভার মন্থন করে যে অভিজ্ঞতার জন্ম হয় তা অনির্বচনীয়। দার্শনিক ও শিল্পী উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। ব্রাডলি থেকে ডিউই সবারই এই মত। ওই অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার অভ্যন্তরস্থ রহস্যের উদ্‌ঘাটন ঘটে—দর্শনে এবং শিল্পেও। দর্শনে এই উদ্‌ঘাটন আংশিক এবং শিল্পে তা সার্বিক। সর্বভূতান্তরাত্মা, সকল সৃষ্টির অন্তরাবশায়ী অনির্বচনীয় একক সত্তার উপলব্ধির মাধ্যমে দর্শন মানবমনকে নিয়ে যায় মুক্তির দ্বার পর্যন্ত, আর শিল্পীর শিল্পলোকে ঘটে তার পূর্ণাঙ্গ মুক্তি। সেই মুক্তিই আনন্দ—তাই পরম সত্য। আর এই সত্যেই সুন্দর ও শিবের প্রকাশ। সেই মহান একের সঙ্গে, সেই সীমাহীন মহা-সত্তার সঙ্গে একাত্মতার তন্ময়তায় দার্শনিক ও শিল্পী উভয়েই হয়ে ওঠেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি, আনন্দময় ব্রহ্ম, সুন্দরের আলোকে দিব্যদ্যুতিময় ঈশ্বর, বিশ্বময় মহাশৃঙ্খলারূপী যে মহামঙ্গল—তারই অখণ্ড প্রভাববৈভবে পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দ সত্তা—অন্যের অন্তরেও সঞ্চারিত হয় সেই মহাভাব দর্শনের ভাষায়, শিল্পীর সৃষ্টিতে। শিল্পের মাধ্যমে এই সঞ্চার অনায়াসতর, গভীরতর, নিবিড়তর এবং অনেকটা অধিক—যার নাম আনন্দ—যা হৃৎতন্ত্রে এবং যন্ত্রণাময় জীবনযন্ত্রে অনুস্যূত হয়ে জর্জরিত বদ্ধ জীবনের মধ্যেও নির্জর অমর এক মুক্ত মহাজীবনের জন্মদান করে। প্লোটাইনাসের কথার সঙ্গে অল্প কিছু সংযোজনের যোগফল—এই কথাতেই এসে দাঁড়ায়। ভারতীয় নন্দনতত্ত্বের মর্মকথা বোধ হয় এটাই।

ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে যেহেতু শিল্পকৃতি হল আত্মসংস্কৃতি, সেই হেতু শিল্পপ্রতিভা হল নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা ও অঘটনঘটনপটীয়সী। আমাদের ইন্দ্রিয়পরিচ্ছিন্ন লোকায়ত জীবনের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে যা ঘটে চলেছে তাকেই আমরা বলি বাস্তব। শিল্পে এই বাস্তব অবশ্যই বর্জনীয় বস্তু নয়—একান্তই স্বীকার্য ও অবলম্বনীয়। কিন্তু শিল্প বাস্তবসর্বস্ব নয়—বাস্তব সেখানে অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনা রসের সঙ্গে জারিত হয়ে এমন এক সৃষ্টিকে বাস্তব করে তোলে যা বাস্তব বা নিয়তির রাজ্যের নিয়মকেও অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয় এক বিচিত্র লোকোত্তর অনুভূতিলোকে—যাকে অঘটন বলে। আর তা না হলে, তা নেহাৎই ইতিহাস অথবা আলোকচিত্র অথবা বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনমাত্র অথবা বড় জোর একটা সুচারু বিশ্লেষণ। শিল্পে বস্তুজগৎ ভাবলোকে এবং তা থেকে মহাভাবলোকে এক অভিনব রূপে প্রকাশ লাভ করে, আবার অনেক সময় ভাব ও কল্পনার জগৎও এবং অনৈতিহাসিক বস্তুও শিল্পায়িত হয়ে বস্তুজগতের সীমানায়

এসে বাস্তবতার স্পষ্টতা ও তীব্রতা অর্জন করে। তাই শেক্সপীয়র ও দ্বিজেন্দ্রলালের বস্তুভিত্তিক নাটকগুলিও যেমন শিল্প, ইবসেন—রবীন্দ্রনাথের ভাবভিত্তিক লেখাগুলিও তাই। রামজন্মের আগেই রামায়ণ তাই শিল্প হিসেবে ব্যর্থ নয়। মিলটনের Paradise Lost রূপকথাভিত্তিক হয়েও উৎকৃষ্ট শিল্প। এদের সংবেদন চিরন্তন—বস্তুজীবনের মতো এরাও অত্যন্ত পরিচিত। কোনোটাই অপাঙ্‌ক্তেয় নয়।

অনেকে মনে করেন—Art for Art's sake। 'Art for Man's sake' কথাটা শিল্পতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্বের বহিরঙ্গমাত্র অথবা পরিপন্থী। ভারতবর্ষ মনে করে—যদিও শিল্প এক অনির্বচনীয় রসলোকের বস্তু, তবু সমাজ-সচেতনতা, যে কোনো সৃষ্টির মতোই, শিল্পসৃষ্টিরও একটি অপরিহার্য প্রেরণা ও প্রয়োজন। সমাজবিমুখ কল্যাণ নিরপেক্ষ নিতান্তই নৈর্বিকল্পিক কোনো কর্মই ভারতবর্ষ কোনোদিন সমর্থন করেনি। যে কর্ম উৎসৃষ্ট গণ্ডীবদ্ধ অহিতকর অথবা হিতবুদ্ধিবর্জিত, একান্তই আত্মনিষ্ঠ—সেই কর্মকে ক্ষুদ্র ও মিথ্যা বলে ভারতবর্ষ চিরদিনই তিরস্কার করেছে। তাই ভারতীয় শিল্পতত্ত্বে শুধু 'আমি' নয়, 'তুমি-আমি' সম্পর্কটা অবিচ্ছেদ্য। তাই, ভারতীয় নন্দনতত্ত্বে, শিল্পীর সৃষ্টি শুধু শিল্পীর জন্য নয়, অথবা শুধু তাদের জন্য নয় যারা জীবন থেকে পলায়নবৃত্তিচতুর, যারা নিভৃত ভাবনিলয়ে নিঃসঙ্গ রসবিলাসের অভিসারী। সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে, অবশ্যই শিল্পের ভিতর দিয়েও, ভারতীয় শিল্পীর চিরানুস্যূত এই এষণা—'সর্বে সুখিনঃ সন্তু সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু ন কশ্চিদ্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥'[১] তাই ভারতীয় সাহিত্যে সহভাব বা সাযুজ্যের মাধ্যমে হিতসাধনার প্রবর্তনা। তাই ভারতীয় নাট্যরচনায় প্রায়ই ঈশ্বরোপসনায় শুরু, ভরতবাক্যে শেষ—উৎসচেতনাসহ রাজা প্রজা জনসাধারণ সর্বভূত ও ভূতধাত্রী পৃথিবীর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনাই যার তাৎপর্য। তাই ভারতীয় নাট্যে সমস্ত 'নেতি'র মধ্য দিয়ে ইতিবাচকতার প্রতিষ্ঠা। তাই নবরসের রূচিরবিন্যাসের মাধ্যমে পরিণামে নীতি ও ও সত্যের জয়বার্তাই ভারতীয় সাহিত্যের অন্বিষ্ট। সীমিত জীবনকে অসীমের প্রেক্ষায় প্রত্যক্ষ করলে, সমস্ত বিচ্ছেদ মিলনে পর্যবসিত হয়—পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের এই ফলশ্রুতির পরিচিতিই 'মিলনান্তক' নাটকে সুপরিস্ফুট। তাই কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটককে পঞ্চম অঙ্কে শেষ না করে সপ্তম অঙ্ক পর্যন্ত প্রসারিত করে নিয়েছেন কবি। একান্তই আত্মোপলব্ধির প্রকাশ হলেও, শিল্প যে বহুজনের প্রাণে এক অতি শক্তিশালী প্রেরণা ও শিক্ষার প্রভাব বিস্তার করে—তা অনস্বীকার্য। যুগবিপ্লবে রুশো, ভলটেয়ার, তলস্তয়, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে এই সত্যটি সুপ্রকট। কাব্যধর্মী ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা যে বিনয়-বাদল-দীনেশকে সৃষ্টি করেছে তা আমরা ভুলি কী করে? তাই ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রে সবসময়ই বলা হয়েছে—'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'[২] এই শিক্ষাই যেন প্রতিষ্ঠা পায় সাহিত্যে। সাহিত্যিক শুধু শিক্ষক নন—কিন্তু শিক্ষাদানও তাঁর কাজ…তবে সেই শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিটি ভিন্ন। সেটি হবে কান্তার মতো ললিত পথায়। কাব্যের ফল সম্বন্ধে কাব্যপ্রকাশকার

মম্মটভট্ট পরিষ্কার করেই বলে দিলেন—কাব্য যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।—কাব্যকর্তা এবং কাব্যের শ্রোতা ও দ্রষ্টা এই উভয়ের লাভ—একাধারে যশ ও অর্থ ও লৌকিক জ্ঞান এবং সাক্ষাৎ পরমা নির্বৃতি, অমঙ্গলের বিনাশ ও কান্তাসম্মিত হিতোপদেশ। কবিকে একজন অলস কল্পনাবিলাসী পলাতক প্রান্তিক অপ্রাকৃত স্বৈরাচারী হিসেবে ভারত দূরে সরিয়ে রাখেনি। ভারতের সমাজ-মঞ্চে কবির এক বিশিষ্ট নির্দিষ্ট সমাদৃত স্থান—কবি সেখানে ক্রান্তপ্রজ্ঞ সত্যদ্রষ্টা স্রষ্টা—জনমানসের মহানিয়ামকশক্তিকেন্দ্র রূপে তাঁর এক গৌরবদীপ্ত গভীর স্থান।

ভারতের প্রথম কাব্য—ঋগ্‌বেদ। মুখ্যত ধর্মগ্রন্থ হলেও কাব্যসুষমায় সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। ভিন্টারনিৎসের কথায়—কাব্যকলার নিদর্শন হিসেবে বিশ্বসাহিত্যে ঋগ্‌বেদের একটি অগ্রগণ্য স্থান অনস্বীকার্য। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সঙ্গীত এবং কাব্য—এ সবই শিল্প। এ সবেরই সুপ্রচুর আলোচনায় ভারতীয় মনীষা সুসমৃদ্ধ। কাব্যজিজ্ঞাসা সম্পর্কিত আলোচনাগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচশোরও অধিক। ওগুলো বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। আরও আলোচনাগ্রন্থ এবং তাদের টীকাভাষ্যের সংখ্যা ধরলে—আরও অনেক।

বিভিন্ন শিলালিপির দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই অনুমিত হয় যে, ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের বিকাশ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে অথবা তার বেশ কিছু আগেই একটা পরিচ্ছন্ন রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছে। উত্তরকালের শিলালিপি ও কাব্যগ্রন্থাদির দৃষ্টান্ত থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে—খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে কাব্যকলার উপাদান হিসেবে বহু অলঙ্কার ও গুণ, কাব্যের প্রকার ও কবিশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ক ধারণা একটা সুস্পষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং দণ্ডী ও ভামহকৃত সুনিবদ্ধ কাব্যশাস্ত্র গ্রন্থের প্রকাশও কাব্যজিজ্ঞাসার ধারাকে একটা সুস্পষ্ট মাত্রা দান করেছে।

আলোচ্যমান শাস্ত্রের প্রাচীন নাম কাব্যালঙ্কার। ভামহ, বামন ও রুদ্রট এই নামেই শাস্ত্রকে আখ্যাত করেছেন। অলঙ্কার শব্দের দুটি অর্থ—উক্তিবৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত চমৎকারজনক উক্তি। সম্ভবত খ্রিস্টীয় ৭ম/৮ম শতকের পরে কাব্যশাস্ত্রের অপর নাম দেখা যায়—সাহিত্য। 'শব্দার্থৌ সাহিতৌ কাব্যম্'৩—কাব্যলক্ষণে উক্ত এই শব্দার্থসাহিত্যের নিরিখেই শাস্ত্রের নামও হয় 'সাহিত্য'। ড: রাঘবনের মতে, দণ্ডী ও ভামহের পূর্বে এই শাস্ত্রের নাম ছিল 'ক্রিয়াকল্প'—যদিও ড: কানে এই মত স্বীকার করেন না।

ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের বিষয় বহু ও বিচিত্র। তাই বলে প্রতিটি শাস্ত্রগ্রন্থে যে আলোচ্য প্রতিটি বিষয়ই আলোচিত হয়েছে তা নয়। সাহিত্যদর্পণ, প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ এই কয়েকটি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্রসহ সমুদয় বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্র, ভামহ, রুদ্রট ও বাগ্‌ভটের কাব্যালঙ্কার, মম্মটের কাব্যপ্রকাশ, জগন্নাথের রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থে নাট্যশাস্ত্র বাদে প্রাসঙ্গিক অপর সকল বিষয়েরই পর্যালোচনা দৃষ্ট হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র এবং ধনঞ্জয়ের দশরূপক নাট্যশাস্ত্র ও রসতত্ত্বের

বিবরণে সীমাবদ্ধ। শুধু অলঙ্কারের আলোচনা রয়েছে অনেকগুলি গ্রন্থে—যথা অলঙ্কারসর্বস্ব, কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি। ধ্বনিতত্ত্বের উপর রচিত ধ্বন্যালোক (আনন্দবর্ধন), বক্রোক্তির উপরে বক্রোক্তিজীবিত (কুন্তক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শব্দশক্তি এবং রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নামকরা বই আছে। এছাড়াও আরও নানা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রয়েছে।

কাব্যশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তুসামগ্রীর একটি হল কাব্যপ্রয়োজন। বিবিধ প্রয়োজনের মধ্যে যেটি প্রধান তা হল—প্রীতি বা আনন্দ। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাই বলেছেন—'ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যং চ যদ্ভবেৎ'।[৪] আরও বলেছেন—'বেদবিদ্যেতিহাসানামাখ্যানপরিকল্পনম্। বিনোদজননং লোকে নাট্যমেতদ্ভবিষ্যতি ॥'[৫]—'তথাপি প্রীতিরেব প্রধানং···প্রাধান্যেনানন্দ এবোক্তঃ'[৬] (লোচন)—'প্রীত্যাত্মা চ রসস্তদেব নাট্যম্'[৭] (লোচন)। কাব্যপ্রকাশকার খুলেই বললেন—'সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্।'[৮]

কাব্যহেতু—এটিও ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের অন্যতম বিষয়। এ বিষয়ে অনেকেরই এই মত যে—প্রতিভা, ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস এই তিনটি মিলিতভাবে কাব্যের হেতু। —'নৈসর্গিকী চ প্রতিভা শ্রুতং চ বহু নির্মলম্। অমন্দশ্চাভিযোগঃ স্যাৎ কারণং কাব্যসম্পদঃ ॥'[৯] (দণ্ডী)—'শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ। কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে ॥'[১০] (মম্মট)। অনেকের মতে—প্রতিভাই একমাত্র হেতু। 'সা (শক্তিঃ) কেবলং কাব্যে হেতুরিতি যাযাবরীয়ঃ'[১১] (রাজশেখর); 'প্রতিভৈব চ কবীনাং কাব্যকরণকারণম্। ব্যুৎপত্ত্যাভ্যাসৌ তস্যা এব সংস্কারকারকৌ ন তু কাব্যহেতুঃ।'[১২] (বাগ্‌ভটের অলঙ্কারতিলক); তস্য চ 'কারণং কবিগতা কেবলা প্রতিভা'[১৩] (রসগঙ্গাধর)।

কাব্যশাস্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল—কাব্যের লক্ষণ। কাব্যের কাব্যত্ব, কাব্যের স্বরূপ, কাব্যের আত্মা—এই নিয়ে ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে বহু ভাবনাচিন্তা হয়েছে। কাব্য হতে গেলে অবশ্যই কী চাই, কাকে কাব্য বলবো—এ সম্বন্ধে বহুজনের বহু মত ভিড় করে আছে কাব্যশাস্ত্রের আসর। সূচনা থেকেই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত কাব্যের ব্যাপারে শব্দ ও অর্থের উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই ধরনের কাব্যলক্ষণ সূত্রের কয়েকটি যথা—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্'[১৪] (ভামহ), 'ননু শব্দার্থৌ কাব্যম্'[১৫] (রুদ্রট), 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলঙ্কৃতী পুনঃ ক্বাপি'[১৬] (মম্মট), 'শব্দার্থৌ নির্দোষৌ সগুণৌ প্রায়ঃ সালঙ্কারৌ কাব্যম্'[১৭] (বাগ্‌ভট) 'অদোষৌ সগুণৌ সালঙ্কারৌ চ শব্দার্থৌ কাব্যম্'[১৮] (হেমচন্দ্র)। আচার্য দণ্ডীর পক্ষপাত শব্দের উপরই অধিক—'তৈঃ শরীরং চ কাব্যানামলঙ্কারাশ্চ দর্শিতাঃ। শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী ॥'[১৯] রসগঙ্গাধরে জগন্নাথের উক্তি—'রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্।'[২০] ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্ধন বললেন—'সহৃদয়াহ্লাদিশব্দার্থময়ং ত্বমেব কাব্যলক্ষণম্।'[২১] শব্দ এবং অর্থ, অথবা শব্দ—গুরুত্বটা যারই হোক, আসল বক্তব্যটি হল—সাধারণের ভাষা এবং কাব্যের ভাষা এ দুয়ের মধ্যে যে ফারাক তার কারণ

হল ইষ্টার্থপ্রতিপাদক শব্দই কাব্যের প্রাণ। এমন শব্দ—যা রমণীয়ার্থপ্রতিপাদক। এমন শব্দ—যা অনির্বচনীয় চমৎকারের জনক। তেমন শব্দের নির্বাচন ও যথার্থ বিনিয়োগ—কাব্যনির্মাণের এই হল মূলসূত্র। দণ্ডী ঠিকই বলেছেন—'গৌগোঃ কামদুঘা সম্যক্‌প্রযুক্তা স্মর্যীতে বুধৈঃ'। অর্থাৎ সম্যকপ্রযুক্তা বাণী কামধেনুর মতো অভীষ্ট প্রদান করে। মহাকবি কালিদাস সমগ্রজীবনের কাব্যসাধনার শেষে পরিণত বয়সে 'রঘুবংশ' মহাকাব্য রচনার প্রাক্‌কালে শব্দার্থপ্রতীতির জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছেন অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে। জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ' ॥২২

কাব্যের শরীর নির্মাণে শব্দের অথবা শব্দার্থসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য অবশ্যই। কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—কাব্যের আত্মা কী? প্রসিদ্ধ লক্ষণগুলি—যেগুলি উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে—সেগুলির মধ্যে কাব্যাত্মার সংকেত নিহিত থাকলেও, স্পষ্টভাবে তার উল্লেখ বিশ্বনাথ কবিরাজের লক্ষণে। বিশ্বনাথ বললেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। অর্থাৎ রসগর্ভ বাক্যই কাব্য। রসতত্ত্বের প্রথম উল্লেখ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে। এই তত্ত্বের বিস্তার সাধন করে আনন্দবর্ধন বললেন—'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'। তাঁর মতে ব্যঙ্গ্যার্থই কাব্যের আত্মা।

কাব্যের আত্মা কী?—এই প্রশ্নের জবাবে ক্রমান্বয়ে যে প্রধান প্রস্থানগুলি ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রের ইতিহাসে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেগুলি হল—রস, অলঙ্কার, রীতি, ধ্বনি ও বক্রোক্তি।

রসতত্ত্বের প্রাচীনতম প্রবক্তা হলেন নাট্যশাস্ত্রকার ভরত। রসতত্ত্ব প্রসঙ্গে ভরতের একটি সূত্রই হল সমগ্র বিমর্শের অবলম্বন। সূত্রটি হল—'বিভবানুভাবব্যভিচারি সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'।২৩ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন—লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত। রসপদার্থটি কী এবং কীভাবে তার নিষ্পত্তি হয় সে সম্বন্ধে নিজ নিজ ধারণামতো ওঁরা যে ব্যাখ্যাগুলি দিয়েছেন সেগুলি কেন্দ্র করে চারটি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে—লোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, নায়কের ভুক্তিবাদ ও অভিনব গুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। এই চারটিই অতি পরিচিত মত। আরও চারটি, মোট আটটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ পাওয়া যায় রসগঙ্গাধরে।

রস কী? রস্যতে ইতি রসঃ। যা আস্বাদন করা যায় তাই রস—aesthetic delight। কেমন করে এই রসের নিষ্পত্তি ঘটে দ্রষ্টা ও পাঠকের মনে নাটক ও কাব্যের মাধ্যমে—কেমন করে সেই পরম রমণীয়ের আস্বাদন বা উপলব্ধি হয় সহৃদয়-হৃদয়ে সেই পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণচ্ছলে যা বলা হয়েছে, সংক্ষেপে তা হল এই রকমের।

—মানুষের অন্তরে স্থায়িভাবে নিহিত রয়েছে কতগুলি সংস্কার বা ভাব। এদের বলা হয় স্থায়িভাব। রতি, উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, জুগুপ্সা, ভয়, ক্রোধ, হাস—এই হল সর্বজনস্বীকৃত আটটি স্থায়িভাব। অনেকের মতে, আরও একটি স্থায়িভাব আছে—

তার নাম নির্বেদ। শ্রদ্ধা, স্নেহ ও লৌল্য এই নামে আরও তিনটি স্থায়িভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু, সমালোচকদের মতে, এরা কোনো স্বতন্ত্র ভাব নয়—শ্রদ্ধা ও স্নেহ রতির অন্তর্গত এবং লৌল্য হাসের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়িভাব রতি শৃঙ্গারে, উৎসাহ বীরে, শোক করুণে, বিস্ময় অদ্ভুতে, জুগুপ্সা বীভৎসে, ভয় ভয়ানকে, ক্রোধ রৌদ্রে, হাস হাস্যে এবং নির্বেদ শান্তে রসরূপতা প্রাপ্ত হয়ে আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়ানক, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত—এই ন-টি রসের কোনো একটি অঙ্গিরূপে এবং অন্য কোনো এক বা একাধিক রস অঙ্গরূপে সমবেতভাবে সহৃদয়-হৃদয়সংবেদ্য হয়ে কাব্যকে কাব্যপদবী দান করে। রসতত্ত্ববাদের এটিই মর্মকথা।

অলঙ্কারবাদের পুরোধা হলেন ভামহ এবং উদ্ভট। দণ্ডী, রুদ্রট, প্রতীহারেন্দুরাজ—এঁরাও এই মতেরই সমর্থক ও পরিপোষক। এঁদের মতে,—'কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ'।[২৪] অলঙ্কার হচ্ছে ভূষণ। ভূষণবর্জিত রচনার আকর্ষণীয়তা থাকে না। তাই তার কাব্যত্ব উপাদেয় হয় না।—'ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতামুখম্'[২৫] (ভামহ)। ধ্বনিতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব সম্বন্ধে পর্যাপ্ত পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও অলঙ্কারবাদীরা বলতে চান—অলঙ্করণই কাব্যনির্মাণের আবশ্যিক উপকরণ। বাচ্যার্থপ্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থপ্রধান, গুণীভূতব্যঙ্গ্য—কাব্যের মৌলিক চরিত্র যাই হোক না কেন, অলঙ্কারের চাকচিক্যে চর্চিত না হলে কোনো কবিকৃতিকেই সমাদরের মর্যাদা প্রদান করা চলে না। সোজা করেই বলি, ঘুরিয়েই বলি, কায়দা করেই বলি—উক্তিবৈচিত্র্যের নানা কলা ও কারুক্রিয়া প্রয়োগ করে বস্তুব্যকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে মন ও মেজাজ তৎক্ষণাৎ তাতে সংলগ্ন ও সংসক্ত হয়ে পড়ে—অলঙ্কারবাদীরা এটাই মনে হয় বলতে চান। উক্তির বৈচিত্র্য অনুসারে বিভিন্ন অলঙ্কারের রূপকল্প নির্ধারণ করে গেছেন অলঙ্কারবাদীরা। কালক্রমে তাদের নাম ও সংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে। মাত্র চারটি অলঙ্কারের উল্লেখ করেন ভরত। প্রাচীন শাস্ত্রে পাঁচটি এবং আটটি অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার পরে কোথাও আঠারটি, কোথাও ত্রিশ ও চল্লিশ প্রকারের উল্লেখ আছে। মম্মট একষট্টি প্রকার অলঙ্কারের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। রুয্যক পঁচাত্তরটি, চন্দ্রালোক একশতটি এবং কুবলয়ানন্দ একশত পনেরটি অলঙ্কার উপহার দিয়েছেন। এছাড়াও আরও অনেক রয়েছে।—'সহস্রশো হি মহাত্মভিরন্যৈরলঙ্কার-প্রকারাঃ প্রকাশিতাঃ'[২৬] (ধ্বন্যালোক)। অলঙ্কার যেমন কাব্যশরীরের শোভাসম্পাদক—কাব্যের বহিরঙ্গভূষণ; তেমনি আছে কতগুলি 'গুণ'—যেগুলি কাব্যসত্তার অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের উপকরণ। দশটি গুণের কথা বলেছেন ভরত। দণ্ডীও ওই দশটি গুণের বিবরণই দিয়েছেন। ভামহ মাধুর্য, প্রসাদ এবং ওজঃ এই তিনটি গুণের কথা বলেছেন। গুণও অলঙ্কারের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন বামন—'কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মা গুণাঃ। তদতিশয়হেতবস্ত্বলঙ্কারাঃ।' অর্থাৎ—গুণ হল কাব্যশোভার কর্তা, সেই শোভার আধিক্য সম্পাদনের হেতু হল অলঙ্কার। অলঙ্কারের সঙ্গে গুণ এবং গুণের সঙ্গে অলঙ্কার—এই দুয়ে মিলে একটি প্রাণবন্ত রমণীয় কাব্যশরীরের

পরিকল্পনা ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান। গুণের কথা শুধু ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই নয়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অঙ্গীকৃত এবং প্রচারিত হয়েছে।

রীতিবাদের আদি প্রবক্তা হলেন বামন। এই মতে 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য'। 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।'[২৭] বামনাদির মতে—উপনাগরিকা, পরুষা এবং কোমলা এই ত্রিবিধ রীতি যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী নামে পরিচিত। রুদ্রটের মতে রীতি চারটি—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটীয়া ও গৌড়ীয়া। সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ছয়টি রীতির উল্লেখ রয়েছে—বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ীয়া, আবন্তিকা, লাটীয়া ও মাগধী। পদসন্দর্ভের মাধুর্য বা পারুষ্য, সমাসের অল্পতা বা আধিক্য এই সব বৈশিষ্ট্যের বিচারে অঞ্চল-ভিত্তিক বিশিষ্ট পদবিন্যাসপদ্ধতিকেমেই এক-এক প্রকারের রীতি। গদ্য-পদ্য ভেদে, দৃশ্যশ্রব্য-ভেদে, অঙ্গল ভেদে, ভাব ভেদে শব্দের প্রকৃতি ও বিন্যাসশৈলীর বৈলক্ষণ্য —এটাই রীতিতত্ত্বের সারকথা। কাব্যনির্মাণে এটিও একটি মূল্যবান মাত্রা, কাব্য-জিজ্ঞাসায় যার অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে। কবিকৃতির একটি আনুষঙ্গিক চরিত্রধর্ম হলেও, রীতি কখনো কাব্যের আত্মা হতে পারে না।

'বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতম্'—অর্থাৎ বক্রোক্তি হল কাব্যের আত্মা। এই মতের প্রবক্তা হলেন কুন্তক। কুন্তকের মতে—বক্রোক্তি হল এমন ধরনের ভাব ও ভাষা যা অভ্যন্ত প্রচলিত সাধারণ অর্থ ও বাগ্‌বিন্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বৈদগ্ধপ্রসূত অনিতরসাধারণ বাচনশিল্প কাব্যে অপেক্ষিত—এ কথা মেনে নিয়েছেন অনেকেই, কিন্তু তাই বলে মেনে নেওয়া চলে না যে—বাগ্‌বিষয়ক বৈদগ্ধ্য বা নিপুণতা বা অসাধারণত্বই (যাকে বক্রোক্তি বলা হয়েছে) কাব্যের আত্মা।

'ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য'[২৮]—আনন্দবর্ধনের এই উক্তির তাৎপর্য রসতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধেয়। রসও একটি ব্যঙ্গ্যার্থ। একটি সমগ্র নাটকে বা কাব্যেই শুধু একটি রসের পরিস্ফুরণ সম্ভব, সীমিত ক্ষেত্রে তা সম্ভবপর নয়। কাব্যশিল্পে একমাত্র রসের অনন্যত্ব বা ঐকাধিপত্য মেনে নিলে, লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ বর্তায়। এই কারণেই, শুধু রসধ্বনি নয় ধ্বনিমাত্রই কাব্যের প্রাণ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ধ্বনিকার। কথাটা এই অর্থে সঙ্গত বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই লক্ষণকেও অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট বলে অনাদর করেছেন অনেকেই। তাঁদের মতে, ধ্বনিশূন্য যে রচনা, অথবা ধ্বনি অপ্রধান যেখানে এমন রচনা—এদেরও কাব্য বলে স্বীকার না করার কোনো যুক্তি নেই।

ভারতীয় কাব্য জিজ্ঞাসার প্রায় দু হাজার বৎসরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের ধারায় অনেক বিচার-বিমর্শ, অনেক বাদ-বিবাদ ও মতামতের সম্ভার সঞ্চিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে—কাব্যের স্বরূপ ও কাব্যসংক্রান্ত বহুবিধ বিষয়ের বহুমুখী চিন্তাভাবনার ভিতর দিয়ে ভারতীয় তাত্ত্বিকেরা সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অজস্র মূল্যবান সিদ্ধান্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন। রস, অলঙ্কার, রীতি, গুণ, ধ্বনি প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্ব এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় উপস্থাপিত ও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

যিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা করেছেন, তিনি তার উপরই জোর দিয়েছেন। মনে হয়েছে ওটিই বুঝি চরম ও চূড়ান্ত কথা। কিন্তু ওইভাবে দেখলে ও ভাবলে ভুল করা হবে। কাব্যের সত্তাকে কেন্দ্রবিন্দু করে সমস্ত বিষয়সামগ্রীকে সমন্বয় সূত্রে তার সঙ্গে যুক্ত করে দেখতে পারলে একটি অখণ্ড সুসমঞ্জস সত্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কাব্যজিজ্ঞাসার প্রথম প্রশ্ন হল—কাব্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর—চমৎকারজনক বাঙ্ময় সৃষ্টিই কাব্য। কাব্যসত্তার মৌল আবেদন সহৃদয়-হৃদয়। সংবেদনশীল রসিকচিত্তে অসংজ্ঞেয় অনির্বচনীয় আনন্দানুভূতি সঞ্চারিত করাই কাব্যের ধর্ম। একটি পূর্ণাঙ্গ সদ্-বস্তুরূপে কাব্যকে কল্পনা করে, তার অন্তরঙ্গ স্বরূপের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করার জন্য যে সকল কলা কৌশলের উপদেশ কাব্য-বিশারদেরা দিয়েছেন—অলঙ্কার, রীতি, গুণ, ধ্বনি ইত্যাদি—তাদেরও স্ব-স্ব-স্থানাংকগত যথার্থ উপযোগিতা অবশ্যই প্রণিধেয়—কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। ভারতের শিল্পতত্ত্ব তথা নন্দনতত্ত্ব তার অধ্যাত্মতত্ত্বের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংযুক্ত। আর তাই বিশ্বচেতনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবন-চেতনা তথা সমাজচেতনা এই নন্দনতত্ত্বের মর্মবীণায় নিত্য অনুরণিত। চমক চারুতা ও চাকচিক্যের সহস্র আভরণ ও উপায়-উপকরণের আড়ম্বর ছাপিয়ে আনন্দঝরা কল্যাণদৃষ্ট প্রাণময়ী কাব্যপ্রতিমার সর্বাঙ্গ থেকে অনায়াসে উপচে পড়বে—ভারতীয় নন্দনচেতনার এইটিই অনন্যা অন্বেষা।

---

১. সবাই সুখী হোক, সবাই নিরাময় হোক। সবাই মঙ্গলের অধিকারী হোক। কেউ যেন দুঃখ না পায়।
২. রামাদির ন্যায় আচরণ করতে হবে, রাবণাদির ন্যায় নয়।
৩. সহভাবযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।
৪. দৃশ্য ও শ্রব্য কাব্য উভয়ই ক্রীড়নায়কের ন্যায় (আনন্দদায়ক) হবে।
৫. বেদ বিদ্যা ও ইতিহাস অবলম্বনে রচিত আখ্যান নাট্যরূপে আনন্দ উৎপাদন করবে।
৬. প্রীতিই প্রধান···প্রধানত আনন্দের কথাই উক্ত হয়েছে।
৭. প্রীতিই রসের আত্মা এবং তাই নাট্য।
৮. সকল প্রয়োজনের মৌলিভূত হল আনন্দ। তৎক্ষণাৎ রসাস্বাদন সমুদ্ভূত এই আনন্দে অপর সকল বস্তুর বোধই বিগলিত হয়ে যায়।
৯. নৈসর্গিক প্রতিভা, নির্মল শাস্ত্রাদিজ্ঞান, নিরন্তর অভ্যাস—কাব্যসম্পদের এগুলিই কারণ।
১০. শক্তি, লোক শাস্ত্র ও কাব্যাদির জ্ঞানজনিত নিপুণতা, কাব্যবিধায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির শিক্ষানুসারে অভ্যাস—কাব্যসৃষ্টির এগুলিই হেতু।
১১. একমাত্র শক্তিই কাব্যের হেতু—ইহাই যাযাবরীয় মত।
১২. কবিদের প্রতিভাই কাব্যকৃতির কারণ। ব্যুৎপত্তি ও অভ্যাস কাব্যের সংস্কারকারক, হেতু নয়।
১৩. কবিগত প্রতিভাই একমাত্র কারণ।
১৪. সহভাবযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।
১৫. শব্দার্থযুগলই কাব্য।
১৬. দোষবর্জিত গুণযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য—কদাচিৎ অলংকারের অভাব ঘটলেও তা কাব্য।
১৭. দোষবর্জিত, গুণমণ্ডিত, প্রায়শ অলংকারযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।

১৮. দোষবর্জিত গুণমণ্ডিত অলংকারযুক্ত শব্দার্থযুগলই কাব্য।
১৯. তাঁরা (কাব্যশাস্ত্রজ্ঞগণ) কাব্যের শরীর ও অলংকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ইষ্টার্থ-ব্যবচ্ছিন্না পদাবলিই কাব্যের শরীর।
২০. রমনীয় অর্থের প্রতিপাদক শব্দই কাব্য।
২১. সহৃদয়গণের আহ্লাদজনক-শব্দার্থময়ত্বই কাব্যের লক্ষণ।
২২. বাক্ ও অর্থের সম্যক জ্ঞানের নিমিত্ত (আমি) বাক্ ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত পার্বতীপরমেশ্বরকে বন্দনা করছি।
২৩. বিভব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে।
২৪. অলংকার থেকেই কাব্যের গ্রাহ্যতা।
২৫. বনিতার মুখ কান্ত হলেও ভূষণশূন্য হলে শোভা পায় না।
২৬. অন্য মহাত্মারা সহস্রপ্রকারের অলংকার সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।
২৭. রীতিই কাব্যের আত্মা। বিশিষ্ট পদরচনাই রীতি।
২৮. ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। □

কৃত্তিবাস : কিছু তর্ক, কিছু কথা

পার্থ মুখোপাধ্যায়

১.

মানতে বাধা নেই, বাংলা সাময়িক পত্রিকা তার নামগত গাম্ভীর্য ছেড়ে, ওই খোলস ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিল 'কল্লোলে'ও ততোটা নয়, যতোটা 'কৃত্তিবাসে'। এই অর্থে 'কৃত্তিবাস', পণ্ডিতরা বা সাহিত্যের দিগগজ ইতিহাসকাররা যা বলেন বলতে পারেন-ই, একটা আন্দোলন-ও বটে যদি 'আন্দোলন' শব্দটির অর্থ ধরা হয় একটা ওলোট-পালোট। এমন বোধহয় নেই একজনও যিনি বুকে হাত দিয়ে বলবেন 'কৃত্তিবাস' যাঁরা বার করতেন বাংলা আজকের লেখালেখি তাঁদের কাছে ঋণী নয়। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পরের সময়ে, যখন জীবনানন্দ তাঁর সব থেকে প্রাখর্যময় লেখাগুলি লিখে উঠেছেন তখন, ওইসব আলোকদ্যুতিগুলি থেকে যে সময়ের তথা মূল্যবোধ ও রুচির বদলগুলি বেরিয়ে আসছিল তার জন্যে জরুরি ছিল একটা লঞ্চিং প্যাড, এবং বলতে আপত্তি নেই, 'কৃত্তিবাস' ওটুকু ওই ভাষাকে দিতে পেরেছিল। ফলে, এ-ই অর্থে 'কৃত্তিবাস' একটা আন্দোলন তো বটেই, যা আমাদের 'কল্লোল' এবং স্বাধীনতাপূর্ব চারের দশকীয় রাজনৈতিক আপ্লুতি এই উভয়ের প্রতি কোনো না কোনোভাবে ঢলে থাকা পরিস্থিতিকে মূল্যবোধগত ধাক্কায় সটান জানিয়ে দিতে পেরেছিল সময় বদলে গেছে এবং এখন যেটা চাই তা হল এই বদলে যাওয়াকে প্রকৃত অর্থে ধরার মতো ক্ষমতাবান লেখক। 'কৃত্তিবাস' এই এটাই আমাদের দিতে পারল, এই যাকে বলে বদলে যাওয়াকে ধরা—এটাই। আন্দোলন এই অর্থেই এবং এই অর্থে নয় যে, কৃত্তিবাস কোনো বাঁধাধরা সূত্র প্রণয়ন করে সূচনা করল নতুন লেখালেখির—যেভাবে কখনো কখনো ও দেশে দেখা গেছে সূচনা হয়েছে 'মুভমেন্ট'-এর।

□

তাহলে বলা গেল, 'কৃত্তিবাস'কে আমি আন্দোলন বলতে রাজি কেবল এই কারণে যে, এই পত্রিকাকে ঘিরে যে লেখক-কয়েকজন জড়ো হলেন তাঁরা আমাদের রুচি, মননগত অভ্যাস, ভাবনাপদ্ধতিকে নাড়া দিতে পারলেন যা অসম্ভব মূল্যবোধের বদল না হলে। এবং কারণ হিসেবে এটা খুব উড়িয়ে দেবার মতো নয়, বলা বাহুল্য। এই লেখায় আমরা মূলত চেষ্টা করব এই যাকে বললাম 'নাড়া' দেওয়া তার চরিত্রটাকে বুঝে উঠতে এবং তার মারফতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে কৃত্তিবাস যদি কোনো আন্দোলন হয় তাহলে কী ছিল তার চরিত্র, সংক্ষেপে।

২.

মূল আলোচনায় ঢোকার আগে আরেকটা ব্যাপার আছে সলতে পাকানোর। 'কল্লোল'

এবং চল্লিশের রাজনৈতিক যে আপ্লুতির কথা বলেছি একটু সূত্রায়িত করা দরকার তার চারিত্রও, নাহলে 'কৃত্তিবাসের ধাক্কাটাকে বোঝা যাবে না পুরোপুরি। ওই আলোচনাও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারা যাক। আমাদের ভাষায় আলোচক-মহলে একটা বদ ধারণা প্রচলিত যে, 'কল্লোলে'র মূল ভাবনা-ভিত্তটা ছিল, পরোক্ষ হলেও, রুশ বিপ্লব। যাঁরা ওই আমলের লেখাপত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাঁরা জানবেন নিশ্চয় যে, ঘটনা এরকম ছিল না। বরং ঘটনা যেটা তা হল, 'কল্লোল' রবীন্দ্রনাথ থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্যেই অনেকটা খুঁটি হিসেবে আঁকড়ে ধরে রুশ বিপ্লবকে এবং যেহেতু ওই ধরনের আঁকড়ে ধরার কোনো ভাবনা-ভিত এ দেশের সমাজ-কাঠামোতে ছিল না ফলে এতে যে লেখাপত্রের জন্ম হয় তা প্রথম পর্যায়ে কিছু মধ্যবিত্ত দেখানোপনা, যার নমুনা বিষ্ণু দে, যুবনাশ্বে বা প্রেমেন-অচিন্ত্যের লেখায় পাব আমরা, তাতেই ভরেছিল। এর বিপরীতে যে লেখালিখি হয়নি তা নয়, বাংলা ভাষা-সাহিত্যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের যাবতীয় গণ্ডীবদ্ধতা নিয়েও, এর নমুনা এবং সর্বোপরি পরে এসে জীবনানন্দ-স্বয়ং—কিন্তু মনে রাখতেই হয় যে এঁরা কেউই তেমন কল্লোলীয় ধাঁচের নন বা হতে পারেননি। যেহেতু ইতিমধ্যেই যুদ্ধ, যুদ্ধ-পরবর্তী, আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশীয় পরিস্থিতি এবং পরবর্তী ২ নম্বর যুদ্ধ সামাজিক দিক দিয়ে তার কাজ করেই চলেছিল ফলে চল্লিশে ওই যাকে বলছি রাজনৈতিক আপ্লুতি, ওই ব্যাপারটা আসে এবং বলা বাহুল্য প্রায় যেন নতুন একটা দেখার চোখ, এক ধরনের নয়া মূল্যবোধ গড়ে উঠতে যাচ্ছে বা উঠল গড়ে এমন আঁচ পাওয়া যেতে থাকে। 'কৃত্তিবাস' এই দুটোকেই ডবল ধাক্কায় ধূলিসাৎ করল এমন না বলে বরং বলা উচিত 'কৃত্তিবাসে' কল্লোলের মধ্যবিত্ত ভাবনাভূমিই চল্লিশের রাজনৈতিক বোধকে নিজের মধ্যে গ্রাস করে উঠে এল নতুন চেহারায়। এবং এই অর্থেই 'কৃত্তিবাস' আন্দোলন হয়ে উঠল যে, এখানে জমায়েত লেখককুল যে ভাবনাভূমি আমাদের উপহার দিলেন তা মূল্যবোধের দিক থেকে সম্পূর্ণ নতুন অ্যাটিচুডের, আঙ্গিকের দিক থেকেও যা, বলা বাহুল্য, নিন্দিত অর্থে—পুরনো নয়। জীবনানন্দ যাকে বলবেন, 'নতুন সময়ের জন্যে নতুন, ও নতুন ভাবে নির্ণীত পুরনো মূল্য, নতুন চেতনা ও নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরনো চেতনা'-র সারাৎসার, 'কৃত্তিবাসে' তা জড়ো হয়েছিল—'কবিতা'য় যা হতে পারেনি, পরে 'কলকাতা' বা সমসময়ের 'শতভিষা' ইত্যাদিতেও পারেনি তেমনভাবে খুব ঝলসে উঠতে। এর অর্থ এই নয় অবশ্যই যে, আমি বলতে চাইছি উল্লিখিত অন্যান্য পত্রিকাগুলির স্থান ওই ভাষায় নগণ্য। এমন নয় ঠিক কথা, কিন্তু যে নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরনো মূল্য, নতুন ও নবাবিষ্কৃত পুরনো চেতনা 'কৃত্তিবাসে'র পাতায় ঝলসে উঠল তা তীব্রতার দিক থেকে তথাকথিত 'শুদ্ধতা'পন্থী 'শতভিষা' বা কিঞ্চিদধিক তিরিশেরই ভাবনায় লালিত 'কবিতা', যা তখন কবিতা-লিখিয়েদের কাছে শোনা যায় ছিল স্বীকৃতির সোপান-স্বরূপ, এসবে ছিল না। বলতে গেলে 'কৃত্তিবাস' যে একটা আন্দোলন তার কারণও এ-ই, আর কিছু নয়।[১] অর্থাৎ এখানে নতুনভাবে আবার

একটা সুযোগ ছিল, বা বলা ভাল, সুযোগটাই একমাত্র ছিল, প্রশ্নগুলো তোলার ব্যাপারটা ছিল যা নেহাত কম কথা নয়—আমাদের মতো কোনো একটা দেশের ভাষা-সাহিত্যের পক্ষে।

৩.

'কৃত্তিবাস' পত্রিকার জীবৎকাল যা-ই হোক বর্তমান আলোচনায় আমরা ধরব মূলত এ কাগজের প্রথম পর্যায়টিকেই কেবল, পরের ধাপগুলিকে নয় যখন পত্রিকাটি হয়ে আসছে আর পাঁচটি ছোট পত্রিকার মতোই, সাধারণ। এবং 'কৃত্তিবাসে'র এ পর্যায়টির সময়কালও নেহাত কম নয়, ১৯৫৩ থেকে '৬৮ পর্যন্ত পঁচিশটি সংখ্যা মোট।[২]

'কৃত্তিবাস' প্রথম সংকলনে বলা হয়েছিল দেখা যাচ্ছে, 'কৃত্তিবাস বাংলাদেশের তরুণতম কবিদের মুখপত্র।' ও'রা সরাসরি জানিয়েছিলেন 'একেবারে তরুণদের সার্থক না হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথের একটা নিরিখ যাতে পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের কবিতা এখানে একত্র করা হবে। এবং আসল কথা হল তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দল গড়ে ওঠা।' ও'দের মনে হয়েছিল 'বিভিন্ন তরুণদের বিক্ষিপ্ত কাব্য প্রচেষ্টাকে সংহত করলে—বাংলা কবিতায় প্রাণছন্দের উত্তাপ নতুন আবেগে এবং বলিষ্ঠতায় লাগতে পারে এবং সকলের মধ্যে প্রত্যেকের কণ্ঠস্বরকে আলাদা করে চেনা যেতে পারে।' যে কটি কথা উদ্ধৃত হল তা থেকে, একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, কয়েকটি জরুরি পয়েন্ট বেরিয়ে আসছে যা বাদে 'কৃত্তিবাস' ব্যাপারটাকেই সঠিক ভূমিতে ধরা সম্ভব না ; ১. তরুণতম[৩], ২. সার্থক না হলেও ভালো নতুন কবিতার গতিপথ ও তার নিরিখ এবং ৩. বিক্ষিপ্ত কাব্যপ্রচেষ্টাকে সংহত করা—এবং এটা করা তরুণদের একটি গোষ্ঠী বা দলে। একবারও দাবি করা হয়নি তাহলে যে, যা লিখছেন তরুণরা তা সার্থক বরং বলা হল, সার্থক না হলেও তা ভালো নতুন।[৪] অর্থাৎ মূল পয়েন্ট ছিল দেখা যাচ্ছে 'ভালো নতুন'। এই কথাটাকে ব্যাখ্যা করার, ভালো বা নতুনের জন্য নতুন কোনো সংজ্ঞা খোঁজার চেষ্টাও করা হয়নি। এবং আমার মতে কৃত্তিবাসের বিষয়ে যেসব গালগল্প প্রচলিত আছে তার পাতাকুটো সরিয়ে যদি এখন জিনিসটাকে ঝকঝকে করে বাইরে আনতে হয়ই তাহলে বলতেই হবে 'কৃত্তিবাস' সার্থক লেখার দিকে না গিয়ে ওই ভালো নতুনের দিকেই চলে গিয়েছিল যেটা তার, একইসঙ্গে শক্তি এবং হয়ত দুর্বলতারও উৎস। এবং কী যে ছিল ওই 'ভালো নতুন'-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তা যদি টের পেতে হয় তাহলে, আমার ধারণা, আমাদের মনে রাখতে হবে 'কৃত্তিবাসে'রই ১৫ নং সংখ্যায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের রচনাটি, যেখানে অস্বস্তিতেই যেন উনি বলছিলেন 'নতুন সাহিত্যভাষা'র কথা'।[৫] সন্দীপনকে ওখানে দেখেছি মেনে নিচ্ছেন জীবনানন্দের অপ্রত্যাশিত ভাষার কথা, যা বাদে সত্যিই বাংলা কবিতার গত্যন্তর ছিল না কোনোরকম ; এবং এতদিনে বোধহয় টের পাওয়া গেছে এ-ও যে, এ কেবল কবিতাতেই না গদ্যেও এনেছিলেন উনি : প্রমাণ, সুতীর্থ থেকে কারুবাসনা-সহ বাকি সব রচনাগুচ্ছ। কিন্তু, কথা এ' না ; প্রশ্ন হল—ওই 'ভালো নতুনের চেহারা ! আমার মতে, কৃত্তিবাসের পাতা থেকে, ওই সময়কার, কিছু রচনা এলোমেলো তুলে

নিলেই চেহারাটা বোধহয় আঁচ করা চলে—১. সুবর্ণরেখার জন্ম[৬] ২. দিনগুলি রাতগুলি[৭] ৩. দীপক মজুমদার, কিয়দংশে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন[৮] উৎপল বসু আর শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় ৪. সর্বোপরি বিনয়—বিনয় মজুমদারের লেখাপত্র।[৯] উদ্ধৃতিভারে জর্জরিত করতে চাইছি না এ রচনা, যাঁদের নাম বলা হল 'কৃত্তিবাস' থেকে তাঁদের বেরুনো ওই সময়কার লেখালেখি একটু ঘেঁটে নিলেই কী বলতে চাই মালুম হবে। বলতে বাধা নেই, এঁদের লেখার আঙ্গিক, অনেক সময় ভাষা ব্যবহারও এমনকি, পেছনদিককার কারো কারো কথা মনে পড়িয়ে দেয়; কিন্তু এখানেও কথা হল, যেমন জীবনানন্দও মানতেন যে, 'পুরোনো পদ্ধতিতে কবিতা লিখলেই সেটা নিরর্থক হয় না'—দেখতে হবে তার যে মূল কবিতাবস্তু তার চরিত্রকে। সময় বা কাল যা পারে তা হল ওই 'মূল কবিতাবস্তু'র চেহারাটাকেই ওলোটপালোট করে দিয়ে সূচনা করতে আরেক কোণের, যেখান থেকে পুরনো পদ্ধতিতে লেখা কবিতারই চেহারা যায় বদলে। এবং বলতে কী, নতুন সাহিত্যভাষারও জন্ম হয় এই ভূমি থেকেই, মূলত। কৃত্তিবাস, যাঁদের এবং যে কটি লেখার নাম করা গেল এখানে তার ভেতর দিয়ে, এই ব্যাপারটারই সূচনা করল এককথায়। ১৯৫৩ নাগাদ ওঁর লেখায়[১০] জীবনানন্দকে আমরা বলতে শুনেছিলাম এমন যে, 'দশ-বারো বা পনেরো বছর পরে ওই-কালের বাংলা কবিতার আরো সংগত পরিচয় পাওয়া যাবে আশা করা যায়'। উনি এমনকি এও বুঝেছিলেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের পরে আধুনিক কালে কবিতার যে যুগ চলছে তা স্তিমিত হয়ে পড়েছে', যদিও এবিষয়ে কোনো স্পষ্ট মীমাংসার কথা বলেননি তিনি, তবু। এবং কী অদ্ভুত, ওই ১৯৫৩ (১৩৬০)-তেই প্রথম বেরুচ্ছে 'কৃত্তিবাস', যখন তিনি লিখছেন 'বাংলা কবিতা পরে—হয়তো অদূরেই—যা হবে তার আলো এত দিনে কিছু কিছু এসে পড়বার কথা আধুনিক কবিতাকে সপ্রতিভ ও সজাগ করে তোলবার জন্যে; এসেছে বলে মনে হচ্ছে না।' এই আলো যে ঠিক কেমন, কী রকম চরিত্র তার, যেটা আমরা টের পেতে পারলাম যখন আমাদের মুখোমুখি হতে হল 'বাস্তবিক, ভাষা-দ্বারা যা-কিছু হবার হয়ে গেছে, তুমুল সাহিত্য হয়ে গেছে, ভাষা দিয়ে আর কিছু হবার নেই—এই বোধ থেকেই আধুনিক সাহিত্যের পুনর্জন্ম হবার কথা মানে আমি বলছি যদি তা আদৌ হয়'[১১] এই ধারণাকে চূড়ান্তভাবে নিজের মনে টের পেতে পেতে লিখে ওঠা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়-বিনয় মজুমদারদের লেখালেখির, যা একটাই কথা বারবার হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিল যে, "আমরা এমন একটা ভাষা চাই, এমন একটা ভাষা আছে, আমরা টের পাই যা আমাদের মধ্যে আমাদের ঐরূপ শরীরময় জীবনের জন্যে চিন্তা করে। সম্ভবত এটাকে ভাষা বলা যাবে না, বোধকরি 'এটা অভাষা'"[১২] অনেকের আপত্তির সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য, এই 'অভাষা'র দিকে অনতিক্রম্য ঢলে পড়া থেকেই পরে এসে হার্ংরি জেনারেশনের জন্মও হয়েছে এ সাহিত্যে, যারা আর যাই হোক সৎভাবে এটুকু বলতে ও বলাতে পেরেছিল যে, 'জীবন' জিনিসটাকে

প্রকাশ করার ভাষা পাওয়া যাচ্ছে না; যেসব ভাষা বা শব্দ চালু আছে, তারা জানিয়েছিল, সেগুলো দিয়ে কাজ চলবে না।

৪.

আলোচনার এই শেষতম পর্বে এসে আবার ফিরে যাই শব্দটির কাছে, যে, 'আন্দোলন'। যতোই এলোমেলো হোক তবু এ লেখায় দেখানোর চেষ্টা করা গেল সেই লঞ্চিং প্যাডটিকে, যেখান থেকে জীবনানন্দোত্তর বাংলা লেখালেখির সূচনা। 'আন্দোলন' শব্দটি পছন্দ হচ্ছে না আমার, পছন্দ হচ্ছে না কারণ এর গায়ে শ্যাওলা, বহু-ব্যবহার, জীর্ণতা। অভাষা দিয়ে জীবনকে ছোঁবার চেষ্টা, ব্যর্থ হোক না তা, তাকে কি ওরকম কোনো মোড়কে বন্দী করতে পারা যায়: প্রশ্ন! তবু, আন্দোলনের অর্থ যদি হয় ওই 'ভালো নতুন'—যা 'সার্থকে'র চেয়ে অনেক দূরেরও কখনো কখনো, এবং 'অপ্রত্যাশিত' কিছুর উঠে আসা, যা পরিচ্ছন্ন কোনো বিশ্বাসভূমি ব্যতিরেকেও তৈরি করে তুলতে পারে গোটা একটা ভবিষ্যতকাল, তাহলে বললে ভুল হবার নয় কোনো যে, 'কৃত্তিবাস' একটা আন্দোলনই—যেখান থেকে আমরা রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা সাহিত্য হতে স্পষ্ট করে পা বাড়াতে পেরেছি জীবনানন্দোত্তরের পথে, খানিকটা হলেও। □

টীকা

১. এই অংশে আমার যে বক্তব্য তা উত্তর-আধুনিক বলে পরিচিতদের ব্যাখ্যার সঙ্গে এক করে দেখা ভুল, কেননা 'কল্লোল'-পক্ষীয়দের ওঁরা যে চোখে ভিলেন হিসাবে দেখেন তা মানা কঠিন, যেমন কঠিন বৈষ্ণব পদাবলী-বিষয়ে ওঁদের ব্রাহ্মণ পুরোহিত-সুলভ ছুৎমার্গীতাকেও মেনে নেয়া। এখানে কেবল 'কল্লোলের' ধারার প্রবণতাকেই চিহ্নিত করার চেষ্টা হল, যা ভুল হতেই পারে সন্দেহ নেই।

২. একটা সাফাই-ও এখানে গেয়ে রাখার যে, এ'লেখায় আমরা 'কৃত্তিবাসের' জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে নানাজনের কাছ থেকে নানা সময়ে শোনা ওই গল্পটি নিয়ে একেবারে মাথা ঘামাব না। ডি. কে. র সহায়তায় এ কাগজটি কীভাবে যে বেরিয়েছিল ১৩৬০-এর শ্রাবণে তা ধরে নিচ্ছি, সবাই না হলেও, অনেকেই জানেন। যাঁরা জানেন না তাঁরা প্যাপিরাস থেকে বেরুনো 'কৃত্তিবাস' সংকলন দুটির প্রথম পর্বে- (পৃ. ৫-১৩)-র পাতা উল্টে গল্পটি জেনে নিতে পারেন।

৩. শঙ্খ ঘোষও জানিয়েছেন, 'তরুণচিনির্বিশেষে সব তরুণেরই কবিতা ছাপা হতো ওখানে' (কৃত্তিবাসে) ওঁর একটি রচনায়, যার ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন সুকান্ত চৌধুরী ও. ইউ. পি. থেকে বেরুনো 'ক্যালকাটা, দ্য লিভিং সিটি'র পাতায়।

৪. পাঠক, জীবনানন্দের যে মন্তব্য খানিক আগে উদ্ধৃত করেছি মাথায় রাখুন। উনি যে 'নতুন সময়ের জন্যে নতুন' ব্যাপারটার কথা বলেছেন সেখানেও 'সার্থক'-তার প্রশ্নটা, দেখা যাবে, উহ্য আছে।

৫. সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' রচনাটির কথা বলছি আমি।

৬. যেখানে তিনি লিখছেন দুর্লভ সুখে গলে গলে শূন্যে পৌঁছোনোর কথা, যে শূন্য, যে প্রেমের ধারণা উন্মাদ-তিরিশে কারো কারো থাকলেও তা মূর্ত হয়নি। বরং ছন্দ-তারল্যে ভেসে গেছিল—প্রমাণ, বুদ্ধদেব বসুর লেখাপত্র বা অচিন্ত্যের। এবং ছন্দের নিরীক্ষাতে সে লেখা উতরোলেও যেতে পারেনি সেই দার্শনিক গভীরতায়, যা নিছক রোমান্টিকতার চাইতে বেশি কিছু। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সুবর্ণরেখার জন্ম', আমার মতে, প্রথম ধাক্কাটাই রেখেছিল সেইখানে যাকে আমরা বলব অ্যাটিচুড, যা বদলে দিতে পারে সাহিত্যভাষার গতিমুখ।

৭. দেখা যাচ্ছে পত্রিকার তিন নম্বর-সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর কবিতাবই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অমিয়বাবুর লেখায় শব্দের কিছু ব্যবহারের দিকে নজর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পাঠকের ; আমার মতে, শঙ্খ ঘোষের 'দিনগুলি রাতগুলি'র কিছু শব্দ ব্যবহারও এই অপ্রত্যাশিত এবং অচেনা-রকম নতুন অথচ যা, ওই 'অচেনা মনে হয় না, অসরল মনে হয় না।'

৮. অলোকরঞ্জন, যিনি তখন লিখেছিলেন, 'দু'দিকে বয়স চলে অসম্পন্ন খেজুরের সার। দু'দিকে বয়স চলে : আমাদের পথ মাঝখানে,' ইত্যাদির মতো ওইসব লেখাপত্র যার নতুনতা, ভালো নতুনতা বটে, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা নিরর্থক।

৯. বিনয় মজুমদারকে নিয়ে কৃত্তিবাসেই বলা হয়েছিল, 'ওঁর কৃপায় আমরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনে সমর্থ হয়েছি, বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব তিরিশের কবিদের পর বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রধানতম ঘটনা।' জ্যোতির্ময়ের এই পংক্তিমালা পাঠ করতে করতে যদি কারো বুদ্ধদেব বসুর 'শার্ল বোদলেয়ার' ও আধুনিক কবিতা'র প্রথমাংশ স্মরণে আসে তা অবিশ্যি বাড়াবাড়ি তবু এতো ঠিক যে বিনয়ের মধ্যেই প্রথম আমরা পেলাম সেই মহাকবিতার ছোঁয়া যার উল্লেখ একদা জীবনানন্দে পেয়েছিলাম আমরা। অবশ্য এক্ষেত্রে 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি…'র শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেও স্মরণে রাখা দরকার, বলতেই হবে।

১০. অসমাপ্ত আলোচনা : 'কবিতার কথা'/পৃ. ১৩৫

১১-১২. 'সুহাসিনীর পমেটম'-বিষয়ে সম্ভবত সর্বপ্রথম লেখায় এমন সব কথা আছে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের। তখন অন্তত উনি এরকমই ভাবতেন।

শাস্ত্রবিরোধিতা, ছয়ের দশক

অশোক চট্টোপাধ্যায়

শাস্ত্রবিরোধিতা—ছয়ের দশকের এই আন্দোলন মূলত ফর্ম ভাঙার। সেই সূত্রেই নতুন কিছু করতে চেয়েছেন শাস্ত্রবিরোধীরা। কিন্তু নিজেদের শিল্পতত্ত্ব বা শিল্পাদর্শ সম্পর্কে কোনো সুসংহত বক্তব্য হাজির করতে পারেননি। এই আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন আন্দোলনেরই শরিক, অশোক চট্টোপাধ্যায়। —সম্পাদক।

সম্পাদক চেয়েছেন ছয়ের দশকের গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ লেখা। আমি ছয়ের দশকেরই একজন কবি এবং ওই দশকের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গেই কমবেশি সম্পৃক্ত ছিলাম—এসব ভেবেই হয়তো এই ফরমায়েশ। কিন্তু ব্যাপারটা এতটাই সহজে মিলিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। প্রথম যৌবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে প্রায় তিরিশ বছর আগের আবেগ-উত্তেজনাময় ঘটনাপুঞ্জ একটা লেখায় উপস্থাপন করা বেশ কঠিন। বিশেষত ব্যাপারটা ঐতিহাসিক। সে সময় প্রায় প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন আন্দোলন নিয়ে রাশিরাশি বুলেটিন, পত্রপত্রিকা, হ্যান্ডবিল, পোস্টার প্রভৃতি প্রচারিত হত। সব মনে বা সংগ্রহে রাখা সম্ভব নয়। তবু আমার সংগ্রহ খুব খারাপও নয়। অবশ্য আমি সম্ভব মতো সবই রাখি এবং ঠিক সময়ে খুঁজে পাই না। এই সব অক্ষমতা ও অসম্পূর্ণতা নিয়েই এই লেখা শুরু করলাম।

এসব লেখার প্রধান সমস্যা হচ্ছে সন-তারিখ আর মান নির্ধারণ—মানে ভাল-মন্দের বিচার। প্রথমত সন তারিখ আজ আর ততটা জরুরি নয়। কেন না এগুলি ইতিমধ্যে আলোচিত ও বহুজ্ঞাত। বিশেষত আমাদের সময়ের দুজন বিশিষ্ট লেখক শ্রীঅতীন্দ্রিয় পাঠক ও উত্তম দাশ স্থান কাল নথিপত্র সহ এই সব আন্দোলনের বিশদ আলোচনা করেছেন যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে। এগুলি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য আমি এ দুটি বই থেকেই সংগ্রহ করে এখানে ব্যবহার করলাম। কিন্তু শুদ্ধমাত্র কালানুক্রম রক্ষা ছাড়া এ লেখায় ওই সব প্রসঙ্গ অপ্রয়োজনীয়। সন-তারিখের নির্ঘণ্ট ও বিভিন্ন আন্দোলনের ইস্তাহার ঘোষণা প্রভৃতি খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এগুলিও বহুজ্ঞাত এবং আন্দোলনকারীদের নানা ঘোষণা ও দাবি ও নানা বিরোধিতায় জটিল, বিতর্কিত। আমি এখানে প্রধানত ইদানীংকাল পর্যন্ত অনালোচিত এই সব আন্দোলনের কিছু নেপথ্য কাহিনী—বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপস্থাপনা করব। স্বভাবতই এ আলোচনায়—সুতরাং কিছু ব্যক্তিগত রুচি, কিছু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকবে, এ আশঙ্কা অমূলকও নয়। যে কোনো লেখাতেই লেখকের অহংকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে সে ঝুঁকি নিতেই হবে। আর পক্ষপাতিত্ব যেমন লেখকের প্রবণতা, নিরপেক্ষতাও তেমনি তার পরীক্ষা। আমাকেও এ পরীক্ষা দিতে হবে।

॥ এক ॥

ছয়ের দশক—অর্থাৎ ১৯৬০ থেকে ১৯৬৯ সাল। এই সময়ের পুরো ছবি তার রং রেখা আবেগ উত্তেজনা এবং সাহিত্যের পটভূমি আগে বোঝা দরকার। তিরিশ থেকে বাংলা সাহিত্যে দশক ভাগের রীতি চালু হয়েছে। বিদেশি সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ও অভিজ্ঞতায় তিরিশের তরুণ লেখক সম্প্রদায় তৎকালীন রাবীন্দ্রিক ভাবালুতা ও ঐতিহ্য-মণ্ডিত বাংলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন—শুধু আদর্শ ও ভাববাদ নয়, সমাজের নিচুতলার মানুষের বাস্তব জীবন, তাদের কামনা-বাসনা এ সব সাহিত্যে স্থান পেল। আবার চল্লিশে এই বাস্তবতার রূঢ় উচ্চনাদে ক্লান্ত, নগ্ন আদর্শবাদী এক শ্রেণীর রচনা এবং পঞ্চাশেও চল্লিশের বিপরীত উচ্চকণ্ঠ ও রূঢ় বাস্তবতার প্রতি অনুরাগ। সময়ের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী এই পরিবর্তনের মাত্রা, ভাষা ও প্রকরণ ভিন্ন হবেই। কিন্তু দশকে-দশকে এই স্পষ্ট বিরুদ্ধতা দেখা গেছে। এটা প্রত্যাশিতও বটে এক সময়ের সাহিত্যরুচি তা যতই জনপ্রিয় হোক না কেন অব্যবহিত পরের কালের লেখকদের পক্ষে তা বর্জনীয়। তখন তাকে অতিক্রম করে অন্যতর রীতি ও প্রকরণ সৃষ্টির তাগিদ দেখা দেয়।

এই নিয়মেই পঞ্চাশের উদ্দাম যৌবন ও সোচ্চার সাহিত্যরুচির বিরুদ্ধে সেই প্রথম অর্থাৎ ১৯৫৯-৬০ থেকেই ছয়ের দশকে একটা নগ্ন আত্মমগ্ন সাহিত্যরুচি আভাসিত হয়। কিন্তু এটাও সত্য এবং পরবর্তী আলোচনায় তা স্পষ্টতর হবে যে ছয়ের দশকেই একটা ভিন্ন স্রোত ছিল। তারা পাঁচের দশকের মুগ্ধতা সর্বাংশে ত্যাগ করতে পারেনি। অবশ্য এটা খুব নতুন কিছু নয় এবং পূর্ববর্তী দশকেও এরকম অনেক উদাহরণ আছে। একটা প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ধারাকে অতিক্রম করার সাহস ও শক্তি সবার থাকে না। তিনের দশকেও স্মৃতিশেখর উপাধ্যায়, নিশিকান্ত, প্রমথনাথ বিশী বা এমনকি প্রেমেন্দ্র মিত্রও মূলত রাবীন্দ্রিক ধারাতেই কবিতা লিখেছেন এবং এঁরাও সেসময় তরুণ-কবি হিসেবে যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছেন। তবে ষাটের গরিষ্ঠতম প্রথাবিরোধী লেখকদের সঙ্গে অবশ্যই এই ব্যতিক্রমীদের আলাদা করে নেয়া কঠিন নয়। এবং আজ ষাটের সাহিত্য বলতে বিদগ্ধ সাহিত্য পাঠক মাত্রেই ওই গরিষ্ঠ ষাটকেই বোঝেন।

আত্মমগ্ন কল্পনাপ্রবণ কিন্তু অত্যন্ত সতর্ক ও সচেতন। সতর্কতা ও সচেতনতা অতীত ও সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যকার সম্পর্কে। এ সচেতনতা না থাকলে কোনো তরুণ লেখক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষাই সম্ভব নয়। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকদের মতোই ষাটের শীর্ষস্থানীয় লেখকরা বুঝেছিলেন অতীতের অনুবর্তনে কোনো সার্থক সৃষ্টি সম্ভব নয়। অতীতকে অনুসরণ ও অনুধাবন করে মহত্তর সৃষ্টিই নতুন লেখকের অভীষ্ট। এইসব কথাই ষাটের আন্দোলনকারীরা পরবর্তীকালে তাঁদের ইস্তাহারে ঘোষণা করেছিলেন। এবং এইসব আদর্শেই—ষাটের তরুণ লেখক সম্প্রদায় নানা সময়ে নানা গোষ্ঠীতে দলে-উপদলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়েও নিজেদের সাহিত্য আদর্শ ও নীতি নির্ণয় করলেন।

একথা ঠিক ওইসব বিভিন্ন দলের নীতি ও আদর্শের বা ওইসব গোষ্ঠীর শ্রেণীভুক্ত লেখকদের সাহিত্যরুচি ও সৃজনক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। অবশ্য এটা স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিতই। কোনো সাধারণ নিয়মে বা আদর্শে কঠোরভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোনো গণআন্দোলন অন্তত সাহিত্যে সম্ভব নয়। এখানে ছোট-ছোট দলে বিচ্ছিন্নভাবে নানা জাতীয় কিছু প্রতিবাদ ঘোষিত হয়। এইসবের সমন্বয়ে একটা সময়ে এক বা একাধিক আন্দোলন দানা বাঁধে। তিনের দশকে কল্লোল, কালিকলম, সবুজপত্র সবই এক-একটা বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ধারা। কেউ সনাতন, কেউ মধ্যপন্থী কেউ আধুনিক—সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত চেতনা। ষাটেও প্রায় একই রকম ঘটেছে। যেটা বেশি বা আলাদা রকম, সেটা হচ্ছে—প্রকাশ্য বিদ্রোহ। এইসব গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর সদস্য লেখকরা একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা, অপসমালোচনা ইত্যাদির দ্বারা বিরোধ ও বিতর্কে এতটাই নিন্দনীয়ভাবে মেতে উঠেছিলেন যে তাঁদের সৃষ্টি ক্ষমতার অনেকটাই তার ফলে অপব্যয়িত হয়েছে একথা বলা যায়।

ফলত তিরিশে কল্লোল ইত্যাদি এবং পঞ্চাশে কৃত্তিবাস, শতভিষা প্রভৃতির মতো যৌথ উদ্যোগে কোনো বৃহৎ আন্দোলনের পরিবর্তে ছয়ের দশকে একাধিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন আন্দোলন সূচিত হয়েছে। আলাদা-আলাদাভাবে বিচার করলে এইসব আন্দোলনের কোনোটিই সম্পূর্ণ নিষ্ফল বা বন্ধ্যা এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু ওই ধারাবাহিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক বিরোধিতায় দীর্ণ ছয়ের দশক বহু সৎ পাঠক ও সমালোচকের দ্বারাও বন্ধ্যা দশক রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কারণ সম্মিলিত শক্তিতে সংহতভাবে প্রকাশিত কোনো আন্দোলনের তর্কাতীত সাফল্য ও তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া এক্ষেত্রে কোনো আন্দোলনের পক্ষেই সেভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিছুটা ঈর্ষায় অনেকটাই নিজেদের দোষে। এই হচ্ছে ষাটের সাহিত্য-আন্দোলন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা।

॥ দুই ॥

ষাটের একেবারে শুরুতে প্রধান পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল— বিদিশা, কবিপত্র, ছোটগল্প, ফসল, সম্প্রতি ইত্যাদি। এগুলি সবই ষাটের তরুণ লেখক কবিদের নিজস্ব কাগজ। এর মধ্যে 'বিদিশা' ও 'ছোটগল্প'—ছোটগল্পের কাগজ, 'কবিপত্র' শুধুই কবিতার। আর হাওড়া থেকে প্রকাশিত ফসল ও সম্প্রতি গল্প কবিতা প্রবন্ধ সবকিছু নিয়েই প্রকাশিত। তাছাড়া, তিরিশের বিখ্যাত 'কবিতা' চল্লিশের অরুণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত উত্তরসূরী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'পূর্বাশা' বা পঞ্চাশের কৃত্তিবাস ও শতভিষা নিয়মিত / অনিয়মিতভাবে বেরুচ্ছে। এর সঙ্গে চিরকালীন 'পরিচয়' তো ছিলই, আর ছিল দুটি বাণিজ্যিক কাগজ— আনন্দবাজার গোষ্ঠীর দেশ ও যুগান্তর গোষ্ঠীর অমৃত। এ ছাড়াও কলকাতা ও দূর-নিকট মফস্বল থেকে অগণ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হত। তাদের কিছু—স্মারক, ঋতুপত্র, আগন্তুক, বহ্নিশিখা, দেয়াল, দৃশ্যপট,

মহেঞ্জোদারো, আবলী, পুনশ্চ, গন্ধর্ব, দিগন্ত, ছাড়পত্র, প্রচ্ছদপট এইরকম আরো অনেক পত্রিকা। এগুলি সবই ষাটের কবি লেখকদের কাগজ।

তখন প্রায় প্রতি সপ্তাহেই এইসব পত্র-পত্রিকার কোনো সংখ্যা বা ওইসবের লেখকদের কোনো না কোনো বই প্রকাশিত হত। এবং ওইসব প্রকাশনা উপলক্ষে কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে যা হত তাকে অনুষ্ঠান—প্রায় এক-একটা উৎসব বলা যায়।

এই 'অনুষ্ঠান' প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে আসছে। কফি হাউসের দোতলায় ঢুকে পার্টিশান ঘেরা বাঁদিকের টেবিলে বসতেন পঞ্চাশের অর্থাৎ কৃত্তিবাসের লেখকরা—শক্তি, সুনীল, শরৎ, বিনয়, সমরেন্দ্র, সন্দীপন প্রমুখ। আমরা, ষাটেরা বসতাম হাউসের প্রায় মাঝামাঝি ঈষৎ বাঁদিক ঘেঁসে। সেদিন পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'শবযাত্রা' প্রকাশিত হয়েছে। আমরা প্রায় কুড়ি পঁচিশজন চারপাঁচটা টেবিল একসঙ্গে করে গোল হয়ে বসেছি। রমানাথ রায় শবযাত্রা বইটা পড়ে শোনাচ্ছে। সেই সময়ের অভ্যাস মতো কেউ-কেউ তিরিশ পয়সার কফি তিনজনে ভাগ করে খাচ্ছি। সঙ্গে পকোড়াও থাকতে পারে। কিছুই আবশ্যিক নয়। কফি হাউস আড্ডার জায়গা। আড্ডাধারীদের আকর্ষণেই বাইরের লোকেরা আসে। তারাই খায় দায়। আমরা তখন কিছু অর্ডার না করেই কয়েকটি চেয়ার জুড়ে বসে থাকতাম। পরিচিত বা অর্ধপরিচিত কেউ খাবারের অর্ডার দিলে তার প্লেট থেকেই অনায়াসে তুলে নিতুম। তা, সেদিন ওইভাবে আমরা বসেছি। রমা, পবিত্রর বই পড়ছে—এমন সময় সহসাই উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কবি অনন্ত দাশ, 'বাপরে!' বলে চেয়ার থেকে পড়ে গেল। অনন্ত সেসময় কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতিস্থ ছিল, স্নায়ুঘটিত কোনো দুর্বলতাও হতে পারে। কিন্তু আমরা ওই ঘটনায় সকলেই হতচকিত হয়ে পড়লাম। পঞ্চাশের আড্ডা থেকে দীপেনদা ও তরুণদা ছুটে এলেন। আমাদের এবং সর্বকালের সকলের বন্ধু সরল হৃদয় আশিস ঘোষ দীপেনদাকে বলল, 'ওর বিচিতে বরফ দিলে হয় না?' যাঁরা কমুনিস্ট লেখক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন তাঁরা বুঝবেন বিচি এবং দীপেন্দ্রনাথ এই শব্দ দুটি পাশাপাশি বসলে কী বিপর্যয় হতে পারে। দীপেনদা,—'পাগলামি করো না'—বলেই কিচেনের দিকে দৌড়োলেন এবং গেলাসে করে গরম দুধ এনে অনন্তকে খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। তরুণদা (সান্যাল) তৎক্ষণে অনন্তর নাড়ী পরীক্ষা করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনন্ত প্রায় স্বাভাবিক হয়ে উঠে বসল। এই সময় পবিত্র আর রমার মধ্যে বিনয় ও কৃতিত্বের প্রায় প্রতিযোগিতা শুরু হল। রমা বলল, 'ওঃ, কি কবিতাই তুই লিখেছিস, অনন্ত শুনেই অজ্ঞান হয়ে গেল।' আর পবিত্র বলছে, 'না, না, লেখাটা নয়, তোর পড়াটাই আসল ব্যাপার।' অনন্তও সে সময় কিছুটা প্রয়োজনীয় বন্ধুকৃত্য কিছুটা লজ্জা ঢাকার জন্যই হয়তো বলল, 'ওঃ কি লেখা লিখেছিস, শুনতে শুনতে মাথাটা ঘুরে গেল।' এইভাবে রটে গেল পবিত্রর কবিতা শুনে অনন্ত অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখন অনন্ত পবিত্র বা রমা এসব কথা স্বীকার করবে কিনা জানি না। তবে এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে শবযাত্রা গ্রন্থ প্রথম প্রকাশের

স্মৃতিচারণায় পবিত্র এইসব ঘটনা বিবৃত করে একটি কাগজে লিখেছিল। সে-লেখায় কিন্তু অনন্তর ঘটনার কোনো উল্লেখই ছিল না এবং সেখানে বলা হয়েছে দীপেনদা ও তরুণদা (অনন্তর ঘটনায় ছুটে এসেছিলেন নয়) ওই কবিতা পাঠের টেবিলেই শ্রোতা হিসেবে বসেছিলেন। এটা ভুল অথবা মিথ্যা, অথবা দুটোই। দীপেনদা নেই, তরুণদা তো আছেন। এবং আছেন আরও কিছু ওইদিনের ঘটনার সাক্ষী।

ষাটের কাগজগুলিকে ঘিরে, প্রধানত কবিপত্র, বিদিশা, সম্প্রতিকে নিয়েই একটি বড় লেখক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ফসল ও ছোটগল্প এই বৃত্তের বাইরে ছিল। ষাটের ওই লেখকরা তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাগজ ও তার বাইরে সমমনস্ক কিছু লিটল ম্যাগাজিনে, ক্বচিৎ অগ্রজদের পত্রিকায়—কৃত্তিবাস, শতভিষা বা উত্তরসূরীতে লেখালেখি করতেন। তবে বাণিজ্যিক কাগজের মধ্যে অমৃতই ষাটের তরুণতম লেখকদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করে। দেশ পত্রিকায় তখন বয়ঃপ্রাপ্ত অপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠা-ব্যাকুল পঞ্চাশের ভিড়। তৎকালীন কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য ও আদান প্রদানের সম্পর্ক ছিল। তরুণ লেখক হিসেবে তাঁরাই তখন সেখানে আদৃত। ষাটের সদ্যযুবাদের সেখানে প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার কঠিন ছিল। অমৃত পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মণীন্দ্র রায়ের উদার প্রশ্রয়ে ষাটের লেখকরা প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হতেন। দেশ পত্রিকার তুলনায় ঔজ্জ্বল্যে নিষ্প্রভ হলেও একটি বাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রচার-সুযোগ ও কিছু-প্রেরণা-দক্ষিণা পাওয়া একেবারে আনকোরা লেখক সম্প্রদায়ের কাছে কিছু উপেক্ষণীয় ছিল না। ষাটের প্রথম দিকের প্রায় সবাই—আশিস সান্যাল, গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মৃণাল দত্ত, রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, গণেশ বসু, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে তখন অমৃত পত্রিকায় প্রায় নিয়মিত লিখতেন।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটল—পঞ্চাশের একাংশের সঙ্গে ষাটের একাংশের বিরোধ। আপাত অপ্রাসঙ্গিক এই প্রসঙ্গের সঙ্গে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের গূঢ় সম্পর্ক আছে এই বিশ্বাসেই এর উল্লেখ ও আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করি। পঞ্চাশের শক্তি ও সন্দীপনের বিরুদ্ধে ষাটের পবিত্র ও রমানাথের কিছু ক্ষোভ ছিল—খুবই ব্যক্তিগত ব্যাপার। পবিত্র সেসময়ে চলনে বলনে বেশ ভূষায় খুবই 'কবি-কবি' ছিল। শক্তি একদিন পবিত্রকে ডেকে বললেন—'তোর ধুতি সাদা, পাঞ্জাবি সাদা, পায়ে একটা সাদা চটিও পরেছিস। এবার মাথায় একটু ঘোল ঢেলে এলেই চমৎকার মানাবে।' এটা শক্তির তৎকালীন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, চমক এবং ইমেজ সৃষ্টির চেষ্টা—স্পষ্টতই অসৌজন্য এবং অন্যায়। আবার সদ্য উপহার পাওয়া পঞ্চাশের অন্যতম কবি বন্ধু দিলীপকুমার সেনের কাব্যগ্রন্থ শক্তি পথিমধ্যে অবজ্ঞাভরে অন্যকে দিয়ে দিয়েছে এই সংবাদ রমানাথ দিলীপকুমারকে জানিয়ে দিয়েছে শুনে রমাকে ডেকে শক্তি বলেছিলেন—'তোর ছাল ছাড়িয়ে নোব। মনে রাখিস।' এই ধরনের অমার্জিত ও অপমানকর

ব্যবহার সে সময় অগ্রজ-অনুজ নির্বিশেষে সকলের সঙ্গেই করতেন বলে শক্তি যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছেন। তবু-এ সবের মধ্যে একধরনের পাগলামি ও চতুরতা ছাড়া অন্য-কোনো গূঢ় অভিসন্ধি ছিল না বলেই মনে হয়।

কিন্তু তরুণ লেখকদের সোচ্চার আত্মপ্রকাশ ও পূর্ববর্তী লেখকদের বিরুদ্ধতা করার চিরকালীন প্রবণতাকে ব্যবহার করে রমা ও পবিত্র তাদের ব্যক্তিগত ক্ষোভকে বেশ পরিকল্পিত ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করল। তারা নানাভাবে ষাটের তরুণ লেখকদের বোঝাতে লাগল, সামগ্রিকভাবে ষাটের লেখকরা পঞ্চাশের লেখকদের দ্বারা উপেক্ষিত ও অপমানিত। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দ্বারাই ষাটের লেখকদের স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। পূর্ববর্তী সাহিত্যকার ও সাহিত্যরীতির বিরুদ্ধে নতুনরীতি ও প্রকরণ প্রণয়ন ও প্রচারের দ্বারা সাহিত্যে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রবণতা সব যুগে সব নতুন লেখকদেরই থাকে। সুতরাং ষাটের অধিকাংশ তরুণ লেখকই এই উদ্যোগে সম্মিলিত হলেন। এভাবেই ষাটের প্রথম সাহিত্য আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। যথেষ্ট ইতিবাচক তাত্ত্বিক বিতর্ক ও আলোচনার সঙ্গেই একটা সময়ে পঞ্চাশের কিছু লেখকদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অতর্কিত অপ্রয়োজনীয় আক্রমণাত্মক মন্তব্য এক সময় আন্দোলনকারীদের অতিরিক্ত উদ্দেশ্যকে প্রকটভাবে প্রকাশ করে।

এর অর্থ এই নয়, ষাটের এই আন্দোলন ব্যক্তিগত দু-একজনের দ্বারা ঘটেছিল বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। উপযুক্ত পরিস্থিতি ও জমি প্রস্তুত ছিলই ও সেইভাবেই এর প্রকাশ ঘটেছে। কিছু সদস্য কৌশলে এই আন্দোলনের সাহায্যে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে মাত্র। এর জন্য ব্যক্তিগতভাবে কারোরই কোনো নিন্দা বা প্রশংসা প্রাপ্য নয়। আমি এসব কথা ঘটনা হিসেবেই বিবৃত করলাম। ব্যাখ্যা অবশ্য আমার নিজের। কোনো পক্ষপাত বা অসূয়া নয়। সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকা দরকার। পরবর্তী প্রজন্মের এসব কথাও জানা দরকার। আমার এসব বিশ্বাস ও মন্তব্য ভ্রান্ত কি না তা ইতিহাসই বিচার করবে। তাছাড়া এসব ঘটনা-দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত কবি লেখকরা তো আছেই, তারাও নিশ্চয়ই সততার সঙ্গে প্রতিবাদ বা সমর্থন জানাবে এই আশা আছে।

॥ তিন ॥

এই সবের পর ১৯৬২-র কোনো এক সন্ধ্যায় কেশব সেন স্ট্রীটে অমৃত পত্রিকার কর্মী, ষাটের লেখকদের অন্যতম সুহৃদ কমল চৌধুরীর বাড়ির ছাদে মুড়ি তেলেভাজা খেতে-খেতে একটা আলোচনা সভা হল। যতদূর মনে পড়ছে এ আড্ডায় উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, সুব্রত সেনগুপ্ত, দিলীপ চট্টোপাধ্যায় পবিত্র মুখোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং আরো কেউ কেউ। সভায় স্থির হল— নিজেদের নতুন সাহিত্যরীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য ষাটের কবিদের নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে তার জন্য সর্বপ্রথম দরকার নতুন পরিকল্পনায় নতুন পত্রিকা। এই

পত্রিকার রূপরেখা—কী থাকবে কী থাকবে না, কীভাবে প্রকাশিত হবে, পত্রিকার নাম, সম্পাদক, আর্থিক বন্দোবস্ত সবই ওই সভায় প্রাথমিকভাবে স্থির হয়। প্রথম সভায় উপস্থিত সকলেই প্রাথমিক সদস্যরূপে গৃহীত হয়। পরে অবশ্য অনেক যোগ বিয়োগ হয়েছিল। সদস্য চাঁদা মাসিক পাঁচ টাকা ধার্য হয়।

এই উদ্যোগের ফলশ্রুতি—১৯৬২-র শেষ দিকে একটি ডিমাই সাইজের, আটপাতার নিউজপ্রিন্টে ছাপা বুলেটিনের প্রকাশ। কভার নেই, প্রথম পাতায় ৩৬ পয়েন্টে ছাপা নাম—'এই দশক'। তার নিচে ১০ পয়েন্ট বোল্ড-এ 'তরুণ লেখক সংস্থার মুখপত্র'। দাম দশ পয়সা। সম্পাদক—রমানাথ রায়। প্রথম পরিকল্পনা অনুযায়ী ১। একটি সম্পাদকীয় ঘোষণা, যাতে নতুন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হবে। ২। পালাক্রমে সদস্যদের একটি কবিতা ও একটি গল্প। ৩। সদস্যদের বিচারে নিরপেক্ষ, উদার আন্দোলনের মতাদর্শের অনুসারী একজন অগ্রজ লেখকের সাহিত্যকৃতির উপর আলোচনা এবং ৪। একটি বিদেশি গ্রন্থের আলোচনা। প্রতি সংখ্যায় এই সব থাকবে ওই আটপাতার আয়তনে।

এই বুলেটিনে সম্পাদকীয় ঘোষণায় পর্যায়ক্রমে পুষ্কর দাশগুপ্ত, রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত জানালেন—তরুণ প্রজন্মের লেখকদের সাহিত্যরচনা ও প্রচারে সহায়তা করার জন্য তাদের নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য ও আধুনিক সাহিত্যের পাঠক তৈরি করার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। তিরিশের পরবর্তী কবিদের কুড়িয়ে পাওয়া মতবাদ ও গ্রাম্য উত্তেজনা বাদ দিয়ে ষাটের কবিরা নতুন কবিতা লিখতে চায়। ইত্যাদি।

কথা হচ্ছে, স্পষ্টত এসব ঘোষণা ও আন্দোলন মূলত পঞ্চাশের প্রধান তরুণ কবিদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু কী তাদের অপরাধ? বাণিজ্যিক লেখক হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু তখন তাঁরাও বিদ্রোহী—প্রায় একই ধরনের গরম-গরম বুলি আর প্রথাহীন লেখা ছাড়ছেন। পত্রিকা করছেন, কফি হাউসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। তখনও তাঁরা আজকের অনেক তরুণের মতোই আনন্দবাজারে একটা লেখা ছাপাবার জন্য লাইন করছেন। কর্তাব্যক্তিদের বাড়িতে ইলিশ মাছ নিয়ে ছুটছেন, কেউ ভোরবেলায় জগিং করছেন। সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ক্ষোভ ও আন্দোলন অর্থহীন ও অপ্রত্যাশিত ছিল। সেই সময়ে তাঁদের লেখালেখির মধ্যে একমাত্র প্রতিবাদযোগ্য ব্যাপার ছিল যৌন শব্দের ব্যবহার। বোধহয় শুরু হয়েছিল—'চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয় লাথি মারব পোঁদে' (শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্প্রতি, প্রথমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা)। পরে যৌনি লিঙ্গ সঙ্গম প্রভৃতি শব্দ সহযোগে ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে অজস্র গদ্য পদ্য রচনা তৎকালীন সম্প্রতি, কৃত্তিবাস, ছোটগল্প বা ঈষৎ পরে প্রকাশিত ক্ষুধার্ত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এসব নিয়ে সে সময় অনেক বিতর্ক হয়েছে। তরুণ লেখক সংস্থার মুখপত্র 'এই দশক' ও এই চীৎকৃত আবেগ ও যৌন শব্দের মাত্রাহীন প্রয়োগ নিয়ে পঞ্চাশের বিরুদ্ধতা করেছে। ঠিকই করেছে। কিন্তু এখন এতদিন পরে এই বয়েসে মনে করি এর মধ্যে

কিছু আতিশয্যও ছিল। এর দ্বারা পূর্বকথিত ষাটের লেখকদের একটা অংশের ব্যক্তিগত ক্ষোভই প্রকাশিত হয়েছে। কেননা পঞ্চাশও তখন তরুণ আর বিতর্কিত হয়ে ওঠাই তরুণদের অভীষ্ট। তরুণদের ষাটও সে সময় ওই বিতর্কিত হয়ে ওঠার উদ্দেশ্যেই অনেক কাণ্ড করেছে যার অনেকগুলিই অনেকে সঙ্গতিহীন ও দৃষ্টি আকর্ষণের স্থূল উপায় বলে মনে করেছিলেন। কবিতায় ছবির ব্যবহার, স্পেস, যতি চিহ্নের বিলোপ বা গল্পে কাহিনীহীনতা, উত্তেজক ও আকর্ষক স্লোগান সবই সস্তা চটক বলে বহুবার নিন্দিত হয়েছে।

তবে এতসব সত্ত্বেও যে কথা বলা দরকার তা হচ্ছে এই বিরোধিতা প্রত্যেক দশকেরই ধর্ম। অগ্রবর্তী দশকগুলিতেও একইভাবে—তিরিশের বিরুদ্ধে চল্লিশ, চল্লিশের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ প্রচার করেছে। ষাটের ক্ষেত্রে কিছু বাড়তি উপাদান থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, ওই সময়ের সৃষ্টিশীল তরুণ লেখকরা আত্মপ্রকাশের একটা মাধ্যম খুঁজছিলেন, 'এই দশক' বুলেটিনের মধ্য দিয়ে সেটাই পাওয়া গেল। এই প্রকাশের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমগ্র ষাট ও তার পরবর্তী দশকের বেশ কিছুকাল ক্রিয়াশীল ছিল এ-ব্যাপারে তর্কের কোনো অবকাশ নেই।

যাই হোক, ঘোষণা ছাড়া বুলেটিনে ষাটের সদস্যদের গল্প বা কবিতা ছাপার কথা ছিল। কবিতা পবিত্র ও অনন্তর ছাপা হয়েছিল। অনন্ত দাশ অনেক পরে 'এই দশক'-এ সদস্যরূপে গৃহীত হয়। গল্প ছিল একটিই—রমানাথ রায়ের। অগ্রজ লেখকদের ওপর আলোচনার প্রথম সংখ্যাতেই আমার লেখা শঙ্খ ঘোষের ওপর ছাপা হয়। এর পরের সংখ্যায় রমা লেখে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর তার পরে দেবেশ রায়ের ওপর বোধ হয় সুব্রত বা পুষ্কর। দীপেনদার ওপর লেখার সময় রমা সহসাই লিখে ফেলল—'তাঁর (দীপেন্দ্রনাথের) লেখায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের মতো অশিক্ষিত চালাকি নেই।' এর ফলে পঞ্চাশের লেখকদের সঙ্গে ষাটের বিরোধ প্রকাশ্যে এল। এবং ঘটনাচক্রে আমিও সেই বিরোধে জড়িয়ে পড়লাম। আমি তখন সম্প্রতি পত্রিকা প্রকাশ করি। এখানে পঞ্চাশ ও ষাট উভয় দশকের তরুণ লেখকরাই আগ্রহের সঙ্গে লেখেন। আমি মনে করি গ্রহণ-বর্জন পাঠকের ব্যাপার। সাহিত্য গুণান্বিত যে কোনো শিবিরের লেখাই প্রকাশ করা সম্পাদকের কাজ। সে সময় পবিত্র আমাকে বলত তুই আর আমিই এখন বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য কবি। পঞ্চাশ আমাদের শত্রু। তোর কাগজে ওদের লেখা থাকলে খারাপ। বন্ধ কর। আমি জানিয়ে দিলাম, সেটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পবিত্র প্রমুখ ফতোয়া জারি করল—ষাটের কোনো লেখক যেন সম্প্রতিতে না লেখে। এদিকে পঞ্চাশের সমরেন্দ্র সেনগুপ্তও সম্প্রতিতে লেখা দিতে অস্বীকার করলেন রমার ওই লেখার প্রতিবাদে। উভয় শিবিরেরই বিরাগ ভাজন হলাম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সকলেই লেখা দিয়েছে। এমনকি রমানাথ রায় বা পবিত্রও। কিন্তু সম্পর্কটা খুব তিক্ত হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত আমি এই দশক বুলেটিনের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করলাম।

বুলেটিনে একটা পাতা ছিল বিদেশি সাহিত্যের আলোচনার জন্যে। এই পাতায় একবার দ্বিতীয় কি তৃতীয় সংখ্যায় আমার একটা লেখা বেরিয়েছিল। খুব মজার ব্যাপার ঘটেছিল। কেউ জানে না। কিন্তু সবই তো জানানো দরকার। কথাটা এই, বিদেশি সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ পড়াশুনা বা জ্ঞানগম্যি কোনোকালেই আমার ছিল না। ওই বিষয়ে লিখতে বলায় স্বভাবতই আমি আমার অসম্মতি ও অক্ষমতা জানাই। পরে রমা বলল, তুই লেখ, সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। লাইট হাউসের কাছে কোনো বইওলার কাছে—টাইমস লিটারেরি সাপ্লিমেন্টের চলতি একটা সংখ্যা কিনে রিভিউ অংশটা দেখিয়ে বলল—'এটা স্রেফ অনুবাদ করে দে। আমাদের পাঠকদের সব চিনি। কোনো শালা কিছু পড়ে না। তাদের তবু কিছু জানা হবে, আমাদের কাগজের নাম হবে। ঝামেলার কিছু নেই।' রমা বরাবরই এসব ব্যাপারে গুরু। আমি ওর নির্দেশ পালন করলাম। কাজটা বোধহয় বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই করা হয়েছিল। লেখাটার সবাই প্রশংসাও করল। আমাদের তৎকালীন মাস্টারমশাই অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় কাগজ পড়ার পর একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'ওই লেখাটা তোমাদের মধ্যে কে লিখেছে?' আমি সসঙ্কোচে চুরি ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বললাম—'আমাদেরই এক বন্ধু'। উনি স্পষ্ট করে বললেন, 'এ লেখকের নামই আমি জানি না। তার ওপর এ বয়সের একটা ছেলে এভাবে আলোচনা করেছে ভাবাই যায় না। একদিন তোমার বন্ধুকে নিয়ে এসো তো।' বস্তুত সাপ্লিমেন্টের সমালোচকই জানিয়ে দিয়েছেন উনি ফরাসি ভাষা থেকে সরাসরি আলোচনা করছেন কারণ তখনও ওই দুটি উপন্যাসের ইংরাজি অনুবাদ হয়নি। ভারতে সে বই আসার তাই প্রশ্ন নেই। কারণ লেখকও তখন নেহাৎ তরুণ। তাছাড়া আমার অনুবাদের ফাঁকে ফাঁকে কিছু দেশজ উপন্যাসের ব্যবহারও এটাকে একটা মৌলিক রূপ দেয়। যেমন—ফিলিপ সোলার (পরে এঁর কবিতাও পড়েছি। এমন কিছু আহামরি নয়।)-এর আলোচনায় সমালোচক বলেছিলেন—'লেখাটিতে লেখকের পরিকল্পনা খুব প্রকট। নৌকাডুবিতে নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন বেশ মজার, রূপকথার মতো।' আমি জুড়ে দিলাম,—যেন শকুন্তলার শিক্ষিত আংটির মতো। ঠিক সময়ে মাছের পেট থেকে রাজার হাতে এসে মিলন ঘটিয়ে দেয়। এই ছিল ষাটের প্রথম সাহিত্য আন্দোলনের সূচনা অংশের কথা।

।। চার ।।

'এই দশক' বুলেটিন আকারে পর পর ন'টি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশে তৎকালীন লেখক ও পাঠক সমাজে—বিশেষত তরুণদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে এবং এর প্রভাবে নতুন গল্প ও কবিতার একটি ধারা তৈরি হয়। পূর্বোক্ত উদ্যোক্তারা ছাড়াও বেশ কিছু তরুণ এই নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন রচনারীতিতে লেখা শুরু করেন। এঁদের কেউ কেউ পরে অল্প-বিস্তর পরিচিতিও পান। এ প্রসঙ্গে সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল চন্দ, শেখর বসু, বলরাম বসাক বা সুনীল জানার নাম করা যায়। 'এই দশক' বুলেটিনের পরই এঁদের লেখক জীবন শুরু হয়েছে বলা যায়।

১৯৬৪তে বুলেটিনের প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পরেই ১৯৬৫তে একই ('এই দশক') নামে একটি গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ও উদ্যোক্তাদের অধিকাংশই পূর্ববর্তী 'এই দশক' বুলেটিনের সদস্য ছিলেন এবং বুলেটিনে প্রকাশিত ঘোষণাগুলিই এখানে দেখা গেল। সুতরাং এই দশক গল্পের পত্রিকাকে এই দশক বুলেটিনেরই সূতিকা-গৃহ প্রসূত বললে ভুল হবে না যদিও ক্রমশ নতুন সদস্যদের আগমন, বিতর্ক সৃষ্টি ও রচনারীতির চমৎকারিত্বের দ্বারা পরবর্তীকালে এটি নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। এই দশক পত্রিকার জন্মসূত্রের সন্ধানে 'এই দশক' বুলেটিন ছাড়াও অবশ্য 'বিদিশা' নামের গল্পপত্রের নাম করতেই হবে। ফসল, মহেঞ্জোদারো, সম্প্রতির মতো পাঁচ-মিশেলি সাহিত্যপত্র ছাড়া সে সময় শুধুমাত্র গল্পের কাগজ দুটিই ছিল। বিদিশা ও ছোটগল্প। এর মধ্যে ছোটগল্প পত্রিকায় কালেভদ্রে দু-একটি এই লেখকদের লেখা ছাপা হলেও এটি মূলত চরিত্রে ছিল পঞ্চাশেরই অনুগামী। ফসলও প্রায় তাই। ষাটের নতুন লেখকদের পরীক্ষামূলক গল্প বেশিরভাগ বিদিশা ও সম্প্রতিতেই প্রকাশ পেয়েছে। তার মধ্যে বিদিশার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ এই পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সকলেই—আশিস ঘোষ, কল্যাণ সেন, সুব্রত সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে এই দশক রূপ বুলেটিন হয়ে (ঘুরে / মারফৎ) পত্রিকার আশ্রিত হয়েছে।

কিন্তু বিদিশা বা সম্প্রতি বা এই দশক বুলেটিন এসবের থেকে এই দশক পত্রিকার পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য হল, এখানেই প্রথম শুধু গল্প নিয়ে একটা তাত্ত্বিক ও বাস্তবিক আন্দোলন শুরু হল ঘোষিতভাবে একটি নির্দিষ্ট নামে, প্রথম সংকলনের ঘোষণাই ছিল—"এটি শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের এবং সমকালীন সাহিত্যান্দোলনের মুখপত্র" এই প্রথম ঘোষণার মধ্যেই পাওয়া গেল দুটি শব্দ ১। শাস্ত্রবিরোধী, ২। সাহিত্যান্দোলন। বস্তুত পরবর্তীকালে এই সম্পূর্ণ উদ্যোগই শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন রূপে পরিচিত হয়েছে। প্রথম থেকেই রমানাথ রায়, আশিস ঘোষ, শেখর বসু, সুব্রত সেনগুপ্ত, কল্যাণ সেন প্রমুখ ছিলেন। ক্রমশ দু-এক সংখ্যার ব্যবধানে অমল চন্দ, বলরাম বসাক ও সুনীল জানা যোগ দিলেন। এই আট শাস্ত্রবিরোধী লেখক—অষ্ট বসু, এঁরা অষ্ট ধাতুতে গড়া। পত্রিকায় যেসব তাত্ত্বিক আলোচনা ও কড়া কড়া স্লোগান ছাড়া হয়েছে সেগুলির রচনা প্রযোজনা ও রূপায়ণের দায়িত্বে প্রধানত ছিলেন—রমানাথ, সুব্রত ও অমল। অন্যান্যরা ঘটনাচক্রে এই চক্করে পড়ে গিয়েছিলেন বা সময় সুযোগ বুঝে ভিড়ে গিয়েছিলেন বলা যায়। অন্তত আন্দোলনের কোনো চিহ্ন এঁদের লেখায় ছিল না। এঁরা এসেছিলেন কেউ বন্ধুত্ব ও দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার সূত্রে কেউ আন্দোলন প্রসারের প্রয়োজনে কেউ বা সম্ভাব্য বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক হিসেবে। এই বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক লেখকটি কিন্তু নির্বাচকদের প্রত্যাশা একেবারেই পূরণ করতে পারেননি। তাঁরা বন্ধুদের কাছে একান্তে বহুবারই আক্ষেপ করেছেন। সবচেয়ে বেশি অভিযুক্ত হয়েছি আমিই, কারণ আমার সুবাদেই ওই লেখকের এই দশক বা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়। সম্প্রতি পত্রিকার একটি সংখ্যায় তাঁর সাহায্যে প্রচুর

প্রায় আশাতীত বিজ্ঞাপন সংগৃহীত হয়। এই ঘটনাই তৎকালীন এই দশকের লেখকদের ভ্রান্তির কারণ। এঁরা বিশেষত রমানাথ প্রায়ই অনুযোগ করেছে—কি মালই বাজারে ছেড়েছিস! শালা লিখতেও জানে না, বিজ্ঞাপনও এল না ওটাকে নেয়াটাই ভুল হয়েছে।

১৯৬৫ থেকে '৭৬ এই বারো বছরে মোট বাইশটি সংকলনের পর এই দশক শাস্ত্র-বিরোধী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যেই এই আন্দোলন নানাভাবে সাহিত্যে আকাঙ্ক্ষিত প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিল নিঃসন্দেহে। প্রথম প্রকাশ থেকেই নানা উত্তেজক স্লোগান বা ঘোষণা দিয়ে সাহিত্যের বাজার বা বাগান তছনছ করতে জানান দিয়ে প্রবেশ করলেন শাস্ত্রবিরোধী লেখকরা। তাঁরা বললেন— ১। গল্পে যারা কাহিনী খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে। ২। গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব। ৩। আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত। অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।

এই সব এবং আরো অনেক ঘোষণা ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাওয়ার ফলে আন্দোলন আরো ঘন এবং প্রচারিত হতে থাকে। সাধারণ্যে বিশেষত তরুণ লেখকদের মধ্যে এই সব স্লোগান এবং প্রচলিতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভীষণভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আমার বিবেচনায় শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন প্রস্তাবনা, চরিত্র এবং প্রতিক্রিয়ায় বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সার্থকতম সাহিত্য আন্দোলন।

এই আন্দোলন ও এঁদের আদর্শ, প্রস্তাব বা রচনা ইত্যাদি নিয়ে অনেক বিবাদ বিতর্ক ও প্রশ্ন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। এঁরা প্রায়শ লেখার মধ্যেই স্ববিরোধী উক্তি করেন, একই লেখক ভিন্ন লেখায় ভিন্ন-ভিন্ন উক্তি করেন। এক সদস্য অন্যের বিরোধিতা করেন এই সব উল্টোপাল্টা উক্তি ও ঘটনা পাঠকদের বিরক্ত ও বিভ্রান্ত করে আন্দোলনের পক্ষে যা ক্ষতিকর। ইতিমধ্যে ১৯৭০-৭২ এর মধ্যে কোনো সময়ে এই দশকের অন্যতম সদস্য বলরাম বসাক প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করল। বলরাম তখন দৈনিক আনন্দবাজারের রবিবাসরীয়তে প্রায় নিয়মিত লিখছে। সাময়িক কিছু খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা প্রায় সহসা অনায়াসে এসে গেছে। বিপ্লবের আর প্রয়োজন নেই অথবা শাস্ত্রবিরোধী ছাপ এই প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন চিন্তা হয়তো বলরামকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। কিন্তু অচিরেই আনন্দবাজারে পরিত্যক্ত ও এই দশকে নিন্দিত বলরাম প্রায় স্তব্ধ ও বিস্মৃত হয়ে গেল।

কিন্তু সদ্য তরুণ এই লেখকদের ওই সব উদ্ভট ও অবাঞ্ছিত ক্রিয়াকলাপ সত্ত্বেও এই আন্দোলনের বেশ কিছু ইতিবাচক দিক আছে। যেমন—এদের প্রস্তাবিত নতুন ধারার গল্পের বেশ কিছু পাঠক তৈরি হয়েছে। কেননা ওই সব লেখকদের বইয়ের বিক্রি এখন খুব নগণ্য নয়। এ ছাড়া এই রচনারীতির দ্বারা ক্রমশ পরবর্তীকালের লেখকদের অনেকেই প্রভাবিত হয়েছেন। আশিস মুখোপাধ্যায়, তাপস চৌধুরী,

মনোজ চাকলাদার, চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর বন্দী, অমল দত্ত প্রমুখ লেখকের নাম এ প্রসঙ্গে করা যায়। এরা পরবর্তীকালে সাতের দশকে শাস্ত্রবিরোধীর বিকল্প ও প্রায় পরিপূরক একটি আন্দোলন নিজেরাই সংগঠিত করেছিল। অবশ্য এই আন্দোলনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকা বা এদের শরিকদের ঘনিষ্ঠ সাহায্যের জন্য গর্বিত এই লেখক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য সবিশেষ লজ্জিতও বটে। তার কিছু উল্লেখ না থাকলে ইতিহাসধর্মী এই আলোচনায় সম্পূর্ণতা আসে না। তাই এসব প্রসঙ্গ।

।। পাঁচ ।।

১৯৭৬ সাল নাগাদ এই দশক পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল। তা যেতেই পারে। একটা বিশেষ বয়েসের পর উত্তেজনা কমে আসে, পত্রিকা বন্ধ হয়। এসব ঘটনা সব সময়ই হয়। এক্ষেত্রে এগারো-বারো বছর সময় বা বাইশটা সংকলনের প্রকাশই একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হল ঠিক এর অব্যবহিত আগেই এই গোষ্ঠীর মুখ্য বিপ্লবী লেখকদের আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। ১৯৭২-৭৩ সাল থেকে দেশ পত্রিকায় ও ১৯৭৫-৭৬ থেকে আনন্দবাজার দৈনিক ও পূজা সংখ্যায় এই গোষ্ঠীর রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, আশিস ঘোষ ও শেখর বসু প্রমুখের লেখা প্রকাশ শুরু হয়। আর ১৯৭৬ সালেই এই দশকের শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

এই ঘটনায় শাস্ত্রবিরোধী গোষ্ঠীর বাইরে যে লেখকদের স্লোগান-বিদ্ধ করে তাঁদের প্রাচীন ও অলেখক প্রতিপন্ন করার জন্য এরা এতকাল আন্দোলন করেছিল তাঁরা সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলতে পারেন—এই বিপ্লব, স্লোগান, ভাঙচুর, এতসব ধানাই-পানাই গোলাগুলি সবই কি তা হলে ওই বাণিজ্যিক কাগজে নিজেদের জায়গা করে নেয়ার জন্যেই! বিশেষত বলরাম কয়েক বছর আগেই একইভাবে আনন্দবাজারের প্রভাবে দলত্যাগ করায় অবশিষ্টরা একই রকম মন্তব্য করেছে। বিরোধীদের এইসব প্রশ্নকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং সে ইচ্ছাও বর্তমান লেখকের নেই এটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়েছে।

তবে এটাও বোধ হয় ঠিক, এই শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের একটা অংশ, অন্তত, রমা, সুব্রত ও অমল কখনো প্রকৃত অর্থে স্বধর্মচ্যুত হয়নি নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও। বাণিজ্যিক কাগজের সঙ্গে কিছু সমঝোতা করেও এরা (অমল বাদে) আন্তরিকভাবে নতুন রচনাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। অমল, এদের মধ্যে কোনোদিনই বাণিজ্যিক কাগজে লেখেনি। কারণ সে যোগ্যতাও ওর ছিল না। গল্পের তো ওই ছিরি! না সাবজেক্ট না প্রেডিকেট। উপন্যাসের নায়ক চৌবাচ্চা থেকে গোরুর মতো জল খায়। তাছাড়া লেখকেরও ব্যক্তিত্ব বা বুদ্ধিসুদ্ধি কিসসু নেই। বোধহয়, ৭০-৭২ সালেই ময়দানে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে, ছোট গল্প আলোচনার এক মঞ্চে সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উদ্দেশ্য করে অমল অনেক অপমানসূচক ও বিপ্লবাত্মক কথা বলে

পরে আবার আহ্বায়ক বিমল করের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখল।—এটাই সম্ভবত অমলের চরিত্রে একমাত্র কালো দাগ হয়ে আছে। এটা ছাড়া অমল কখনোই বাণিজ্যিক সাহিত্য ও তার প্রতিনিধিদের ধারে কাছে যায়নি। লিখতও চমৎকার, লেখক পাঠক কারোর তোয়াক্কা করত না। পরবর্তীকালে ও নিজেই অন্যতর একটা সাহিত্য আন্দোলন সংগঠিত করেছে। কিন্তু বেশ কিছুদিন যাবত অমল এখন মুমূর্ষু। বহু বিলম্বিত জীবনসুধা পানেও এখন অবশ ও অচেতন। লেখালেখি প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। ওর সম্বন্ধে বেশি কিছু বলা এখন অর্থহীন। প্রায় বছর পাঁচেক ও পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়।

রমানাথ রায় অমলের মতো ব্রহ্মচারী নয়। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা বা অর্থের আকর্ষণ তার ষোল আনাই আছে। ঠিক সময়ে আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক বিপ্লবী বুলি বন্ধ করে বাণিজ্যিক বৃক্ষছায়ার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু রমা তার রচনায় অন্তত বাণিজ্যিক রচনার রীতিনীতি কখনোই অঙ্গীকার করেনি, একথা অনস্বীকার্য। বাণিজ্যিক পত্রিকার পক্ষেও গ্রহণীয় কিন্তু রমারও সহজাত (দীর্ঘদিন রমার লেখার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য জানি) কৌতুকপ্রিয়তার পৌনঃপুনিক ব্যবহার ছাড়া রমা বড় কাগজেও ধারাবাহিক ভাবে নিজস্ব রচনা ও উচ্চারণের চর্চাই করেছে। কাগজ, বাণিজ্যিক বড় কাগজে তার প্রতিষ্ঠা তেমন দৃঢ় হয়নি বটে কিন্তু এই রীতি কিছু প্রচার পেয়েছে এবং সেই সুবাদে কিছু নতুন পাঠক সমাজও গড়ে উঠেছে। বস্তুত ছোট বড় কাগজ মিলিয়ে রমাই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের রীতি ও আদর্শকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় বেঁধে রাখতে পেরেছে।

রমানাথের সঙ্গে সুব্রত সেনগুপ্তর অনেক ব্যাপারেই মিল আছে। সেই বিদিশা প্রকল্পের সময় থেকেই সুব্রত কট্টর শাস্ত্রবিরোধী। লেখায় স্লোগানে সর্ব ব্যাপারেই সুব্রত নিজের স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরতে জানে। এই দশক সাহিত্য পত্রিকার পাঠশালা বন্ধ করে বাণিজ্যিক কাগজের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পর প্রথম কিছুদিন সুব্রতর লেখায় প্রায় বাণিজ্যিক লেখার মতোই ধরাবাঁধা রাস্তা ও যৌনতার প্রকোপ দেখা দেয়ায় আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই পীড়িত বোধ করেছি। আমার ক্ষোভের কথা একটি পত্রিকায় প্রকাশও করেছি। কিন্তু দু-তিন বছর আগে আজকাল পত্রিকার পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত সুব্রতর পর-পর দুটি উপন্যাস পড়ে মনে হয়েছে—প্রয়োজনে সুব্রত ঠিক সময়ে ঘুরে দাঁড়াতে জানে। এই লেখকের কাছে এখনও আমাদের বেশ কিছু পাওয়ার আছে।

অবশিষ্ট শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের মধ্যে কল্যাণ সেন, সুনীল জানা ও বলরাম বসাকের লেখা দীর্ঘদিন বন্ধ। বাকি যাঁরা প্রধানত বাণিজ্যিক কাগজে আধা বাণিজ্যিক লেখায় মাঝে-মাঝে গত জন্মের বিপ্লবীয়ানার চোঁয়া ঢেকুর তুলছেন তাঁদের লেখায় শাস্ত্র-বিরোধিতার চিহ্ন খোঁজা পণ্ডশ্রম।

॥ ছয় ॥

১৯৬৪ সালে 'এই দশক' বুলেটিনের প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর ১৯৬৫তে এই দশক গল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেকথা এতক্ষণ আলোচিত হয়েছে। আগের আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে, 'এই দশক' বুলেটিনের উদ্যোক্তা ও লেখকসঙ্ঘ যৌথভাবে গল্প ও কবিতা লিখিয়েদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আর ঠিক এই সময়েই ষাটের দ্বিতীয় সার্থক আন্দোলন—'শ্রুতি' কবিতাপত্রকে ঘিরে শুরু হয়। কবিতা লিখিয়েদের মধ্যে বর্তমান লেখক—অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৯৬২ সালেই বুলেটিন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ব্যাপারটা হল—পূর্বে উল্লেখিত পবিত্র আর রমার সঙ্গে পঞ্চাশের কিছু লেখক ও কবির সেই পুরনো গণ্ডগোল। একটা ব্যাপার সেই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দেখছি—তুখোড় রাজনীতিক বা ঝানু ব্যবসায়ীর কায়দাতে কিছু লেখক শিল্পীও তাঁদের ব্যক্তিগত যে কোনো সমস্যাকে গোষ্ঠী বা সমষ্টির সঙ্গে স্বেচ্ছাকৃতভাবে জড়িয়ে ফেলেন—'এটা শুধু আমারই বিপদ নয়, দলের সকলের বিপদ। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে একে প্রতিহত করতে হবে।'—এমন একটা ধারণা এঁরা প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে চান। অধিকাংশ সময়ই এই পদ্ধতি বেশ কাজ দেয়। এক সময় বলরাম বসাক শাস্ত্রবিরোধী সঙ্ঘ পত্রিকা ত্যাগ করে ওই দলের কোনো কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে একটা লেখা লিখেছিলেন। ওই পদ্ধতিতেই নানা চেষ্টায় সে লেখার প্রকাশ বন্ধ করা হয়। একবার প্রান্তন শাস্ত্রবিরোধী এক সদস্য আনন্দবাজারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। সেবারও তিনি কিছু সহকর্মীকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে এটা তাঁদের সকলের অপমান। অবশ্য সেক্ষেত্রে ওই লেখকের সঙ্গে তাঁদেরও ভরাডুবি হয়েছিল। বর্তমান লেখাটিও গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্ত বলে বিবেচিত হলে বিস্মিত হব না। তবে এ সবের শুরু ওই বুলেটিনের সময়েই যখন রমানাথ ও পবিত্রর সঙ্গে পঞ্চাশের শক্তি ও সন্দীপনের ব্যক্তিগত বিরোধকে ষাটের বিরুদ্ধে পঞ্চাশের অবজ্ঞা ও অপমান বলে প্রচার করা হয়।

যাই হোক, তারপর বছর দুয়েক চলার পর সম্প্রতি বন্ধ হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে আমি এই দশক বুলেটিনে লেখা দেয়া বন্ধ করলাম এবং সাহিত্যক্ষেত্র থেকেই প্রায় নিষ্ক্রমণ করলাম। বন্ধুদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন হল। বর্তমান আলোচনার পটভূমি ও বাস্তবতার অনুধাবন এবং এইসব উদ্যোগে আমার ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন ও বিতর্কের ব্যাখ্যার চেষ্টাতেই এইসব ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উপস্থাপনা। সব ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকা উচিত বলে মনে করি। ১৯৬৪ সালে বুলেটিনের প্রকাশ বন্ধের পর প্রায় বছর দুই সম্প্রতি ও আমি ছিলাম। তারপরই নানা কারণে ১৯৬৫-৬৬ নাগাদ সমাপ্তি ও প্রস্থান।

ঠিক এই সময়েই ৬৪-৬৫ নাগাদ ষাটের দ্বিতীয় সার্থক কাব্যান্দোলন—'শ্রুতি'র সূত্রপাত হয়। এই দশকের প্রায় একই ঢংয়ে স্লোগান, বিবৃতি ও ঘোষণা সহযোগে 'শ্রুতি' কবিতা আন্দোলন ও কবিতায় নতুন যুগের সূচনার অঙ্গীকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ

করে। ঘোষণাগুলির অধিকাংশই এই দশক বুলেটিনে পূর্বেই প্রকাশিত। যেমন— কবিতায় রাজনীতি প্রচারিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর জৈবমত্ততার স্থান নেই। কবিতার কোনো রকম ব্যাখ্যা বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব নেই। ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা। সমস্ত প্রথার শাসন ছিন্ন করে সংস্কারের বন্ধন ভেঙে কবিতাকে স্বপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কবিতা চিৎকার নয়, নিবিষ্ট উচ্চারণ। কারিগরী নির্মাণ নয়, শিল্পসৃষ্টি। বুদ্ধির চমক নয়, ব্যাকুল সন্ন্যাস। ব্যক্তিগত জগৎ সৃষ্টির জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনা-রীতি ও উচ্চারণ; এ ছাড়াও ব্যাকরণের বিরোধিতা, প্রচলিত ছন্দের বর্জন, ছেদচিহ্নের বিলোপ। নতুন ধরনের মুদ্রণের বিন্যাসে কবিতার দৃশ্য ও শ্রাব্যরূপের প্রকাশ ইত্যাদি। বাংলা কবিতা এখন আন্তর্জাতিক, সুতরাং সমকালীন বিদেশি কাব্যান্দোলন থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত।

এই সব প্রচার ঘোষণা ও কবিতায় তার রূপায়ণ ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাঁচ বছরে প্রকাশিত দশটি সংখ্যায় শ্রুতি পত্রিকার পাতায় দেখা যাবে বিভিন্ন নামে টুকরো-টুকরোভাবে, কখনও আলাদা নিবন্ধ আকারে। পত্রিকা ১/৮ ডিমাই সাইজে দশ পয়েন্টে-ছাপা, অধিকাংশই নিউজপ্রিন্টে। মূল্য ৫০ পয়সা। কিন্তু বিনামূল্যেই বিতরিত হত। লিটল ম্যাগাজিন হয়তো এখন কিছু বিক্রি বাটা হয়। কিন্তু তখন অধিকাংশ কাগজই—এই দশক বুলেটিন, পত্রিকা, শ্রুতি, হাংরি, সপ্রতি, ঈগল, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো সবই প্রকাশিত হত প্রধানত, সদস্যদের চাঁদা বা সম্পাদকের টাকায় এবং যৎসামান্য বিজ্ঞাপনের দাক্ষিণ্যে এবং বিতরিত হত বিনামূল্যে। ক্বচিৎ স্টলে কিছু কাগজ দিলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে টাকা বা কাগজও ফেরত পাওয়া যেত না।

শ্রুতি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ও সদস্যদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছিল—পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল বসুচৌধুরী ও অনন্ত দাশ এই পাঁচজন। পরে অনন্ত শ্রুতি ত্যাগ করে। আরো অনেকে—যেমন, রক্তেশ্বর হাজরা, সুকুমার ঘোষ, রথীন ভৌমিক, প্রমুখ কখনও সদস্য হয়ে বা বাইরে থেকে শ্রুতিতে দু-একটি লেখা লিখেছেন। এমন কি অতীন্দ্রিয় পাঠক, রবীন সুর, অভী সেনগুপ্ত বা অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দু-চারটি কবিতা শ্রুতির অন্তিম পর্বে দেখা যাবে। কিন্তু এঁরা কেউ শ্রুতি লেখকগোষ্ঠীভুক্ত নয়। শ্রুতির লেখক বলতে পুষ্কর, পরেশ, সজল ও মৃণাল এই চারজনকেই বোঝায়।

শ্রুতি আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত ঘোষণা, স্লোগান ইত্যাদি যৌথভাবে প্রকাশিত হলেও এগুলি বেশির ভাগই পুষ্কর দাশগুপ্তর রচনা ও পরিকল্পনা ছিল। যেমন রমানাথ এই দশকের বা মলয় হাংরির বা অমল ছাঁচ ভেঙে ফ্যালোর তেমনি পুষ্করও শ্রুতির প্রধান তাত্ত্বিক নেতা। শ্রুতির মুখ্য লেখকও এই চারজন। যদিও পুষ্করের মৌলিক লেখার চেয়ে ভাষণ ও প্রচারই বেশি ছাপা হয়েছে। আন্দোলনের তাত্ত্বিকতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই পুষ্করের কিছু আকর্ষণীয় কবিতাও সে সময়ে বেরিয়েছে, তবে তা সংখ্যায়

খুবই কম। পরেশ, মৃণাল ও সজল—বিশেষত পরেশ বাংলা কবিতাকে প্রায় পুনর্গঠন করল শ্রুতির পাতায়। পুষ্করের ঘোষণা ছিল, কবিতা—ছবি ও সঙ্গীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পরেশের কবিতার ছবি ও ছবির সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক স্পষ্ট দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপে প্রকাশ পেয়েছে। সজলের কবিতায় তেমনি সুর ও গান—অক্ষর ও স্তবক বিন্যাসে ছবিরও আভাস আছে। আর মৃণাল ছন্দের ব্যবহারে স্তবক বিন্যাসে, কবিতা ভাষার ব্যবহারে শ্রুতির দর্শন ও অনুশাসনে প্রাণিত ও প্রয়োগে সার্থক কবি হয়েও শ্রুতি সঙ্ঘে সর্বাধিক সংগঠন ক্ষমতার অধিকারী। প্রকৃতপক্ষে মৃণালের উদ্যোগেই শ্রুতির প্রকাশ ১০ম সংখ্যা (মার্চ / ১৯৬৯) পর্যন্ত মসৃণভাবে ঘটেছে। তারপরও যখন শ্রুতি পরিষদ অবসন্ন, প্রায় মুমূর্ষু মৃণালই একক উদ্যোগে একাদশ থেকে চতুর্দশ (১৯৭০-৭১) চারিটি সংখ্যা প্রকাশ করে শ্রুতির পুনর্জীবনের জন্য শেষ ব্যর্থ চেষ্টা করে।

সমমনস্ক লেখকদের নিয়ে কোনো রকমে পত্রিকা বাঁচিয়ে রাখার জন্য মৃণাল তখন উদগ্রীব। সেই সূত্রেই ওই সব কবিদের—অশোক, অতীন্দ্রিয়, অভী বা রবীনের শ্রুতিতে প্রবেশ ও প্রকাশ। ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্প্রতি বন্ধু উত্তম দাশের হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন গ্রন্থে এর উল্লেখ দেখে মনে পড়ল। শ্রুতি তখন, ১৯৬৯ এর দশম সংখ্যার পর প্রকৃত প্রস্তাবে ভেঙেই গেছে। শ্রুতির প্রাণপুরুষ পুষ্কর এরপর আর শ্রুতিতে লেখেনি। পুষ্করের কাজই হচ্ছে, প্রবল উৎসাহে কোনো কাজ শুরু করা এবং কিছুদিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে সতীর্থদের ডুবিয়ে বিদায় নেয়া। শ্রুতি, কালক্রম প্রভৃতির প্রকাশ ও প্রয়াণের ব্যাপারে পুষ্কর একাধিকবার ওর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে।

১৯৬৩-র পর আমি লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। ৬৩ থেকে ৬৮ ছ-বছরে মাত্র দুটি লেখা অমৃত পত্রিকায় বেরিয়েছে। সুতরাং ওই সময়ে, শ্রুতির প্রকাশ কালে শ্রুতিতে লেখার কোনো প্রশ্নই আসে না। ১৯৬৯ এ কবিতায় আমার পুনঃপ্রবেশ ঘটে। লেখা বন্ধ থাকাকালীন দূর থেকে সব লক্ষ করতাম। কবিতা ও কবি বন্ধুদের সঙ্গে একটা অতি ক্ষীণ সম্পর্ক ছিল মাত্র। নতুন করে লেখা শুরু করে দেখলাম উপস্থিত কবিতা ও অধিকাংশ কবি আমার অপরিচিত। অবশ্য পুরনো বন্ধুদের মধ্যে পরেশ সজল ও মৃণাল তখনও সক্রিয়। দীর্ঘদিন পরে আমার ভেসে ওঠার পরই পুষ্কর ও তৎকালীন বহিশিখা সম্পাদক উত্তম দাশ ডুব দিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই পরেশ, সজল ও মৃণালও ডুব দেবে তখনও জানতাম না। এখন মনে পড়ছে ঠিক সেই সময়েই ১৯৭০ এ মৃণাল আমার কাছে শ্রুতির জন্যে কবিতা চায় সঙ্গে পনের টাকা চাঁদা। দীর্ঘ চর্চাহীনতা ও জড়তার পর সদ্য লেখা শুরু করেছি। অবশ্য লেখা বন্ধ থাকলেও শ্রুতির খবরাখবর ও লেখন রীতির সঙ্গে পরিচয় ছিল। তবু সে সময় আমি খুবই অস্ফুট ও অপটুভাবে শ্রুতির রচনাদর্শকে প্রায় অনুকরণ করে কিছু লিখেছি পর পর দু-তিনটি সংখ্যায়; এখন সেসব লেখার জন্য আমি লজ্জিত। বস্তুত

শ্রুতি আন্দোলনের চূড়ান্ত সময়ে আমি অনুপস্থিত থাকলেও এর দ্বারা প্রভূতভাবে প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু তার জন্যই আমি শ্রুতি আন্দোলনে ছিলাম এমন দাবি করা যায় না। এক সময় আলোক সরকারের এই উল্লেখে আমি একটি পত্রিকায় লিখিতভাবে প্রতিবাদ করেছি, এখন উত্তমের উল্লেখেরও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি, অতীন্দ্রিয়, রথীন, কালীকৃষ্ণ বা রবীন আমরা কেউ শ্রুতি গোষ্ঠীর নই, এটা ঐতিহাসিক সত্য।

এই আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায়, অন্তত, শ্রুতির ঘোষণাবলীতে যা প্রকাশিত তার থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রত্যেক সৃষ্টিশীল লেখকদের মতোই শ্রুতি গোষ্ঠীর কবিরাও প্রথম থেকেই কবিতার প্রচলিত স্রোত থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে চেয়েছেন। কারণ স্বাতন্ত্র্য ছাড়া নতুন কবিদের কোনো উপযোগিতাই নেই। এ-ভাবেই মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথ ও তারপর জীবনানন্দের প্রবেশ ঘটে বাংলা কবিতায়। জীবনানন্দের পরও বিভিন্ন পর্বে কবিরা স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত হয়েই স্মরণীয় হয়েছেন। তাই পঞ্চাশের প্রচলিত ধারা থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে নিতে তাঁরা ঘোষিত ও পরিকল্পিত-ভাবে কবিতায় নানারকম রীতির উপস্থাপনা দ্বারা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন। প্রথম থেকেই এঁরা বুঝেছিলেন, বুলেটিনে বা পরে এই দশক বা শ্রুতির ঘোষণাতেও ছিল রীতির ওপর গুরুত্ব—"কবিতার ইতিহাস তার আঙ্গিকের ইতিহাস।" কেন না বিষয় নিয়ে নতুন বিশেষ কিছু করার নেই। শোক দুঃখ প্রেম আনন্দ আবেগ—এ সবই ছিল আছে থাকবে। শুধু প্রকাশটাই আলাদা হয়ে যায়। সুতরাং এই প্রকাশ রীতিরই চর্চা দেখা গেল শ্রুতিগোষ্ঠীতে, এই চর্চায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে এল নানা প্রক্রিয়া। এতদিন কবিতার অন্তরঙ্গ বিষয় হিসেবে ছিল, প্রেম, প্রকৃতি, রাজনীতি, মনস্তত্ত্ব, মানুষের জৈব ধর্ম প্রভৃতি। এবং বহিরঙ্গের ব্যাপারে ছন্দ অলঙ্কার, মিল অমিল নিয়ে কিছু কথা ও কাজ হয়েছে। তিরিশ ও চল্লিশের কবিরা প্রধানত অক্ষরবৃত্তকেই পছন্দ করলেও পাশাপাশি চার মাত্রার হালকাচালে গভীর বক্তব্যকেও উপস্থাপনা করার চর্চা করেছেন। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনে চর্চিত গদ্য ছন্দের ব্যাপক ব্যবহার ও চর্চা প্রাধান্য পেয়েছিল। পঞ্চাশের কবিতায় এই সব ও সেই সঙ্গে পয়ারেরই পরিবর্তিত সনেটকল্প ষোড়শপদী নামে এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ কবিতার খুবই প্রচলন হয়েছিল।

শ্রুতির কবিরা বাংলা কবিতার উপরি উক্ত ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে কবিতার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ উভয় দিকে নতুন কণ্ঠস্বর ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে ঘোষিত ভাবে প্রবেশ করলেন। পূর্বালোচিত শ্রুতির ঘোষণাগুলি থেকে এঁদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা স্পষ্ট হবে।

পঞ্চাশের কবিতার চিৎকৃত আবেগী উচ্চারণের বিরুদ্ধে শান্ত স্থিতধী অন্তর্মুখী কবিতা শ্রুতির কবিরা অঙ্গীকার করেছিলেন। কোনো বর্ণনা বা দার্শনিকতার ভণ্ডামি নয়, আত্মপ্রচার বা কল্পনাবিলাস নয়, বস্তুর নিজস্ব রূপের ও ধর্মের বাস্তব উপস্থাপনাই তাঁদের অভীষ্ট ছিল। এই বস্তুতান্ত্রিকতার প্রকাশের উপযোগী আঙ্গিকই তাঁদের

প্রয়োজন ছিল। বস্তুনিষ্ঠ কবিতায় বিদেশি আন্দোলন—কংক্রিট কবিতা ফরাসি দেশে তখনই শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার খবরাখবর তখনও এদেশে পৌঁছয়নি। শ্রুতির তাত্ত্বিক নেতা, ফরাসি ভাষায় তৎকালীন কৃতী ছাত্র ও বর্তমানে কৃতী অধ্যাপক পুষ্কর দাশগুপ্ত অতীত সাহিত্যের মালমেঁ—পাউন্ড এবং এই শতকের প্রথম পাদের অ্যাপলিন্যের প্রমুখের দৃষ্টান্তে কবিতার দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপকে নিজের রচনায় প্রকাশ করলেন। শ্রুতির প্রথম সংখ্যাতেই পুষ্করের সূর্যস্তোত্র দিয়ে এর সূত্রপাত। টাইপ সাজিয়ে কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপের প্রকাশ। সমসময়ে এসব রচনা প্রবলভাবে সমালোচিত কখনো ধিক্কৃত হয়েছে। কেউ বলেছে টাইপোগ্রাফি কেউ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছে—'এরা কি আগের জন্মে কম্পোজিটর ছিল!' পুষ্করের প্রধান সহযোগী শ্রুতির অন্যতম স্তম্ভ পরেশ মণ্ডলও বিদেশি সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক। পরেশ আরো চমকপ্রদভাবে, কখনোও ওই টাইপোগ্রাফি কখনোও ব্লক সহযোগী নতুন নতুন আঙ্গিক উদ্ভাবন করে শ্রুতির বস্তুতান্ত্রিক কবিতার আদর্শকে রূপায়িত করে নতুনের অনুরাগী নতুন পাঠকসমাজকে সচকিত করে তুলল। ততদিনে ষাটের শেষের দিকে কংক্রিট কবিতার পুরোধা পীয়ের গার্নিয়ের ও তাঁর সহযোগীদের কিছু লেখা—*The Concrete Poetry World View*, বইটি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

সেই সময়ে, দীর্ঘ ছ-বছরের অজ্ঞাতবাস ছেড়ে ১৯৭০ সালের প্রথমে কবিতায় আমার পুনঃপ্রবেশ ঘটেছে। মৃণালের প্রযত্নে শ্রুতির শেষ কয়েক সংখ্যায় কবিতাও ছাপা হয়েছে। তারপর, ১৯৭২-৭৩ নাগাদ আমার ও পরেশের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হল ঈগল। প্রথম পর্যায়। এই প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা দরকার। আমি দীর্ঘদিন যাবত ঈগল সম্পাদনা করছি একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ঘটনা হল ঈগলের সূত্রপাত সাতের দশকে—এই দশক, শ্রুতি, এক কথায় সেই বুলেটিনের অধিকাংশ সদস্যের সম্মিলিত উদ্যোগে সহযোগিতায় ও অর্থানুকূল্যে। সম্পাদনার দায়িত্বে আমি ও পরেশ ছিলাম সদস্যদেরই নির্বাচনে। কাগজটি প্রায় এই দশক ও শ্রুতির বিকল্প ও পরিপূরক হিসেবেই প্রকাশিত হয়। শ্রুতি প্রসঙ্গে এই আলোচনা তাই বিধেয় মনে করছি। সদস্যদের মধ্যে ছিল রমানাথ রায়, সুব্রত সেনগুপ্ত, শেখর বসু, অতীন্দ্রিয় পাঠক, তপনলাল ধর, সজল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরেশ ও অশোক তো বটেই। এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ছিল রমার। ঈগল নামটাও ওর দেয়া। আসলে সেই সময়ে লেখা ওর একটা উপন্যাসের ছাপার হরফে প্রকাশ হওয়া দরকার ছিল। প্রথম সংখ্যা থেকেই ছিল—রমার উপন্যাস 'সাক্ষাৎকার' এবং অন্যান্য শাস্ত্রবিরোধী লেখকদের গল্প ও গ্রন্থ আলোচনা। কবিতায় শ্রুতির পুষ্কর ছাড়া সবাই।

এই ঈগলেই কংক্রিট কবি পীয়ের গার্নিয়েরের একটি রচনা আমি অনুবাদ করি বিশ্বস্তভাবে। (আগের বুলেটিনের অনুবাদের মতো কোনো তঞ্চকতা ছিল না।) তাছাড়া,

শ্রুতিধারায় আমার কিছু কবিতা ও ছেলেমানুষি কাজ। যেমন—ছবি ও কবিতা মিলিয়ে ছবিতা। কখনো রুকে কখনো ছোট বড় টাইপ সাজিয়ে একপাতা-দুপাতা জুড়ে সব লেখা। এক সময় আন্তরিকভাবেই এসবে মত্ত ছিলুম। সমর্থনে অনেক গদ্যও লিখেছি। শুধুমাত্র নিজেকে বিজ্ঞাপিত করা ছাড়া এসবের কোনো মূল্য নেই, একথা এখন অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। শুধু প্রচলিত স্রোতের বিরুদ্ধে নতুন পথের সন্ধান ছাড়া এসব কাজে সদর্থক কিছুই ছিল না। তবু এই ভুল চর্চা থেকেই পরবর্তী কালের কবিতায় আমি প্রচুর উপকৃত হয়েছি। পাশাপাশি পরেশ সজল অতীন্দ্রিয় তপন তাদের সক্ষমতা নিয়ে ক্রিয়াশীল ছিল—এক কথায় প্রথম পর্যায়ের ঈগলই হয়ে উঠল বিপ্লবী লেখকদের শেষ মঞ্চ। তারপর প্রথমে ধারাবাহিক উপন্যাস শেষ হওয়ার পরই রমা চাঁদা দেয়া বন্ধ করল। ক্রমশ অন্যরাও পত্রিকা ত্যাগ করল, ঈগল বন্ধ হল। এরপর চার পাঁচ বছর পরে ঈগল আবার প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈগলের প্রকাশ অতি সাধারণ একটা পত্রিকার মতো। আমি জবরদস্তি করে প্রকাশ করলাম ও চার পাঁচ বছর চালালাম অনেকটা মৃণালের শেষ পর্বের শ্রুতি চালাবার মতোই, অর্থহীন অস্তিত্বরক্ষার একটা শেষ ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র।

॥ আট ॥

বন্ধু উত্তম দাশের 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' বইয়ে হাংরি বিষয়ে যা পড়লাম তার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতার কিছু অমিল আছে। আবার পুরো ব্যাপারটায় একটা বিভ্রান্তিও এসে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক স্বার্থেই এসব খোলাখুলি আলোচনা হওয়া দরকার।

এই দশক, শ্রুতি, ঈগল সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭৭ এর জানুয়ারিতে ঈগল দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হল। ওই সময় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় কৃত্তিবাস মাসিক রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। সদ্য আইয়োয়া ফেরত সুনীল তখন আনন্দবাজারে প্রতিষ্ঠিত। পুরনো নস্টালজিয়া থেকে কৃত্তিবাসকে চালু করলেন। হয়তো ইচ্ছে ছিল, একটা সমান্তরাল আধা বাণিজ্যিক কাগজ করার। প্রথম সংখ্যা থেকে সমরেশ বসুর উপন্যাস এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের লক্ষণীয় আনুকূল্যে এমন ধারণাকে প্রশ্রয় দেয়। সম্পাদনায় স্বয়ং সুনীল এবং তত্ত্বাবধানে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ও কিছু ছোকরা কবি লেখক। ওই মাসিকেই সেই সময় হাংরি নিয়ে কিছু বিতর্ক হয়। প্রথমে সন্দীপনের একটা লেখা পরে তার প্রতিবাদে বাসুদেব দাশগুপ্তর চিঠি। এ ব্যাপারে অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও কিছু বক্তব্য ছিল। সেটি লিপিবদ্ধ করে যথাস্থানে পাঠাই। কিন্তু কোনো কারণে সেটি ছাপা হয়নি। একটা ক্ষোভ ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈগল প্রকাশ করে দ্বিতীয় সংখ্যাতেই (এপ্রিল/১৯৭৭) সম্প্রতিতে (এপ্রিল/১৯৬২) প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি রচনা (যা আমার ধারণা হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছে) ও কৃত্তিবাসে অপ্রকাশিত সেই চিঠিটি পাশাপাশি ছাপিয়ে দিলাম। হাংরি

সম্পর্কে আমার প্রাথমিক মনোভাব ওই প্রতিবাদ-পত্রটির মধ্যেই আছে। স্থানাভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মূল রচনাটি বাদ দিয়ে আমার চিঠির প্রয়োজনীয় কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম।

একটি অপ্রকাশিত চিঠি

[.....প্রায় বছরখানেক আগে কৃত্তিবাস মাসিক পত্রিকায় পত্রযোগে কিছু বিতর্ক হয় এ-ব্যাপারে অশোক চট্টোপাধ্যায়েরও কিছু বক্তব্য ছিল, পত্রাকারে তা লিপিবদ্ধও হয়েছিল কিন্তু কোনো কারণে সেটি প্রকাশিত হয়নি। সেই চিঠিটি অবিকল (এখানে আংশিক) উদ্ধৃত হল। এখন এই চিঠি কোনো বিশেষ পত্রিকা সম্পাদকের প্রতি নয়, পাঠক সাধারণের প্রতি উদ্দেশিত এই রকম বিবেচনা করাই ভালো।—সম্পাদক]

মাননীয়েষু,

কৃত্তিবাসের বৈশাখ সংখ্যায় হাংরি জেনারেশনের জন্মকথা বিষয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে বাসুদেব দাশগুপ্তর চিঠি পড়লাম। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় অনবধান বশত লিখেছিলেন—

"বোধ হয়তো ১৯৫৮ সালেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' গল্পটি ছাপা হয়েছিল সম্প্রতি নামে তৎকালীন এক ছোট পত্রিকায়। এই গল্পটির নাম থেকেই তথাকথিত হাংরি জেনারেশনের সুরু হয়েছিল।....."

এর জবাবে বাসুদেববাবু লিখেছেন—"মনে হয় সন্দীপনবাবু তাঁর অজ্ঞতা থেকেই এইসব কথা লিখেছেন। এর পর তিনি পাঁচ দফা তথ্য পেশ করেছেন। লিখেছেন—গল্পটির নাম ছিল 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' প্রকাশিত হয়েছিল ছোটগল্প নামক পত্রিকায় ১৯৬৩ সাল-এ। আর মলয় রায়চৌধুরী ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি জেনারেশন আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯৭২-এ। 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' গল্পটি প্রকাশিত হবার আগে নানা ধরনের লেখা দিয়ে হাংরি জেনারেশনের বেশ কিছু লিফলেট ও প্যামফ্লেট বের হয়ে গিয়েছিল। এর কয়েক মাস বাদে ঐসব লেখার দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়েই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি নামে পত্রিকায় আত্মক্রীড়া নামে গল্পটি লিখেছিলেন। কলমের ডগায় সম্প্রতি পত্রিকার নামটি এসে যাওয়ার কারণ বোধ হয় এই।"

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য নিবেদন করি। হ্যাঁ, ঠিকই, সম্প্রতিতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কোনো গল্প প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি তৃতীয় সঙ্কলনে (এপ্রিল / ১৯৬২তে) 'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' এই নামে তাঁর দুটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ওই সঙ্কলনেই পুস্তক সমালোচনা বিভাগে অশ্রুকুমার সিকদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আলোচকদের সঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিনয় মজুমদারের 'গায়ত্রীকে' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রকাশিত হয়। বিনয়ের 'গায়ত্রীকে' আলোচনায় শক্তি শিরোনাম ব্যবহার করেন—'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব। হাংরি জেনারেশন' ঠিক এভাবেই লেখাটি ছাপা হয়। এর আগের বা পরের কোনো ঘটনা আমার জানা নেই। কিন্তু মুদ্রিত আকারে হাংরি জেনারেশনের এটাই

প্রথম প্রকাশ এতে কোনো সন্দেহ নেই। পাঠকরা অবশ্যই লক্ষ করবেন শুধু নামকরণেই নয়, আন্দোলনের মূল পরিকল্পনা ও তাত্ত্বিকতাও এই রচনায় আছে।
এই সঙ্কলন প্রকাশের অব্যবহিত পরেই কিছু কিছু জল্পনা কল্পনার কথা কানে আসে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আরো দু-একজনের কাছে শুনি। হাংরি জেনারেশন নামে একটা দল এবং পুরো আন্দোলন চালু হবে—এইসব। এর প্রায় মাসাধিককাল পরে আমার ঠিকানায় ডাকে একগুচ্ছ কাগজ আসে।—হাংরি জেনারেশনের প্রথম ইস্তাহার। সাধারণ হোয়াইট প্রিন্ট কাগজে ডিমাই $\frac{1}{8}$ সাইজে ১০ পয়েন্ট ইংরাজি টাইপে ছাপা স্বাক্ষর ও তারিখহীন এই ঘোষণা প্রায় হ্যান্ডবিলের মতোই। হুবহু তুলে দিচ্ছি :—

Satadru Ghosh Lane
Calcutta

Led rebelliously by Shakti Chattopadhyay and creatively named by Malay Roy Chowdhury Hungry Generation is an Indian movement or tendency whose forebearers are Hercules, Grunewald, later Ramkinkar, Kafka, Jibanananda, Garcia Lorca and to some extent Spengler. Absolute Surrealism on the one side and meddledialectics on the other would be logical points of departure from this movement, as its desparate desire is to jump out of the shadow into the sun.

ব্যাস, ছোট গল্পেতে 'ক্ষুব্ধকাতর আক্রমণ' কিংবা সম্প্রতিতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের 'আত্মক্রীড়া'র প্রকাশ এসব অনেক পরের ঘটনা।
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এখন এসবের থেকে অনেক দূরবর্তী এবং তিনি পুরোপুরি স্মৃতির ওপর নির্ভর করেছেন বলেই তাঁর লেখায় হাংরি উদ্ভবের মূল ঘটনা ঠিক থাকলেও তথ্যের কিছু হেরফের হয়ে গেছে। কিন্তু বাসুদেব এমন ভুল করলেন কী করে! তিনি তো মূল আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন, দরকারি কাগজপত্রও নিশ্চয়ই হাতের কাছে আছে। সম্প্রতিতে ওই ধরনের কোনো লেখাই প্রকাশিত হয়নি এমন ইঙ্গিত তাঁর লেখায় স্পষ্ট। কোনো আন্দোলন বা যে কোনো কিছুই সম্প্রতি বা অন্য কোনো কাগজে শুরু হতেই পারে বা না হতেও পারে, তাতে বেইজ্জত হওয়ার কী আছে! তা গোপন করারই বা কারণ কী?
.....যে যাই বলুক, ওই সময়ে ওই সবের বেশ কিছু রচনা বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। দেবী রায়, প্রদীপ চৌধুরী বা শৈলেশ্বরের কবিতা বেরিয়েছিল আলাদা আলাদা ভাবে বুলেটিনের আকারে ইংরাজিতে। বাংলায় মলয় রায়চৌধুরীর আমার অমীমাংসিত শুভা 'বেশ চমকে' দেওয়ার মতো। একটি বুলেটিনে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ও অন্য একটিতে বিনয় মজুমদারের কবিতা বেরিয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হল, হাংরি উদ্ভবের ব্যাপারে আমার বক্তব্যের পাশাপাশি প্রায় সমান্তরাল আরও কিছু তথ্যের উপস্থাপনা। বাসুদেবের কথা আগেই উল্লেখিত হয়েছে। উত্তম দাশ তাঁর বইয়ে লিখছেন, সদ্য তরুণ মলয়ের পাটনার বাড়িতে গিন্‌স্‌বার্গের আগমন (১৯৬১), চসারের 'In the sowre hungry time' পংক্তির প্রভাব ও অসওয়াল্ড স্পেংলারের সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বিষয়ক কনসেপ্টের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে মলয়েরই মাথায় হাংরি জেনারেশনের বীজ প্রথম উপ্ত হয়।

"এই সময়ের প্রতিক্রিয়া দাদার বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে জানালেন তিনি। শক্তিও তখন পাটনায়। শক্তি উৎসাহিত হলেন। উৎসাহ দিলেন। কিন্তু শক্তি কলকাতা ফিরেই সম্প্রতি পত্রিকায় লিখলেন 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' মলয়ের পরিকল্পনার প্রথম ভাষ্য। আর সময় নষ্ট সুবিধের মনে হল না তাঁর। দাদার বন্ধু শক্তিকে নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করে ১৯৬২-র এপ্রিলে বের করলেন 'হাংরি জেনারেশন' তিন কলমে ডবল ক্রাউন ১/৮ কাগজের এক পৃষ্ঠার ছাপা বুলেটিন। বর্জাইস টাইপে ছাপা হলো—স্রষ্টা : মলয় রায়চৌধুরী। নেতৃত্ব : শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : দেবী রায়....."

এখন দেখা যাচ্ছে, সম্প্রতিতে প্রকাশিত শক্তির যে রচনার কথা আগে বলেছি তার উল্লেখ শুধু বাসুদেব ছাড়া সকলের লেখাতেই আছে। কিন্তু রচনার নাম ও কাল সম্পর্কে একজনের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। আর প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে কারোর সঙ্গে কারোরই মিল নেই। সন্দীপন বলেছেন **১৯৬৮-তে** শক্তি **'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' গল্পটি** সম্প্রতিতে লেখেন। তার প্রতিবাদে বাসুদেব বলেছেন সম্প্রতিতে নয় শক্তির গল্প ছাপা হয় 'ছোটগল্প'তে—নাম, 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ', সম্প্রতিতে সন্দীপনের 'আত্মক্রীড়া' প্রকাশিত হয়। আবার উত্তমের ভাষ্য অনুযায়ী—মলয় মূলে পরিকল্পনার কথা শক্তিকে বলার পর শক্তি কলকাতায় ফিরে সম্প্রতিতে **'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ'**, মলয়ের পরিকল্পনার প্রথম ভাষ্য প্রকাশ করেন। এবং মলয় দাদার বন্ধু শক্তিকে নেতা করে হাংরি জেনারেশন প্রকাশ করলেন **১৯৬২ এপ্রিলে**। এটি—১৯৬২ এপ্রিল শুধু আপত্তিকরই নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ মলয়ই আগে বলেছেন, তাঁর পরিকল্পনা শক্তি সম্প্রতিতে প্রকাশ করার পরই মলয় হাংরি প্রকাশে তৎপর হন। ১৯৬২ এপ্রিলে শক্তি প্রথম হাংরি জেনারেশন বিষয়ক প্রস্তাব লেখেন। সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই হয়তো যতদূর সম্ভব (অন্তত মাস চারেক) সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। ওই সময়ের কোনো হাংরি বুলেটিনে অন্তত এই সময়ের উল্লেখ নেই। তখন যাঁরা লিখতেন এবং এখনও লিখছেন তাঁরা আমার কথার যাথার্থ্য বুঝবেন। আমি যা জানি এবং প্রয়োজনে মুদ্রিত প্রমাণ পেশ করতে পারি—শক্তি সম্প্রতি ১৯৬২ এপ্রিল সংখ্যায় 'ক্ষুৎকাতর যৌনকাতর নয়' নামে দুটি কবিতা লেখেন। (সন্দীপন যা '১৯৬৮' ও 'গল্প' উল্লেখ করেছেন)। ওই একই সংখ্যায়, বিনয় মজুমদারের গ্রন্থ সমালোচনায় শক্তি শিরোনাম ব্যবহার করেন 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব / হাংরি

জেনারেশন।' হাংরি জেনারেশন বিষয়ক তাত্ত্বিকতাও এটিতে ছিল। সুতরাং এটিই সম্ভবত উত্তম তথা মলয় কথিত হাংরি-বিষয়ক মলয়ের পরিকল্পনার মূল ভাষ্য যেটি শক্তি মলয়ের মুখে শুনে কলকাতায় ফিরে **'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ'** নামে প্রকাশ করেন।

॥ নয় ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে সম্প্রতিতে প্রকাশিত শক্তির রচনাটি এড়িয়ে যাওয়ার ও এটির গুরুত্ব-হীনতা প্রতিপাদনের প্রবণতা। বাসুদেব সম্প্রতিতে সন্দীপনের আত্মক্রীড়া প্রকাশের কথা জানেন অথচ মাত্র পাঁচ-ছ' মাস আগে প্রকাশিত শক্তির রচনার কোনো উল্লেখই করেন না। আবার মলয় সম্প্রতিতে প্রকাশিত শক্তির রচনার কথা জানেন অথচ রচনার সঠিক নাম জানেন না। দাদার যে বন্ধু তাঁর পরিকল্পনা আত্মসাৎ করে একটি আন্দোলনের প্রবর্তকের দাবিদার তাঁকেই নেতা করে ওই একই আন্দোলনের সূত্রপাত করা এবং দীর্ঘদিন আন্দোলনের নানা পুস্তিকা ও বুলেটিনে তাঁর আদর্শ ও রচনার প্রচার করাও বিস্ময়কর! আবার নিজে সম্পূর্ণত একটি আন্দোলনের সূচনা করে থাকলে, তার নেতৃত্বে থেকে নিজের নামের মাথায় সদ্য তরুণ সাহিত্যে প্রায় অপরিচিত এক অনুজ কবিকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেওয়া শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে কতটা সম্ভব সেটাও ভেবে দেখার মতো কথা। মলয়ের কথাগুলি উত্তমের বই থেকেই নেয়া এবং উত্তম স্বীকার করেছেন বইয়ের যাবতীয় তথ্য মলয় প্রমুখ হাংরি বন্ধুদের কাছেই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আমার ধারণা, এখানে কেউ বা কেউ-কেউ পরিকল্পিতভাবে প্রকৃত সত্য গোপন করছেন। শক্তি মলয়ের পরিকল্পনা আত্মসাৎ করেছেন, করতেই পারেন। এ রকম হামেশাই ঘটে, অসম্ভব কিছু নয়। আবার শক্তি যেহেতু পরবর্তীকালে সতীর্থদের ডুবিয়ে দিয়ে হাংরি ত্যাগ করেছেন, তার জন্য এদের একটা ক্ষোভ ও সেইজন্যই শক্তিকে অস্বীকার করার এত উৎসাহ এর মধ্যে কোনটা সত্য তা জানার আর উপায় নেই। কেননা বিতর্কের এই পরিস্থিতিতে কেউই সত্য প্রকাশ করবেন না। আমাদের দেশে সে রেওয়াজ নেই। এখন নথিপত্রের সাক্ষ্য প্রমাণ দেখে পাঠক ও সমালোচকদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আমার বিবেচনায়—১৯৬২ এপ্রিলে সম্প্রতিতে শক্তির রচনা প্রকাশ তা কারো পরিকল্পনা বা প্রেরণায় হলেও হতে পারে। ১৯৬২ জুন-জুলাইয়ে ছোটগল্পতে শক্তির-গল্প 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' এবং ১৯৬২ অক্টোবর-নভেম্বর-এ হাংরি জেনারেশন বুলেটিনের প্রথম প্রকাশ। ঘটনাগুলি এভাবেই ঘটেছিল। তবে এটা সত্য হলেও মলয়ের মূল অভিযোগ—মলয়েরই প্রাথমিক পরিকল্পনা শক্তি নিজের নামে সম্প্রতিতে প্রথম প্রকাশ করেছেন—তার সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। কেননা মলয়ের অভিযোগ একাধিকবার মুদ্রিতভাবে প্রকাশিত হলেও শক্তি কখনও কোথাও তার কোনো প্রতিবাদ জানিয়েছেন এমন খবর আমার জানা নেই।

উপরের অংশে ছোটগল্পতে শক্তির লেখা ও হাংরির প্রকাশকাল আমার-স্মৃতি ও

অনুমান থেকেই বলছি। ছোটগল্পের নির্দিষ্ট সংখ্যাটি আমার সংগ্রহে নেই। আর হাংরির প্রথম বুলেটিনে কোনো প্রকাশকাল ছিল না। স্মৃতি থেকে বলতে পারি, সম্প্রতিতে শক্তির লেখা প্রকাশের পরই জানতে পারি ছোটগল্পতে শক্তি অনুরূপে ক্ষুধা সংক্রান্ত একটি লেখা লেখেন যেখানে গল্পের নায়ক হাওড়ার ব্রীজও খেয়ে হজম করে ফেলছে, ইত্যাদি। লেখাটি আমি পড়িওনি। কিন্তু এই লেখাটির নাম বাসুদেব ও মলয় দু-জনের কথাতেই আছে। এ ধরনের কৌতুককর লেখার একটা স্মরণীয়তা চিরকালই থাকে সেই জন্যই হয়তো আমার স্মৃতিতে এটা স্পষ্ট এখনও। এ লেখা মুদ্রিত হলে উদ্দিষ্ট ছোটগল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত লেখকরা আমার সপক্ষে বা বিপক্ষে তথ্যপ্রমাণ পেশ করলে আমরা সবাই উপকৃত হব। এ ছাড়া মলয়ের লেখাতেও উল্লেখিত আছে সম্প্রতিতে শক্তির রচনা প্রকাশ যার নাম ভ্রমবশত ছোটগল্পে প্রকাশিত গল্পের নাম বলে জানিয়েছেন। এবং এই সবের পরেই আর কাল বিলম্ব না করে ১৯৬২-তেই তিনি হাংরি প্রকাশ করলেন।

হাংরি জেনারেশনের উদ্ভবের এই বিতর্ক ও বিভ্রান্তিকে এড়িয়ে যদি এই আন্দোলনের গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিতে চাই, তাহলে বলতে হবে হাংরি কবি ও গল্পকাররা অধিকাংশই ছিলেন মূলত রোমান্টিক। এঁদের তাত্ত্বিক ধারণা ছিল—'কবিতা এখন জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। ছন্দে নয় কবিতা লেখা হবে গদ্যে।' এছাড়া কিছু দার্শনিকতা ও অতিদার্শনিকতা—যেমন কবিতা আত্মিক। 'এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মত স্বতঃস্ফূর্ততায়।' যাই হোক, মোট কথা, হাংরিদের রচনা চরিত্রে রোমান্টিক ও দার্শনিকতাধর্মী। প্রকরণে গদ্য ছন্দের ব্যবহার ও ছেদ চিহ্নের প্রায় লোপ বা অতি সীমিত ব্যবহার। আঙ্গিকের এই সরলীকরণ ও সরাসরি প্রয়োগ শ্রুতির ইস্তাহারেও আমরা পেয়েছি। এবং আধুনিক সাহিত্যে এটি প্রকরণ হিসেবে খুবই সার্থক ও ফলপ্রদ তা পরবর্তীকালে এক ব্যাপক চর্চা ও প্রয়োগের দ্বারাই স্বীকৃত হয়েছে।

এর সঙ্গে ছিল, এঁদের প্রচারিত সর্বাধিক বিতর্কিত ও সর্বাপেক্ষা উৎকটভাবে প্রকটিত ও সমালোচিত বৈশিষ্ট্য বিশেষ সংস্কৃত যৌনগন্ধী শব্দের ব্যবহার। এঁদের কিছু যুক্তি ছিল। সেটা পরে আলোচিত হবে। এখন, এই যৌনতা ও কৌতুক এই দুটিই ইদানীংকালে বাণিজ্যিক সাহিত্যের প্রধানতম উপাদান রূপে স্বীকৃত। যে কোনো বাণিজ্যসফল সাহিত্য ও বাণিজ্যিক সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে এ দুয়ের সহযোগে সাফল্য অবধারিত বলে গণ্য হয়। এখানে এই দুই উপাদান আলাদাভাবে নয় মিশ্রিত অবস্থায় ছিল—'কৌতুকময় যৌনতা'ই ছিল হাংরির আকর্ষণ। এ আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য মধ্যবিত্ত আধাশিক্ষিত সাহিত্য পাঠকের কাছে। এই আধা বাণিজ্যিক ব্যাপারই ঘটেছিল হাংরি আন্দোলনে উদ্যোক্তাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এর দ্বারা তাঁদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাও হয়েছে আশাতীত।

এঁদের যুক্তি ছিল, বাস্তবতার প্রকাশ। বাস্তবতার প্রয়োজনে কোনো শব্দই অব্যবহার্য নয়—'থুতুকে আমরা থুতুই বলব, অধর রস বলার ন্যাকামি নয়।' কিন্তু এখানে প্রশ্ন

উঠতে পারে—তবে ওইসব লিঙ্গ, যোনি, অরগ্যাজম প্রভৃতি তৎসম ও বিদেশি শব্দের আড়াল কেন! ওই সব শব্দের আরো বাস্তব লৌকিক প্রতিশব্দ তো আছেই। এখনো গ্রামে বা শহরে রিক্সাওলা ঠেলাওলারা সেগুলি স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করে। বাস্তবতার প্রয়োজনে ওই সব শব্দ ব্যবহারের ভীতি বা অনীহা প্রমাণ করে তাঁরাও পুরোপুরি ন্যাকামি মুক্ত ছিলেন না। অথবা এভাবে বাস্তবতা চর্চায় শিল্পেরই বারোটা বেজে যাবে। যত্র-তত্র প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে এই সব শব্দের ব্যবহার—শব্দগুলোকে পরিকল্পিতভাবে প্রায় গুঁজে দেয়ার হাংরি প্রবণতাকে সে সময় তাই অনেকেই সংগত কারণে গিমিক বলে চিহ্নিত করেছেন। যার দ্বারা শর্ট কাট পদ্ধতিতে দ্রুত একটা প্রচার প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা পাওয়া যায়।

তাছাড়া এই অর্ধোচ্চারিত ও অবগুণ্ঠিত অশ্লীল তথা বাস্তবতার চর্চাও শুরু হয়েছে হাংরির অন্তত পাঁচ বছর আগেই পঞ্চাশের কবি লেখকদের দ্বারাই। সম্প্রতির প্রথম সংখ্যাতেই (১৯৬১) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ভালবাসা' কবিতাটি প্রকাশে সে সময় তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল কবিতাটিতে 'পোঁদে' শব্দের ব্যবহার নিয়ে। এ ছাড়াও তাঁর দু-তিন বছর আগে থেকেই যোনি, লিঙ্গ, সঙ্গম প্রভৃতি শব্দ আকছার ব্যবহৃত হয়েছে শক্তি সুনীল বিনয় সন্দীপন প্রভৃতির রচনায়, সেই কারণেই এই লেখার প্রথমাংশে উল্লেখ করেছি—ষাটের কবিতায় পঞ্চাশের চোরা স্রোতও অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ ব্যাপারে শুধুমাত্র হাংরিদেরই দোষ দিয়ে লাভ নেই, হাংরি-অহাংরি নির্বিশেষে ষাটের অধিকাংশ তরুণ কবিই পঞ্চাশের হৈ-হুল্লোড় ভরা আবেগী কবিতার দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছে।

তা সে যাই হোক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এই হাংরি আন্দোলনই ষাটের সব চেয়ে বেশি আলোচিত ও বিতর্কিত সাহিত্য আন্দোলন। এই আন্দোলন নিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই কোর্ট কাছারি উত্তেজনা হয়েছে এমন নয়, বহির্বঙ্গে প্রায় সারা ভারতে এমনকি বিদেশের সংবাদপত্র ও লেখক মহলেও আলোড়ন জেগেছে—তা সে যেমন ভাবেই হোক। প্রশ্ন উঠবে, কেন? ও কীভাবে? হঠাৎ কবিতার মতো নির্দোষ ও নিরীহ একটা বিষয় নিয়ে আইন—পুলিশ ও প্রশাসন সবাই এত তৎপর হল কেন? বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, হাংরি নথিপত্র উদ্ধার, গ্রেপ্তার, জেল, হাজত, আদালত! গত তিরিশ বছরে প্রশাসনে এমন কিছু পরিবর্তন আসেনি। কলকাতায় কত কী হয়, রীতিমতো পর্নোগ্রাফি পুলিশের নাকের ডগাতে বিক্রি হয় এখন এবং তখনও। এসব নিয়ে এত উত্তেজনা কখনো চোখে পড়েনি। হাংরি নিয়ে এসব হল কেন? কী ছিল এ সবে? কিছু রোমান্টিক গল্প কবিতা ও ঘোষণা—যার মধ্যে ছড়ানো ইতস্তত কিছু যৌন শব্দ তৎসম ও বিদেশি শব্দে—তাও আবার যে বাক্যে আশ্রিত সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার অন্বয় ও অর্থ উদ্ধারই দুরূহ। তাও ছাপা হয় দু-তিনশো কপি, পড়ে দলীয় বা ওই মতাদর্শে আগ্রহী কতিপয় ছেলে-ছোকরারা।

এর দ্বারা জনরুচি দূষিত হবে, পুলিশ তৎপর হবে এমন কথা ভাবাই কষ্টকর। তবু এটাই সে সময়ে ঘটেছিল। তাই···কেন?

আসলে ওই আধো-আধো নুনু বা হিসি মার্কা অশ্লীলতা কিংবা শিশ্ন, শীৎকার বা অরগ্যাজম জাতীয় শব্দের প্রতিক্রিয়ায় নয়, হাংরি লেখকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগই পুলিশকে সক্রিয় হতে বাধ্য করেছিল। প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লোভে তাঁরা বাণিজ্যিক লেখক বা রাজনৈতিক নেতাদের কায়দাতেই দিনের পর দিন পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তা ও সমাজের প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের (হাংরি ব্যাখ্যায় এঁরা সকলে প্রতিষ্ঠিত নিয়মতান্ত্রিক ধারণার ও বাণিজ্যিক সাহিত্যের পোষক বলেই এই ক্ষোভ) নানাভাবে চিঠি, টেলিফোন, প্রচার পুস্তিকার দ্বারা অপমান ও উত্যক্ত করেছেন। এই তালিকায় আছেন—তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, পুলিশ কমিশনার দেবী রায় (ওই সময়ই হাংরি বুলেটিনে সম্পাদক বলে উল্লেখিত দেবী রায় হারাধন ধাড়া থেকে এফিডেভিট করে দেবী রায় হলেন কমিশনারকে ব্যঙ্গ করার জন্যই), এছাড়া ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, আবু সয়ীদ আইয়ুব প্রমুখ। এঁদের কাছে ছাপানো চিঠিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল—কলকাতার সাঁওতালি যুবতী রমনীর নগ্ন বক্ষের প্রদর্শনী দেখার জন্য, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, অবিবাহিত তিনি কীভাবে যৌনজীবন যাপন করেন। পুলিশ কমিশনারের স্ত্রীর ঠিকমতো অরগ্যাজম হয় কিনা। ইত্যাদি। স্বভাবতই এসব নিয়ে আলোড়ন হয়েছে। সংবাদপত্রে রচনা প্রকাশ পেয়েছে। হাংরিদের প্রায় সব বন্ধুই সাংবাদিক। সে সব সংবাদের কাটিং বহির্বঙ্গে বা বিদেশে পাঠাতেও দেরি হয়নি। এঁরা প্রচার চেয়েছিলেন খুবই পরিকল্পিতভাবে। এবং পেয়েওছিলেন অনেকটাই। হাংরি আন্দোলনকারীরা ভালভাবে প্রথম থেকেই জানতেন শুধু লিখে আর বুলেটিন ছাপিয়ে আন্দোলন হয় না। বাস্তবতার চর্চা তাঁরা ভালভাবেই করেছিলেন।

তরুণ লেখক শিল্পীদের প্রচারের বাসনা ও তার জন্য কিছু কৃচ্ছ্রসাধনা ও উল্টোপাল্টা ব্যবহার সব যুগেই হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম দশকেই ফরাসি দেশে স্যুররিয়ালিস্ট লেখক শিল্পীরা অনেক কাণ্ড করেছেন। বাংলা সাহিত্যের অন্তত তিরিশ ও পঞ্চাশ দশকে যথেষ্ট উদ্দামতা দেখা গেছে। তাঁরা প্রচলিত ও স্বাভাবিক সাহিত্যরুচির বিরুদ্ধে অনেক উত্তপ্ত লেখা লিখেছেন, পঞ্চাশের কবিরা তো এ সবের সঙ্গে মহাজনদের ব্যঙ্গ করে বা নিজেদের নিগৃহীত করেও ইমেজ তৈরির চেষ্টা করেছেন। মদ খেয়ে পুলিশের সঙ্গে মারামারি—লক-আপে রাত কাটানো বা ওয়েলিংটনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা সবেরই কথা বলা যায়। ছয়ের দশকে শ্রুতি ও এই দশকের রচনারীতি বা স্লোগানও ওই তারুণ্যের আত্মঘোষণা ছাড়া কিছু নয়। একবার গিনসবার্গও নাকি আমেরিকায় তাঁর Howl কবিতার অর্থ বোঝাবার জন্য কোনো মঞ্চে উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বলেছিলেন—see the meaning! কিন্তু এসব কোনো কিছু নিয়েই কোনোদিন এতদূর ঝামেলা ও গণ্ডগোল হয়নি। হাংরিদের

ক্ষেত্রে হল কেন? কারণ আগেই বলেছি, হাংরি সদস্যরাই এই আইনি বিতর্ককে আমন্ত্রণ ও পুষ্ট করেছেন। ক্ষমতাসীন লেখকরা ও নেতৃবৃন্দ চক্রান্ত করে এসব করেছে এ সম্পূর্ণ বাজে কথা। পরীক্ষাশীল কিছু তরুণ লেখকদের কিছু আস্ফালন ও চীৎকার চেঁচামেচির দ্বারা এঁদের কিছুই এসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

॥ দশ ॥

হাংরি পঞ্চাশেরই সন্তান এবং এটা কোনো আন্দোলন নয়, নেহাৎ বিদ্রোহ—প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে নতুন সাহিত্যের সূচনা সব সাহিত্য আন্দোলনেরই কথা। কিন্তু তার জন্যে তো রসদ দরকার। খালি পেশী আর লাঠি-সোটা এবং কিছু ভাবাবেগ দিয়ে কামান বন্দুকের মোকাবিলা করার চেষ্টা অর্থহীন হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়। হাংরি আন্দোলনও একই রকম—সাঁওতাল বিদ্রোহ বা বড়জোর নকশাল আন্দোলনের সমগোত্রের ব্যর্থ আন্দোলন। যদিও এসব ব্যর্থতারও কিছু না কিছু মূল্য থাকেই। কিন্তু ওইসব বিদ্রোহীর অভীপ্সিত লক্ষ্য ও দাবির পক্ষে তা যৎসামান্য।

একবার শঙ্খ ঘোষ হাংরিদেরই একটি পত্রিকায় প্রায় এই ধরনেরই—হাংরিদের সঙ্গে নকশালদের ব্যর্থ আন্দোলনের তুলনা করে কিছু লিখেছিলেন। সাতের দশকে হাংরি জেনারেশন নামে প্রকাশিত এই পত্রিকাই সম্ভবত শেষ হাংরি কাগজ। পত্রিকাটি চলন্ত ট্রেনে আমাকে দিয়েছিলেন হাংরির বিশিষ্ট গল্পকার সুভাষ ঘোষ। তখন হাংরি সর্বঅর্থেই স্তব্ধ। পরের সংখ্যাটি স্টলে দেখে কিনে নিলাম। দেখি, আগের সংখ্যায় শঙ্খ ঘোষের লেখার প্রতিবাদ করে একটি নতুন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের নাম মনে নেই। সেখানে দেখি, আগের লেখার জন্যে শঙ্খ ঘোষকে অতি কদর্য ভাষায় (অবশ্যই সংস্কৃতে) খিস্তি করা হয়েছে। এমনকি এক জায়গায় অণ্ডকোষ চুলকোনোর কথাও ছিল।—পড়ে মনে হল একে শঙ্খ ঘোষ তায় 'নিজস্ব অণ্ডকোষ কণ্ডুয়ন' করার কথা!—পড়েই হয়তো উনি—হা রবীন্দ্রনাথ! বলে অজ্ঞান হয়ে যাবেন। আমার কষ্ট হল, রাগও হল। আন্দোলন বা আন্দোলনের কাগজ তো আমরাও করেছি। কিন্তু একজন অগ্রজ সম্মানীয় লেখককে আহ্বান করে খোশামোদ করে লেখা নিয়ে, সেই লেখা নিজেদের মনোমতো না হওয়ায় তাঁকে সমালোচনাও নয়, নিতান্ত গ্রাম্য ভঙ্গিতে অপমান করা কী ধরনের সাহিত্য আন্দোলন! আমি একটি দীর্ঘ প্রতিবাদ-পত্র লিখলাম। সাহিত্যাদর্শে আমি শঙ্খ ঘোষের অনুসারী নই। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ হিসেবে ও প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে তিনি আমার শ্রদ্ধাভাজন। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা আদর্শের।

কৃত্তিবাস পত্রিকায় চিঠি পাঠানোর অভিজ্ঞতা ও বন্ধুদের পরামর্শে এ চিঠি শেষ পর্যন্ত আর হাংরি কাগজে পাঠাইনি। সেই সময়েই মাস কয়েকের মধ্যে, যজ্ঞেশ্বর রায় তাঁর প্রকাশিতব্য পত্রিকা চিল-এর জন্য সাম্প্রতিক কবিতার উপর দীর্ঘ একটি রচনা চাইলেন। দু কিস্তিতে প্রকাশিত ওই লেখায় আমি এই প্রসঙ্গ সাধ্যমতো ব্যবহার করেছি। কিন্তু এত খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ সেখানে ছিল না। এখন নিশ্চয়ই বলব—

সমালোচনায় এত বিচলিত হওয়া বা প্রতি-আক্রমণের এই উগ্রতা নিজেদের সাহিত্য-ভিত্তির দুর্বলতা আত্মবিশ্বাসের ও সাহিত্যরুচির অভাব ছাড়া সম্ভব নয়।

আন্দোলন হিসেবে হাংরি যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, এই আন্দোলনের প্রভাব পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে বিন্দুমাত্র নেই। হাংরির ওই উচ্চকণ্ঠে চিৎকৃত শারীরিক কবিতা সম্পূর্ণভাবে উত্তরকালে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া, আন্দোলনের প্রধান লেখকরা অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় অথবা নীরব। কবিদের মধ্যে মলয়, শৈলেশ্বর, বা সুবো আচার্য বছরে দু-চারটি লেখা লেখেন। এদের মধ্যে দেবী রায় প্রায় নিয়মিত হলেও তাঁর লেখায় হাংরি ছাপ কোনো কালেই ছিল না। মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে আসা সদ্য তরুণ এক যুবক হারাধন ধাড়া কবিতা লেখালেখির তাড়নায় প্রায় ঘটনাচক্রে এই 'ং' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। দেবীকে সে সময়ে আমরা আড়ালে বলতুম পিয়নং অর্থাৎ হাংরির পিওন। যাবতীয় হাংরি বুলেটিন বা পত্র-পত্রিকা দেবী ওরফে হারাই পোস্টিং অথবা বিলি করত। দেবীর কবিতা বরাবরই হাংরির ভাল-মন্দ উভয় প্রভাব থেকেই মুক্ত এবং হয়তো সেইজন্যই দেবীই হাংরিদের মধ্যে একমাত্র ক্রিয়াশীল কবি।

কিছুদিন আগে শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে একজন প্রাক্তন হাংরি কবিকে দেখলাম। পরিচয় করিয়ে না দিলে উভয় পক্ষেরই চেনার কোনো উপায় ছিল না। প্রায় তিরিশ বছর পর দেখা। চেহারা চরিত্র সবই বদলে গেছে। আমি চমৎকৃত হলাম এই ভেবে, ক' বছর আগেই যে এবং যারা শঙ্খ ঘোষকে ওইভাবে গালাগাল ও অপমান করেছে আজ সেই এসে শঙ্খ ঘোষের প্রসাদ প্রার্থনা করছে। আর শঙ্খ ঘোষও সব ভুলে তাকে কোল দিয়েছেন। দেখলাম হাংরি কবি মাঝে মধ্যে চালাক কথাবার্তা বললেও বেশ বিনীত ও নম্র আর শঙ্খ ঘোষও নতুন আশ্রমবালকের প্রতি বেশ স্নেহশীল আচরণ করছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, হাংরিরা গুরুদ্রু ছাড়া চলতে পারে না আর শঙ্খ ঘোষেরও চ্যালা ছাড়া চলে না। হাংরিদের প্রথমে ছিল শক্তি সন্দীপনের মতো চরমপন্থী গুরুদ্রু এখন শঙ্খ ঘোষের মতো নরমপন্থী। শঙ্খ ঘোষের সম্বন্ধে আমার ধারণা, শ্রদ্ধাযোগ্য অনেক ব্যাপার থাকলেও তাঁর চরিত্রে জনপ্রিয়তার প্রতি একটা আকর্ষণ ও গুরুদ্রুগিরি করার একটা প্রবণতা বেশ কিছুদিন যাবত এসে গেছে। এখন প্রতি রবিবার (যখনই ক্বচিৎ রবিবার শঙ্খ বাবুর বাড়িতে গেছি) কিছু কিশোর কিশোরী কবিদের ভিড় ও আচার্যের ভঙ্গিতে শঙ্খ ঘোষের আনুকূল্য। অন্তত দশ পনের বছর আগেও শঙ্খ ঘোষের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় হয়েছে এ অভিজ্ঞতা তাদের পীড়িত করবেই। একি বয়সের দোষ নাকি আমাদেরই অজ্ঞতা ওই সব তরুণ মহাপ্রতিভাকে বুঝতে পারছি না।

হাংরিদের বর্তমান অবস্থা বোঝাতেই চেয়েছিলাম। মাঝে কিছু প্রসঙ্গান্তর হয়তো ঘটে গেছে। একথা বলতেই হবে, হাজার ব্যর্থতা সত্ত্বেও, ওই সময়ে, কিছু তরুণকে ঐক্যবদ্ধ করে ওই ধরনের একটা আন্দোলন সংগঠন ও দেশ-বিদেশে তাকে ছড়িয়ে দেয়া ও

সাহিত্য নিয়ে ওই ধরনের হৈ চৈ করার সাংগঠনিক দক্ষতার যে পরিচয় হাংরি লেখকরা দিয়েছিলেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয়। এই আন্দোলনের দেবী রায় ও সুবিমল বসাক এখনও লিখে চলেছেন। দেবীর কথা আগেই বলেছি। সুবিমল চরিত্রে বিপ্লবী ও মৌলিক লেখক। কিন্তু এটাকে ঠিক হাংরি ঘরানা বলে আমার মনে হয় না। সুবিমল এক নিজস্ব রীতিতে শুরু থেকেই লিখে আসছেন। সুবিমলের লেখা আমার কাছে খুবই আধুনিক ও আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। হাংরিদের কাগজে সুবিমল কিছুদিন কিছু লেখা লিখেছিলেন। সে সব কথাও হয়তো সুবিমল ও তাঁর পাঠকদের স্মৃতিমাত্র। সেভাবে বললে আমিও তো দু-একটা লেখা হাংরি কাগজে লিখেছি।

॥ এগারো ॥

হাংরি (১৯৬২-৭২), শাস্ত্রবিরোধী (১৯৬৫-৭৬), শ্রুতি (১৯৬৫-৭১) এই তিন আন্দোলনে শাস্ত্রবিরোধী শুরু হয়েছে 'এই দশক বুলেটিন (১৯৬২) থেকে এবং শ্রুতিরও উৎস ওই বুলেটিন। সুতরাং শাস্ত্রবিরোধী ও শ্রুতি প্রায় যমজ আন্দোলন, একটি গল্পের অন্যটি কবিতার। গল্প আন্দোলনের কাগজ এই দশক-এর মধ্যবর্ত্তায় যোগ দেন অমল চন্দ। এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি নিজের বৈশিষ্ট্য এবং যোগ্যতা প্রমাণ করেন। অমল তার পঁচিশ বছরের বেশি সাহিত্য জীবনে কখনো কোনো প্রতিষ্ঠানে স্থান পায়নি। সে চেষ্টাও করেনি। এখন ও প্রায় অবসৃত পাগল ও বাতিল লেখক। গত পাঁচ-বছরে পাঁচটিও লেখা লিখেছে কিনা সন্দেহ। অমলের প্রতিটি লেখাতেই চমক ও আবিষ্কার। প্রবন্ধের হাতও চমৎকার। সাতের দশকে গল্প লেখার ফাঁকেই প্রকাশ করল উপন্যাস—অভিযোগ (১৯৭২), এর সামান্য আগে পরে অতীন্দ্রিয়র উপন্যাস 'সেসে' প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে। বছর চার-পাঁচ পরে লেখা হল রমানাথের প্রথম উপন্যাস 'সাক্ষাৎকার' প্রথম পর্যায়ের ঈগলে ধারাবাহিক-ভাবে। পরে আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যায় 'ছবির সঙ্গে দেখা।' ইতিপূর্বেই বিভিন্ন পত্রিকায় এই সব লেখক পূর্ববর্তী উপন্যাসের সীমাবদ্ধতা ও আধুনিক উপন্যাসের আদর্শ নিয়ে কিছু লেখালেখি চালাচ্ছিলেন। এভাবেই শাস্ত্রবিরোধী ছোটগল্পের পাশাপাশি শাস্ত্রবিরোধী উপন্যাসেরও একটি আন্দোলনের সূত্রপাত হল। নাম—'ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো'। উদ্যোক্তা অমল চন্দ। সহযোগী অতীন্দ্রিয় পাঠক।

এই দশক শাস্ত্রবিরোধী পত্রিকা প্রকাশ হওয়ার পরই সমমনস্ক কিছু তরুণ গল্পকার আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সমকালীনদের মধ্যে অমল চন্দ, বলরাম বসাক ও সুনীল জানার নাম আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এঁরা ছাড়াও তরুণতর এক লেখক সম্প্রদায় সেই সময়ে নেপথ্যে এক নতুনতর রীতি নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই তরুণ লেখক সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন—আশিস মুখোপাধ্যায়, তাপস চৌধুরী, পার্থ গুহবক্সী, অমল দত্ত, চিরঞ্জয় চক্রবর্তী, তীর্থঙ্কর নন্দী, মনোজ চাকলাদার প্রমুখ। এঁদেরই সম্মিলিত

প্রয়াসে সাতের দশকে প্রথাবিরোধী রীতির একমাত্র গল্পপত্রিকা—'নতুন নিয়ম' প্রকাশিত হয় বোধ হয় ১৯৭৫-৭৬ সালে। ওই সময়ই প্রথম পর্যায়ের ঈগল বন্ধ হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্যোগ শুরু হচ্ছে। অবশেষে ১৯৭৭-এ অশোক চট্টোপাধ্যায়ের একক উদ্যোগে ঈগল দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈগল কোনো দলীয় মুখপত্র ছিল না, কিন্তু এটিতে দলেরই—এই দশক শ্রুতি নতুন নিয়ম প্রভৃতি পত্রিকার পরীক্ষাশীল নতুন লেখকদের লেখা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ও অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছাপা হত। যদিও প্রথম পর্যায়ের (কেবল সদস্যদের জন্য) কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ভেঙে পাশাপাশি ষাট-সত্তরের অন্যান্য লেখক এমনকি পঞ্চাশ বা চল্লিশের কবি লেখকরাও আমন্ত্রিত হয়েছেন। শক্তি সুনীল সন্দীপনের সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সন্তোষ কুমার ঘোষ বা বিমল করও এই পর্যায়ে লিখেছেন। আমি কাগজকে সম্প্রতির ঢঙেই বহুমুখী সাহিত্যাদর্শের একটা মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম আমরা যেমন অগ্রজদের সমালোচনা করেছি তেমনি তাঁদেরও বক্তব্য আমরা শুনব ও প্রয়োজনে সাহিত্যিক বিতর্কের সূত্রপাত হবে। কিন্তু লেখা কম বেশি ছাপা হওয়া, সমালোচনার বিরুদ্ধতায় অসহিষ্ণুতা নিয়ে দলপাকানো নানা নোংরামি ও অবাঞ্ছিত অবস্থার চাপে বিরক্ত ও বাধ্য হয়ে পত্রিকা বন্ধ করলাম।

১৯৮৪-৮৫ নাগাদ ঈগল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুটা আগে থেকেই, অমল চন্দের সম্পাদনায় ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো বুলেটিন তথা পত্রিকার প্রকাশ। এখানে বিভিন্ন সংকলনে প্রচলিত সাহিত্যের গল্প উপন্যাসের বিরুদ্ধে নানা প্রবন্ধ ও মৌলিক রচনার প্রকাশ হয়েছে।

ওই সব সংকলন বা বুলেটিনে এবং সামান্য পূর্ববর্তী নতুন নিয়মে নিয়মিতভাবে নতুনতম আঙ্গিকের গল্প উপন্যাসের প্রকাশ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনার দ্বারা পুরনো উত্তেজনা বা সম্ভবদ্ধতার কথা বাদ দিলে ষাটের ঐতিহ্যময় গদ্য ধারাটিরই যেন নবীকরণ ঘটল। ততদিনে এই দশক বন্ধ হয়েছে। প্রাক্তন সদস্যরা কেউ কেউ বাণিজ্যিক কাগজে ভিড়ে গেছেন, কেউ কালে-ভদ্রে লিখছেন, কেউ দু-এক বছর লেখার পর অতলে তলিয়ে গেছেন, কেউ বা তেমন সুবিধে করতে না পারলেও নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সব হাফ-বিপ্লবী পড়তি মাস্তানরা তখন মাঝে মধ্যেই ঈগল, নতুন নিয়ম বা ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো কিংবা এই ধরনের আরো দু-একটি কাগজে গত জন্মের চোঁয়া ঢেকুর তুলছেন এই অবস্থাতেই সাতের দশকে কিছু তরুণের প্রযত্নে শাস্ত্রবিরোধিতা তথা সাহিত্যে নতুনরীতি ও চিন্তাভাবনার চর্চা হয়েছে। এ সবই ষাটের আন্দোলনের পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া—শেষপর্বের কথা।

এছাড়া আলাদাভাবে বলতে হয় অতীন্দ্রিয় পাঠকের কথা। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর কৃতী ছাত্র এবং বর্তমানে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ-এর দক্ষ অফিসার শ্রীশ্যামল ধর অতীন্দ্রিয় পাঠক নামের আড়ালে প্রায় তিরিশ বছর যাবত লিখে চলেছেন। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ কবিতা সবেতেই তিনি সিদ্ধ হস্ত। ব্যক্তিগতভাবে আমি অতীন্দ্রিয়র কবিতা ও প্রবন্ধের

দীর্ঘকালের মুগ্ধপাঠক। তাঁর গল্প ও উপন্যাস বিষয়ে আমার কিছু সংশয় ও প্রশ্ন ছিল। লেখক আমি যেমনই হই, পাঠক হিসেবে অন্তত সাধারণের চেয়ে কিছু উঁচুতে এমন অভিমান ও দাবি আমার চিরদিনই ছিল এবং আছে। প্রথম দিকে অতীন্দ্রিয়র গল্প উপন্যাস প্রায় পড়তেই পারিনি। পাতায় পাতায় চিত্রকল্প ও চিত্রনাট্য। বস্তুত কবিতা চলচ্চিত্রের এমন মিশ্রণ আগে কোথাও পাইনি। এমন জটিল বিষয় ও আঙ্গিকে লেখা কমলকুমারের আগে আর কেউ চর্চা করেননি। অবশ্য ইদানীং অতীন্দ্রিয় আমার কাছে এতটা দুর্ভেদ্য মনে হচ্ছে না। তাঁর লেখা শেষ উপন্যাস—'বৃত্তমিছিলে মানুষেরা ও পবন সেন' আমি কষ্ট করে হলেও পড়ে উঠতে পেরেছি। এর দ্বারা অতীন্দ্রিয় ক্রমশ আমাদের মতো পাঠকের কাছে বোধ্য ও সহজগ্রাহ্য হয়ে উঠছেন না আমরাই ক্রমশ তাঁর লেখন রীতিকে বোঝার মতো শিক্ষিত হয়ে উঠছি তা বলা কঠিন।

ষাটের প্রায় শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখে যাওয়া ও সেই সঙ্গে সতীর্থ সমমনস্ক কবি লেখকদের অত্যাধুনিক দুরূহ রচনাবলি প্রকাশের উপযুক্ত পত্রিকার প্রকাশ—এই দ্বিবিধ কর্ম পূর্ণ যোগ্যতা ও সার্থকতার সঙ্গে পালন করার অনন্য কৃতিত্ব অতীন্দ্রিয় পাঠকের। পূর্ব আলোচিত কোনো সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থেকেও অতীন্দ্রিয় স্বয়ং এক তকমাহীন আন্দোলন। বোধ হয় ১৯৬৫-৬৬ সাল নাগাদ অতীন্দ্রিয় জ্ঞাতিভ্রাতা তপনলাল ধরের সঙ্গে যুক্তভাবে কালক্রম প্রকাশ করেন। পরে এককভাবে 'অব্যয়' ও শেষে আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের 'কালক্রম' (পুষ্কর দাশগুপ্তর সঙ্গে যুক্তভাবে) এবং আবার এককভাবে 'অব্যয়', এইসব প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগী লেখকরা ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। যে রচনা বাণিজ্যিক কাগজ তো দূরের কথা, অবাণিজ্যিক সাধারণ লিটল ম্যাগাজিনেও ছাপাতে কেউ উৎসাহী নয়, পাঠক হাজারে একজনও আছে কিনা সন্দেহ, সেই লেখা এবং সেই সব লেখা নিয়ে প্রচার-প্রবন্ধ-আলোচনা ছাপিয়ে কেউ কাগজ করছেন গাঁটের পয়সা খরচ করে কোনোরকম ফেরতের প্রত্যাশা না করে শুধু আদর্শের জন্য—এসব শুধু ষাটের লেখকদের পক্ষেই সম্ভব।

একইরকম প্রয়োজনেই ঈগল দ্বিতীয় পর্যায়ের বা নতুন নিয়ম বা ছাঁচ ভেঙে ফ্যালোর প্রকাশ। ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো প্রকাশনার প্রথম ও সম্ভবত একমাত্র প্রকাশনা—'বাংলা উপন্যাস ১৯৮৬'। সম্পাদনায় অমল চন্দ ও অতীন্দ্রিয় পাঠক। প্রত্যেকে একটি করে উপন্যাস লিখেছেন—অমল চন্দ, অতীন্দ্রিয় পাঠক, আশিস মুখোপাধ্যায় ও তাপস চৌধুরী। এটিই ষাটের লেখকদের ঘোষিত ও নামাঙ্কিত শেষ সাহিত্য আন্দোলন।

স্বভাবতই দেশের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত অধিকাংশ লেখক ও সম্পাদকদের দ্বারা এঁরা ধিক্কৃত ও অবজ্ঞাত হয়েছেন। ব্যতিক্রম হিসেবে শুধু নাম করা যায় প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ ও প্রবীণ শিবনারায়ণ রায়ের কথা। এঁরা বিভিন্ন সময়ে মৌখিক ও লিখিত

আলোচনায় এইসব পরীক্ষাশীল তরুণ প্রতিভাকে যথোচিত স্বীকৃতি ও সম্মান জানিয়েছেন।

উপরিউক্ত এই সব আন্দোলন ও পত্রপত্রিকা ছাড়াও কলকাতায় ও বহির্বঙ্গে অনেক পত্রিকা এবং গোষ্ঠীও নিজেদের আদর্শ ও সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্নভাবে সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রসারে সার্থক ভূমিকা নিয়েছেন। দুর্গাপুরে (অধুনালুপ্ত) নিম-সাহিত্য—নামের একটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সেই ষাটের মধ্যভাগেই এরকম একটি আন্দোলন স্বল্পকালের জন্য আলোড়ন জাগিয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে, ষাটের সাহিত্য আন্দোলনের ধারা—তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আরও দূর-বিস্তারী। সময়ের হিসেবে আন্দোলনের শেষ উপন্যাস সংকলন তো প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬তে। কিন্তু এই ১৯৯২ পর্যন্ত অব্যয়, মহাদিগন্ত, কৌরব, পিলসুজ, মানস ভূমি, অমৃতলোক, কার্তুজ এমনি আরো অজস্র স্বধর্মনিষ্ঠ চরিত্রবান লিটল ম্যাগাজিনে যে নতুন সাহিত্যের প্রস্তুতি প্রকাশ ও পৃষ্ঠপোষকতার আদর্শ তা ষাটের সচেতন সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে একই ধারায় যুক্ত বলেই আমার বিশ্বাস।□

সাহিত্য বিপণন

সুপর্ণ পাঠক

বই তখনও বিক্রি হতো—দোকানে, লেখক লিখতেন নিজের তাগিদে। বিক্রির অর্থে কারো গাড়ি হতো কারো বা হাঁড়ির হাল। ছিল বটতলা—তার অন্য তাগিদে নিয়ে। কিন্তু বই বিক্রি হতো পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী। বিজ্ঞাপন ছিল, ছিল বই বিক্রির চেষ্টাও। কিন্তু এখন জমানা হল বাজারের ব্যাগে বইয়ের—এক ব্যাগ 'ইনি' অথবা এক বাক্স 'উনি'র। ব্যাগের দরকারে বই না বইয়ের দরকারে ব্যাগ? বিক্রেতার কাছে এ প্রশ্ন অবান্তর। সে পণ্যের ব্যবসায়ী, বিক্রিই তার লক্ষ্য। ফলে কয়েক দশক আগেকার বইয়ের বাজারের সঙ্গে আজকের বইয়ের বাজারের অনেকটাই তফাত। তখন ছিল বিক্রির সমস্যা, আজ সমস্যা হল বাজারজাত করা। দাঁতের মাজন বিক্রির সঙ্গে বই বিক্রির আদতে পদ্ধতিগত কোনো পার্থক্য নেই। শুধু রকমফের আছে। সেদিনের বটতলা আজ উঠে এসেছে বহুতল বাড়িতে। হলুদ বইয়ের গায়ে এখন শোভন মোড়ক। যে পাঁচুর দুটি ভাতের জন্য হোর্ডিঙে প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি আঁকত আর ডালের ব্যবস্থা করত নগ্ন নারীর আভাস ফুটিয়ে, সে এখন অ-বাবু। তার বাহন মারুতি, পাঁচতারা হোটেল তার টিফিন খাওয়ার জায়গা। পাঁচুর ছবি আজ বইয়ের পাতায় শিল্প।

সাহিত্য আজ সাহিত্যিকের সম্ভার—কিন্তু প্রকাশকের সৃষ্টি। একটা সময় ছিল যখন সাহিত্যিক তাঁর প্রথম পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকদের দরজায়-দরজায় ঘুরতেন। ঘোরা-ঘুরির এই প্রচেষ্টায় হয়ত আকস্মিক সাফল্য জুটত কোথাও না কোথাও—লেখা তখন প্রকাশ হতো। সমালোচকের কৃপাধন্য হলে বিক্রি যেত বেড়ে। অন্যথায় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে লেখা ছাপাতে হতো। সাহিত্যিকের মৃত্যুর পরেও তাঁর সৃষ্টি গৃহীত হয়েছে—ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। কিন্তু সাহিত্যিক-প্রকাশকের সম্পর্কটা ছিল সরাসরি, পারস্পরিক।

আজ কিন্তু সম্পর্কের চেহারাটা একেবারেই বদলে গেছে। এই মুহূর্তে, বিশ্বের বাজারে কোনো বড় প্রকাশকের সঙ্গে লেখকের সোজাসুজি সম্পর্কের কথা অকল্পনীয়। সাহিত্যের বাজারে দালালরা এসে গেছে। তারাই পাণ্ডুলিপি জোগাড় করে যোগাযোগ করছে প্রকাশকের সঙ্গে। বই প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ছাপার আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে বাজারজাত করার কাজ।

পদ্ধতিটা আর একটু খোলাখুলিভাবে দেখা যাক। বিশ্বের বাজারে বই লেখা আজ একটা প্রক্রিয়া মাত্র, যে অর্থে আমরা সৃষ্টি বুঝি, তা নয়। বইটি লেখার আগেই লেখককে তাঁর 'ধারণা' 'দালালজাত' করতে হয়। তাই লেখকের প্রাথমিক বাজার হল দালালদের বাজার। নতুন লেখকের 'ধারণা' যদি কোনো সফল বড় দালালের

মনপসন্দ্ হয় তবে সেই লেখকের বই বাজারজাত করার অর্ধেক কাজ শেষ। নামী দালাল মানেই তার সঙ্গে দামি প্রকাশকের ঘনিষ্ঠ ওঠাবসা। সাধারণত এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে তা হল—উঠতি লেখক নামী/দামি দালালের কাছে প্রাপ্য মূল্যের কমেও তাঁর পাণ্ডুলিপি দিয়ে দেন ভালো প্রকাশক পাবার আশায়। নতুন লেখকের বই বাজারজাত করা এবং তার থেকে লাভ তোলার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা থাকে, তার মূল্য হিসাবেই বাজার-সম্পর্কের নিয়মে নতুন লেখকের বরাতে এই কম 'প্রাপ্তি'। সব-সময়ই যে দালাল লেখকের ধারণাটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করবে বা না-পসন্দ্ হলে বিদায় জানাবে—তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বাজারের কথা মাথায় রেখে দালাল লেখককে তাঁর মূল ধারণার কিছু বদল করতে বলে। লেখকের কাছে যদি তা গ্রাহ্য হয়, তাহলেই পরস্পরের মধ্যে সম্পাদিত হয় চুক্তি। লেখক লিখতে বসেন। দালাল যায় প্রকাশকের বাজারে। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন প্রকাশক। দালাল কোম্পানির একটা পূর্ব-নির্ধারিত ছক থাকে, আঁক মিলিয়ে প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলা শুরু হয়। ইতিমধ্যে লেখকের কয়েক অধ্যায় লেখা হয়ে গেছে। দালালও একাধিক প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলে কয়েকজনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছে। ফলে এখন নিলামের সময়। কয়েক পাতায় লেখা ধারণা এবং লেখার প্রথম অধ্যায়টি দালাল মায়ফত পৌঁছে যায় প্রকাশকদের কাছে। প্রকাশকরা তাঁদের দাম জানিয়ে দেন দালালকে। শুরু হয় দরাদরি। অনেক সময় প্রকাশক লেখাটির কিছু অদলবদল করতে বলেন। সাম্মানিক উপযুক্ত মনে হলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেখকরা এ দাবি মেনে নেন। 'লেখক—দালাল' থেকে শৃঙ্খলটি বর্ধিত হয়ে যেই 'লেখক—দালাল—প্রকাশক'-এ পৌঁছয়, তখনই শুরু হয় বাজারজাত করার অন্তিম ও চূড়ান্ত প্রক্রিয়া।

প্রকাশক তাঁর বেতনভুক কর্মচারীদের মাধ্যমে সমালোচকদের মধ্যে নতুন লেখক, 'উদীয়মান লেখকের সম্ভাবনা'-র কথা ছড়াতে শুরু করেন। এই নতুন লেখকের সম্ভাবনা যাচাই করতে সমালোচকরা নিজের রুজির তাগিদেই এগিয়ে যান। শৃঙ্খলে যুক্ত হয় আর একটা নাম—'সমালোচক'। এই মুহূর্তে শৃঙ্খলের চেহারাটা দাঁড়াল : 'লেখক—দালাল—প্রকাশক—সমালোচক'। প্রকাশক—সমালোচক সম্পর্ক বই বাজারজাত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ সমালোচকের মাধ্যমেই পাঠকের কাছে গিয়ে পৌঁছয় প্রকাশক। বিক্রির আগে 'হাওয়া' তৈরির ব্যাপারে সমালোচকের গুরুত্ব অপরিসীম। বিক্রম শেঠের সদ্য প্রসূত *Suitable Boy* প্রকাশিত হওয়ার আগেই বইটি নিয়ে গণমাধ্যমগুলিতে আলোচনার চেহারা দেখে এ সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে।

কোনো বিশেষ লেখকের বাজারি সাফল্য তাঁকে আজ করে তোলে 'Brand Name'—যার মালিকানা বর্তায় সংশ্লিষ্ট দালালের উপরে। লেখক যদি অন্য কোনো দালালের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন, সেক্ষেত্রে একটা 'ফি' (Fee) পায় সেই দালাল, যার অধিকারে

সে মুহূর্তে লেখকের 'নাম'টি রয়েছে। ফলে বই 'উৎপাদন'-এর শৃংখলটিকে আমরা এইভাবে বোঝাতে পারি :

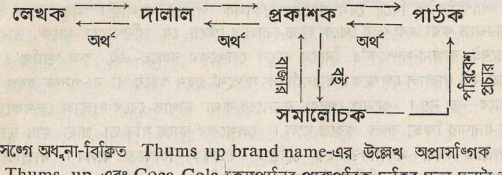

এই প্রসঙ্গে অধুনা-বিক্রিত Thums up brand name-এর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। Thums up এবং Coca-Cola কোম্পানির পারস্পরিক চুক্তির মূল দুটো অংশ হল : এক. Thums up কোম্পানির মালিকরা ভারতবর্ষে Coca-Cola বোতলজাত করবে। দুই. Thums up brand-এর (Limca ও অন্যান্য brand সহ) মালিকানা বর্তাবে Coca-Cola কোম্পানির উপর। ঠিক একইভাবে দালালের কাছে লেখকের নাম আজ নিছক Brand name. তাই বই বিক্রি আজ আর শিল্পকর্মের বিক্রি নয়—লেখকের নামের বাজার সৃষ্টির একটা অংশ মাত্র। মার্কেটিং-এর ভাষায় তাই নতুন লেখকের পরিচয় 'young brand' হিসাবে, দালালদের কাজ যার 'equity' তৈরি করা, অর্থাৎ 'নাম বেচা'। এটা নতুন কোনো লক্ষণ নয়। উদাহরণস্বরূপ এই বাংলারই সত্তরের কিছু তরুণ কবি ও অধুনা বৃদ্ধ সাহিত্যিকদের কথা উল্লেখ করা যায়। নিজেদের 'Cultfigure'-এ পরিণত করার চেষ্টায় এঁরা বহু সময় ব্যয় করেছেন। বিদেশেও এ ধরনের ভুরি ভুরি উদাহরণ মিলবে। কিন্তু একটা পর্যায়ে যা ছিল ব্যক্তিগত উদ্যোগের মধ্যে সীমায়িত, বাজারের নিয়মে আজ তা শৃংখলায়িত। তফাতটা এখানেই। ফলে সাহিত্য আজ হয়ে পড়েছে প্রকাশকের গর্ভজাত বাজারের সৃষ্টি। সাহিত্যিক একটা নাম। এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে আজ মিলস অ্যান্ড বুনসের গল্পের ধারণা বেরিয়ে আসছে কম্পিউটারের গর্ভ থেকে, মানেনে করা লেখকদের কলমের ব্যবহারে তার থেকে সৃষ্টি হচ্ছে উপন্যাস। নিয়মিত 'Market Response' সার্ভে করে দেখা হচ্ছে কী ধরনের গল্প বাজার 'খাবে'। বাজারও আজ 'Segmented'—চশমাধারী ভারিক্কি পাঠকের জন্য একটা, ঘরের বউদের আর একটা ; কফি টেবিলের জন্য এক রকম আবার বিভিন্ন বিষয়ের প্রোফেসনালদের জন্য আর এক রকম। এই মুহূর্তে বইয়ের বাজার সৃষ্টির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসাবে *Scarlet* এবং *Suitable Boy*-এর কথা বলতে পারি। *Gone With The Wind*-এর Sequel হিসাবে *Scarlet* উপন্যাসটি লেখেন অন্য এক মহিলা। কারণ স্বাভাবিক—প্রথমোক্ত উপন্যাসটির লেখিকা মারা গেছেন। *Scarlet*-কে বাজারজাত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় 'আর এক জনের লেখা বিখ্যাত উপন্যাসের sequel'—এই 'ধারণা'র ভিত্তিতে। কয়েক কোটি

টাকা খরচ করে 'marketing campaign' চালানো হয় এবং বোদ্ধা সমালোচকরা কী রকম হতে পারে এই বই সে বিষয়ে লিখতে থাকেন। টি. ভি. কোম্পানির মারফত মধ্যবয়স্কা লেখিকার সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়, বাজারে পাঠকের কৌতূহল বাড়তে থাকে। কৌতূহল যখন তুঙ্গে, সারাবিশ্বে মুখে মুখে যখন ছড়িয়ে গেছে আলোচনা, প্রকাশক তখনই বইটি বাজারে ছাড়েন। মুহূর্তে নিঃশেষিত হয়ে যায় কপিগুলি। সাহিত্যমূল্য বুঝে ওঠার আগেই বই নিঃশেষিত। প্রকাশকের তহবিলে লাভের টাকা।

Suitable Boy-কেও একইভাবে বাজারজাত করা হয়। বিক্রির শুরু হয় শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি টাকার 'প্রকাশক-লেখক চুক্তি'-র উপর ভিত্তি করে। বই লেখা শেষ হওয়ার আগেই, বিক্রম শেঠ কত টাকা পেয়েছেন তা নিয়ে গণমাধ্যমগুলিতে সমালোচকদের জল্পনা শুরু হয়ে যায়। ছবি ছাপা হয়—বিক্রম শেঠ লিখছেন—এই ক্যাপশনের ভিত্তিতে। সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে লেখকের উত্তর হাসি। প্রকাশকের উত্তরও ওই একই ভাষায়। কৌতূহল বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকাশিত হলে, ৫০০/- টাকা দামের বইটির জন্য পাঠকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কেমন বইটি—এ প্রশ্নের উত্তর পরে।

এই প্রক্রিয়ার ফল একটাই। সৃষ্টির শৃঙ্খলে আজ বাজারই তৈরি করছে সাহিত্যের ধারণা, লেখক তা তুলে নিচ্ছেন তাঁর পাণ্ডুলিপিতে এবং প্রকাশক প্যাকেজিং করে বাজারজাত করছেন। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির বেদনা নেই, আছে সৃষ্টির বৃদ্ধি। শিল্পের স্থান তাই ইতিহাসের পাতায় আর সমালোচকদের লেখায়। শিল্প হিসাবে সাহিত্যের যে বোধ তা আর অঙ্গাঙ্গিক নয়, তা প্রাসঙ্গিক। শস্তির খেলাতেই আজ বিশ্ববাজারের আনন্দ। □

বিজ্ঞাপন : চাহিদা পূরণের শিল্প

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপনী শিল্প নির্ভরশীল শিল্প, সে স্বাধীন নয়। শিল্পের তথাকথিত যে স্বাধীনতা তা বিজ্ঞাপনী শিল্পের নেই, নেই এবং থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, এবার প্রশ্ন তো হবেই যে, স্বাধীনতা নেই তবু শিল্প—এ সম্ভব কী করে! সম্ভব, কেননা বিজ্ঞাপনী-শিল্পকে সর্বদাই হতে হয় একজন শিল্পী-দ্বারা সৃষ্ট, ক্রেতা এবং বিজ্ঞাপনদাতার রুচির ও মেধার চাহিদা পূরণকারী শিল্পকর্ম। অর্থাৎ তাকে পূরণ করতে হল দুটো শর্ত। তাহলে (১) বিজ্ঞাপনী-শিল্প সৃষ্ট হচ্ছে শিল্পীরই হাতে, শিল্পের প্রাথমিক চাহিদা মেনে, (২) ক্রেতা ও বিজ্ঞাপনদাতার রুচি ও মেধার চাহিদাও তাকে মানতে হচ্ছে। দুটোর মধ্যে কোনো একটাকেও বাদ দিয়ে 'বিজ্ঞাপনী শিল্প' সম্ভব নয়, সম্ভব হতে পারে না ; যেভাবে নাট্যশিল্পীকে মানতেই হয় নাট্যকারের প্রদত্ত শব্দগত শর্ত এবং নিজের সৃষ্টিশীলতার প্রদত্ত শর্ত, দুটোই। যেভাবে শেক্সপীয়র যিনি অভিনয় করবেন তিনি নাটকের ভাবগত, শব্দগত শর্ত উড়িয়ে দিয়ে নিজের পথে চলে যেতে পারেন না এটা ঠিক, তেমনই যিনি ঐ অভিনয় করবেন তাঁর সৃষ্টিশীল বা ক্রিয়েটিভ মানসিক উপস্থিতি-ব্যতীতও ও-নাটক উতরোতে যে পারে না, এতেও সন্দেহের কারণ আছে কি কোনও ? দুটোকেই আসলে মিলতে হবে একটা বিন্দুতে ; দুটো মানে, নাটকের শব্দগত শর্ত এবং বাস্তবে অভিনয়ের সময়ে তা রূপায়ণের শর্ত, দুটোর কোনোটাই একক নয় যেমন ঠিক, তেমনই একটাকে বাদ দিয়েও অন্যটার চলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপনী শিল্পে, শর্ত মেনে শিল্পী 'শিল্প-'ই তৈরি করছেন, এবং শিল্পের শর্ত যে স্বাধীনতা তার জন্ম দেয়ার মধ্যে দিয়েই তৈরিটা করছেন তিনি। এ বাদে বিজ্ঞাপনী-শিল্প হয় না, তবে বিজ্ঞাপন-মাত্র হতেই পারে ; কিন্তু শিল্পহীন বিজ্ঞাপন-মাত্র বিজ্ঞাপনের প্রথম ও প্রধান যে উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ভোক্তাকে আকর্ষণ, তা করতে পারে না। আমাদের আলোচনার বিষয়, বলে নেওয়ার কোনো দরকার নেই আলাদাভাবে যে, ও-জাতের কিছু নয়। বিজ্ঞাপনী-শিল্প যিনি সৃষ্টি করেন তাঁর সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা থাকে যা তিনি রঙ, অবয়ব আর শব্দ বসিয়ে ভরান বা ভরানও না অনেক সময়—ঐ না-ভরানো মারফতই তা ভরে যায়। যায় শিল্পেরই শর্ত মেনে, শিল্প হয়ে ওঠে বলেই।

তবু 'বিজ্ঞাপনী-শিল্প'-র ক্ষেত্রে কতকগুলো প্রশ্ন ওঠেই ; যেমন, মার্কিন সমাজবিদ জুলু হেনরী একে 'প্যারাপোয়েটিক হাইপারবোলস' বলার পক্ষপাতী, কারণ 'বিজ্ঞাপনী শিল্প' মূলত ইংরেজিতে যাকে একস্‌অ্যাজারেশন বলা হয় তার ওপরই নির্ভর করতে বাধ্য। হেনরীর মতে 'বিজ্ঞাপনী শিল্প' শিল্প হোক বা না হোক একটা নতুন ভাষার জন্ম দিয়ে চলেছে। সমাজতাত্ত্বিকরা বলতেই পারেন, এ-ভাষা চাহিদার ভাষা বা আরও

স্পষ্টত, চাহিদা নির্মাণের ভাষা। কিন্তু এখানে যেটা দেখা দরকার তা হল ঐ যাকে একস্‌অ্যাজারেশন বলছি তার চরিত্রটা কী। শিল্পের নিজের চরিত্রেই একটা 'বাড়িয়ে বলা' রয়েছে এবং ঐটাই নির্মাণ করছে যাকে শিল্প বলব তার রূপ বা চেহারা। এখানে শিল্প, মানে বিশুদ্ধ অর্থে যাকে শিল্প বলা চলে, তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনী শিল্পের কোনো বিরোধ, দেখা যায়, নেই। কিন্তু বিরোধের প্রশ্ন আসে অন্যত্র। শিল্প সত্যের কারবারী (দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সত্য নয় শিল্পের সত্য। আবার একই সঙ্গে ত্রিসত্যের মিলনও অসম্ভব নয়।) এবং এই সত্য সাধারণ সত্যের থেকে বড়ো মাপের আর 'বিজ্ঞাপনী শিল্প' সত্যকথনের ভান করে মাত্র, সত্যকথন আসলে তার কাজ নয়। আমরা জানি 'উইলস ভার্জিনিয়া'-র স্বাদ সত্য অর্থে পৌরুষকে অন্য কেন কোনো মাত্রাই আসলে দিতে পারে না। বিজ্ঞাপনী শিল্প এই অতিকথনের, বা এমনকি সত্য-কথনের ভান-মারফত ক্রেতা-সাধারণের মনে ঐ মাত্রার ইলিউশন বা মায়া তৈরি করতে চেষ্টা করে, এবং দেখা যাচ্ছে সফলও হয় অনেকাংশে। এই ইলিউশন বা মায়া তৈরিই হচ্ছে বিজ্ঞাপন-শিল্পীর কাজ। তিনি এইটা করেন। এবং এইখানেই প্রশ্ন আসে, একজন প্রকৃত শিল্পী যিনি সত্যিকার অর্থে রঙ, রেখা, শব্দ বা সুর মারফত নিজের মতো করে শিল্পজগৎ তৈরি করার কথা ভেবেছিলেন, উৎপাদকের বা যিনি ক্লায়েন্ট তাঁর কথা মাথায় রেখে এই ইলিউশন তৈরির ভাষা বা চিত্রনির্মাণের মধ্য দিয়ে তিনি কি বাধ্য হন না তাঁর শিল্পের যে আদর্শ ছিল বা আছে তা থেকে সরে আসতে? এ-প্রশ্নের দু-ধরনের, অর্থাৎ 'হ্যাঁ' এবং 'না' দু-জাতের জবাবই সম্ভব। আসলে আজকের দুনিয়ায় আমরা যাকে বলি 'জনপ্রিয় শিল্প' বা 'পপুলার আর্ট' বিজ্ঞাপনী শিল্প তার সেরা উদাহরণ। পপুলার শিল্প জিনিসটা শিল্প হয়ে ওঠে তার ব্যবসায়িক ভিত্তিটাকে চূড়ান্ত ব্যবহার করে, এবং তার দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে। আমাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে এই শিল্পের শিল্প-নয় এমন শিল্পিত রূপটাই গোটা লেন-দেনের বাজারটা চালনা করে এবং এর মধ্যে থেকেই বেরিয়ে আসে সত্য জিনিসটার আরেক রূপ; বিজ্ঞাপনী-শিল্পীকে সর্বদা মাথায় রাখতে হয় তাঁর কাজ শব্দে বা রেখায় ক্রেতা-সাধারণের মধ্যে একটা তাড়না তৈরি করে চলা (যে অভাব নেই তাকে সৃষ্টি করা।) যা ব্যতীত সাধারণ মানুষ, আজকের কেন কোনো অর্থনৈতিক অবস্থাতেই পকেটে হাত ঢোকাতে বাধ্য হবে না। 'বিজ্ঞাপনী শিল্প'-র মূলে কাজ ওই তাড়না নির্মাণ। এবং সমস্যা হচ্ছে, একজন 'বিজ্ঞাপনী-শিল্পী'কে শিল্পীও হতে হবে এবং হতে হবে একজন না-শিল্পীও। কারণ একজন শিল্পীই প্রথমত পারেন ওই যাকে তাড়না বলছি তা জাগিয়ে তুলতে এবং না-শিল্পী না হলে কখনো তাঁর পক্ষে কোনো তাড়না নির্মাণেই থেমে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁকে হতে হয় একজন পেশাদার লিখিয়ে বা আঁকিয়ে এবং পেশার যে মূলে চাহিদা তা না-মানার উপায়ও থাকে না তাঁর। একজন শিল্পী হিসাবে না-শিল্পী হবার দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই তৈরি হতে থাকেন একজন বিজ্ঞাপনী-শিল্পী।

নাম জানাতে ইচ্ছা নেই এমন এক বিজ্ঞাপনী সংস্থার ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর চল্লিশোর্ধ এক যুবার মতে, বিজ্ঞাপনী দুনিয়ার নিজের একটা যুক্তির জগৎ রয়েছে, সত্যের জায়গা আছে। যা নিজের ভেতরে অনুভব না করতে পারলে একজন বিজ্ঞাপনী শিল্পী কেবল চাকুরি-জীবীই হয়ে থাকতে বাধ্য। তাঁর কাছে, 'ট্রুথ ইজ হোয়াট সেলস। উ' হ্যাভ টু নো দ্যাট, ট্রুথ ইজ হোয়াট য়্যু ওয়ান্ট পিপল্ টু বিলিভ, অ্যান্ড সিমালটেনাসলি ইট ইজ নট লিগ্যাল ফলস।' আরেক সংস্থার জনৈক নামী চিত্রশিল্পীর কথা, 'আমাদের আজকের পৃথিবী অযৌক্তিকতম এক বিক্রির নেশায় বুঁদ হয়ে আছে এবং মানুষকে, আমাদের কাজ হল ঐ একই মাপের কেনার নেশায় মাতিয়ে তোলা।' একজন সৃষ্টিশীল শিল্পী হিসাবে তিনি নিজেকে ঐ নেশারই নির্মাণকারী ভাবেন। তাঁর কাছে একজন কমার্শিয়াল শিল্পী হিসাবে সমস্যা হল নিজে যা দৃশ্যগতভাবে কল্পনা করছেন তা তিনি তাঁর যে ক্লায়েন্ট তাঁকে কল্পনা করাতে পারছেন কিনা। ওঁর কথায়, 'ট্র্যাডিশনালি আমরা যে সত্যকে মানি বা জানি আমার কাজ, তার গায়ে বিজ্ঞাপনী মিথ্যের ছোঁয়াটুকু লাগানো। ঐটুকু লাগাতে পারলেই তিনি সফল। ফলিত চিত্রকলার কৃতী ছাত্র এই অনতিতরুণের মতে, প্রথমত একজনকে ঠিক কল্পে নিতে হবে তার পথটা কী হবে। যদি সে বেছে নেয় ফলিত শিল্প তাহলে বিজ্ঞাপনের কাজে তার কোনো সংকট আসার কথা নয়। 'নয় কেননা আপনি আপনার মতো করে তো সৃষ্টির, ক্রিয়েশনের সুযোগ পাচ্ছেন। এবার সে-সুযোগ কাজে কতটা লাগাতে পারবেন সেটা আপনার ক্ষমতার ব্যাপার।' ওঁর ধারণা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সংকট আসে ভুল সিদ্ধান্তের ফলে। একজন বিকাশ ভট্টাচার্য যেভাবে কাজ করতে পারেন বা যে স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করতে পারেন একজন ও. সি. গঙ্গোপাধ্যায় বা রণেন আয়ন দত্ত তা পারেন না। এবং উল্টোভাবেও সত্য এটা। 'তা সে যদি বলেন তাহলে তো যিনি গান করেন বা যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী যিনি, ধরুন যোশীজী, তাঁর যে স্বাধীনতা, একজন নৃত্যশিল্পী, ধরা যাক খাঙ্কমণি কুট্টির, স্বাধীনতার মাত্রা তার থেকে কি আলাদা নয়? অথচ দু-জনেই তো শিল্পী এবং কেউই তো কমার্শিয়াল নন! আসলে, মিডিয়াটা বা মাধ্যমটা আলাদা, তাই তো! তা, এখানেও তো তা-ই। ফাইন আর্ট আর কমার্শিয়াল আর্ট দুটো এক মিডিয়া তো নয়। স্ট্রিম আলাদা। ফলে শিল্পের শর্তও আলাদা।' পাশাপাশি, ক্লান্ত দুটি চোখ মনে পড়ে আরেক তরুণের, যে বিজ্ঞাপনী সংস্থায় কাজ করে এবং তিনখানি যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে গত তিন-চার বছরে। দেড় বছরে একটা গোটা কাজ করে উঠতে পারিনি, জানেন! প্রতিদিন ফিরি যখন মাথার মধ্যেটা জাম হয়ে থাকে। রং-তুলি নিয়ে বসি। রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত বসেই থাকি। তারপর এসে শুয়ে পড়ি।' ক্লান্ত অথচ স্মার্ট চাউনি নামিয়ে ওঁর কথা, 'চাকরি ছেড়ে যে দেব, তারও উপায় কই! ছবির বিক্রির যা বাজার! খেতে তো হবে।' বিব্রত আরেক নামী বিজ্ঞাপন-রচয়িত্রীও, যিনি কবিতা লেখার জন্যই কলম ধরেছিলেন একদা। তাঁর কথাতেও 'শিল্প-টিল্প ভুলে গেছি। এখন

আমার কাজ হল টু সেল সামথিং এবং তাতে আমার লেখা ব্যবহার করা, মাথা ব্যবহার করা—কাজ ইজ কাজ ভাবতাম আগে, এখন বুঝি…' রক্তের মধ্যে কোনো একটা কিছুর মরে যাওয়া অনুভব করেন আজ ইনি আর কেবল ও'র সংস্থাই নয়, সমান মাপের চার-পাঁচটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় ও'র লেখায় চাহিদা 'মারাত্মক' বলাটাও ভুল হবে না। 'ছোট থেকেই মানুষের মনকে জিনস কেনার দিকে আকৃষ্ট করাটাই হল আসল কথা। জানি, এ আমি কী করছি। যে খেলনার বিজ্ঞাপন নিজে লিখি তার কোনোটা আমার ছেলেকে কিনে দিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব। অথচ আমি-ই তো এর কপি তৈরি করি, বাচ্চাদের বাধ্য করি বাপ-মাকে উত্যক্ত করতে! —না, কবিতা-টবিতা আমায় আর হন্ট করে না'।

২ :

মনে হতেই পারে এখনও যে, আমি আসলে সাফাই গেয়ে চলেছি বিজ্ঞাপনী শিল্পের হয়ে। যাঁর মনে হবে এরকম, মনে তিনি করতে পারেন, কারণ সে-স্বাধীনতা তো আছেই তাঁর। কিন্তু কথা হল, আজকের এই অদ্ভুত দুনিয়ায়, চাওয়া আর না-পাওয়া-ভিত্তিক এই বিচিত্র দুনিয়ায় 'স্বাধীনতা' শব্দটা আর আমরা তাকে এতদিন যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা বৌদ্ধিক আওতার মধ্যে দেখে এসেছি তার মধ্যে বন্দী থাকছে কিনা! থাকছে না। থাকছে না এ-জন্যে নয় যে, ঐসব শব্দগুলোই আজ অপ্রয়োজনের হয়ে পড়েছে, বরং ঐসব শব্দমালার শরীরে আরও নতুন সমস্ত মাত্রার যোগ হয়ে চলাই এর কারণ। মানুষ হিসাবে আমরা আজ আরও বেশি 'স্বাধীন', যে স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করার জন্যে নতুন মাত্রার বোধের প্রয়োজন। এই 'বোধ' যোগান দিচ্ছে আজ যন্ত্র। যন্ত্রের যে ক্ষমতা তা যে-মুহূর্তে পেরিয়ে গেছে একজন ব্যক্তি-লোকের ক্ষমতা ঠিক সেই মুহূর্তে মানুষ আজ পর্যন্ত যা ভেবে এসেছে, তার যে সমস্ত আদর্শ ছিল, যেসব ভালবাসা ছিল, সুকুমার বোধ বা প্রবৃত্তি ছিল, রুচি ছিল তার চেহারাও বদলে যেতে বাধ্য। এই বদলে যেতে থাকার মধ্যেই, বলা ভালো বিজ্ঞাপনী শিল্পের জন্ম। এটাই তার জন্মের কারণ। এখান থেকেই এককালে লন্ড্রেক মূল্যায়নের বিজ্ঞাপন এঁকে দেন আর সালভাদোর দালি নিজেকেই ব্যবহার করেন বিজ্ঞাপনে, এটা বুঝতে হবে আমাদের। পাশাপাশি ড্যানিয়েল বেল সাহেবের কথাও মনে রাখা যাক। উনি ও'র লেখায় একবার যা বলেছিলেন তার মানে মোটামুটি দাঁড়ায় এই যে, শিল্পায়ন (ইন্ডাস্ট্রিয়া-লাইজেশন) জিনিসটা কারখানা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হয়নি, ওর শেকড় যদি পেতে হয় তাহলে তা খুঁজতে হবে সেইসময়কার গভীরে, যখন থেকে যে কোনো ব্যক্তির কাজকে দেখা হতে থাকল একটিই কাজ হিসাবে এবং সে তার পারিশ্রমিক পেতে থাকল ঘণ্টা-মেপে বা ঐ একটি কাজের নিরিখে। শুনে যা-ই মনে হোক, বিজ্ঞাপনী শিল্প ব্যাপারটার জন্ম ঐ আধুনিক শিল্পায়নেরই সঙ্গে—চাহিদাকে উদ্দীপিত করতে। আবেগ এবং বাস্তবকে একাকার করে বিজ্ঞাপনী শিল্পের কাজই হল, পণ্যের প্রতি ক্রেতার আকর্ষণ বাড়ানো। শিল্প এখানে একটা উপাদান-মাত্র,

যা ঐ আকর্ষণকে উদ্দীপনা যোগাতে সক্ষম। ঐ উদ্দীপনা যোগানোই তার কাজ। এবং যেকোনো কাজই যেহেতু গড়ে নিতে বাধ্য তার যৌক্তিক পরিমণ্ডল ফলে বিজ্ঞাপনী শিল্পের ব্যাপারটাও তা-ই, ঐ গড়ে নেওয়া। একজন শিল্পী সেখানে উপাদান-মাত্র, যা ব্যবহার হচ্ছে। শিল্পী এখানে বিশাল একটা যন্ত্রের ছোট্ট একটা অঙ্গ যা কাজ করে যেতে পারে নিয়মমতো। 'স্বাধীনতা' শব্দটা ঐ যন্ত্রাংশের, মানে শিল্পীটির কাছে আর পুরনো মাপ ও মাত্রায় নেই—'স্বাধীনতা'রও অর্থায়ন ঘটে গেছে যে মুহূর্তে ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ওটাও বদলে গিয়ে ঢের বিশাল হয়ে গেছে। ফলে, স্বভাবতই যে-শিল্পী শিল্পী জীবনের শুরুতে পেশাদারী বিজ্ঞাপনী-শিল্পী হতে চাননি তিনিও একসময় না একসময় ঐ অর্থায়নকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। হবেনই। একটা স্বাস্তিদায়ক, মসৃণ, যৌক্তিক, গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাহীনতার স্বাধীনতার মধ্যে থেকে ঐ ঈশ্বরীর কাছেই নিজেকে নিবেদন করতে বাধ্য তিনি। এই বাধ্যতারই ছবি আঁকতে বা এর কথা লিখতেই তিনি আজ কলম বা তুলি ধরেন। তাঁর শরীর আছে কেবল, মন নেই।□

ভিন্নরঙ্গ

অসিত রায়

ক্ষমা কর দামিনী। আমি পারিনি। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত। এলিমেণ্টাল ফিয়ার। তোমার শরীর যে আমার পৌরুষের পরীক্ষা নেবে। তোমার মোহভঙ্গ হবে। অকৃতকার্যতার মুখোমুখি হতে আমি ভয় পাই। আমি পাথর নই। আমি সন্ত্রস্ত কাছিম যে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে। কঠিন বর্মকে তুমি ভাবছ পাথর। তোমার ভাবনা যেন এই খাতেই বয়ে যায়। তোমার মোহমুক্তি যেন না ঘটে। মোহ ভাঙ্গলে, তুমি ভাঙ্গবে আমি ভাঙ্গব। শ্রীবিলাস জানে আমি কবি। তাইতো অসামান্য লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে আছি; যৌবনের প্রান্তে এসেও আমি সম্ভাবনাময়। লেখনী উদ্যত নয়; উত্থিত নয় লিঙ্গ। মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাক তোমরা—শ্রীবিলাস প্রশ্ন তুলবে না আমার কলম কেন অচল; দামিনী জানতে চেয়োনা আমার লিঙ্গ কেন নিদ্রিত। এলিমেণ্টাল ফিয়ার।

চতুরঙ্গের মালিকানা

লেখা কার? লেখকের? তবে লিখে বাক্সবন্দী করে রাখলেই হয়, কেন এই প্রত্যাশা গৌরজন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি? লেখা পাঠকের? লেখা গৌরবাসীর? চতুরঙ্গ উপন্যাস কার? রবীন্দ্রনাথের না পাঠকবর্গের? রবীন্দ্রনাথের দাবি গ্রাহ্য হলে, মালিকানার চরিত্র প্রোপ্রাইটারি। রায় পাঠককুলের অনুকূলে গেলে মালিকানার চরিত্র পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানি যার অসংখ্যের মাঝে এই কলমজীবী একজন শেয়ারহোল্ডার। কলম আমার জীবিকা নয়; ইস্কুল মাস্টারের ক্ষেত্রে চকজীবী কথাটি বেশি ভাল শোনাবে। শব্দটি বাংলাভাষায় এইমাত্র জন্মাল বা মৃত হয়ে জন্মাল —স্টিলবর্ন বেবী। চতুরঙ্গের মালিকানা মামলায় লেখক আনরেপ্রেজেন্টেড আছেন, কারণ লেখক স্বর্গীয় (মর্ত্যধামে অনেক নারীসঙ্গের জন্য কি তিনি স্বর্গসুখ থেকে বঞ্চিত হবেন?)। নীতিবাগীশেরা যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথের অক্ষয় স্বর্গলাভ হোক। স্বর্গরাজ্যে দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হোন। পুরাকালে দেবরাজ নারী-সম্ভোগের জন্য অনেক উৎপাত করেছেন মর্ত্যলোকে। এবার আমাদের পালা; ইন্দ্র বনাম রবীন্দ্র। জয় হোক মর্ত্যবাসীর। হিপ্-হিপ্-হুররে! একতরফা শুনানীতে এইমাত্র চতুরঙ্গ মোকদ্দমায় জয়ী হল পাঠকবর্গ (আমরা/আমি)। আমি কি জয়ী

হলাম ? অসংখ্য অনামী শেয়ারহোল্ডাররা কি সত্যই রিলায়েন্স, টিস্‌কো বা হিন্দুস্থান লিভারের মালিক ?

পাশার দান ওল্টাতে হবে। ম্যানেজমেন্টে, আমাদের কথা থাকতে হবে। চতুরঙ্গের ম্যানেজমেন্টে আছেন কিছু গুরুমশাই—তাঁরা সমালোচনা করেন অথবা অধ্যাপনা অথবা সাহিত্যসৃষ্টি অথবা তারা থিঙ্‌-ইন-ওয়ান। তাঁদের পরিচালন-সূত্র অনুযায়ী—সরু ফালি কলকাতার জোলো মাটি থেকে কিছু রস, কিছু রৌদ্র আহরণ করেছে শচীশ। লেখকের আপাত পক্ষপাতিত্ব আছে শচীশের প্রতি (ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিট্যুশনের ব্যাঙ্কিং); বাকি কাজ করেছে বোর্ড অব্‌ ডাইরেক্টর্স; সঙ্গে আছে প্রফেসনাল ম্যানেজার্স। শচীশ বাংলা সাহিত্যের মানুষ নয়, অনেকটাই মিথ।

নতুন করে পড়া হোক চতুরঙ্গ; পুনর্পাঠ। গুরুমশাইদের মুখ-নিঃসৃত বাণীতে বধির থেকে; ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে জাগ্রত রেখে। ঔপন্যাসিক কী বলতে চাইছেন—পাঠ হবেনা এই নিরিখে। অন্বেষণে আমি কী পাচ্ছি সেটাই বড় কথা; পুনর্পাঠের মূল ভিত্তি। এবং পুনর্নির্মাণেরও। রবীন্দ্রনাথের মালিকানা নেই; মালিকানা আমার, আপনার। অবহেলিত রিসোর্সের প্রপার মবিলাইজেশন এখন অত্যন্ত জরুরি। সাংবিক সংস্থার ভার আছে, ধার নেই।

পুনর্পাঠ : পুনর্নির্মাণ

অন্ধকার এবং ভয় নিয়ে ভিন্নরঙ্গ শুরু। পাত্র : শচীশ-দামিনী। স্থান : পাহাড়ের গায়ে খোদিত গুহার গহ্বর। সময় : ত্রিযামা যামিনী। বিষয় : শচীশের ক্লস্ট্রোফোবিয়া।

গুহায় অনেকগুলি ঘর। একটিতে কম্বলের উপর শয়ান শচীশ। মাথায় অবিন্যস্ত চিন্তা : কালো বাসনা কেন অন্ধকারে লালিত হয়···নলিনবালার আত্মহত্যা···মৃত শিশু প্রসব···বিকৃত বাসনায় জারিত পুরন্দর···বেল্থামের ভাবীশিষ্য জ্যাঠামশাই···বেল্থাম ভুল। হোয়াট ইজ গুড ইজ প্লেজার অর হ্যাপিনেস। ভুল সবই ভুল। ইভিলের মাঝে লুকিয়ে থাকে প্লেজার··· স্ত্রী বর্তমানে পুরুষের জীবনে পরনারীর হাতছানি···ভ্রমর আছে, কিন্তু প্লেজারের উৎস রোহিনী···দামিনী···শুদ্ধচারিণী বিধবা নয় সে; শরীরকে অস্বীকার করে নিবৃত্তির সাধনা তার নয় : সে শরীরী নারী। লীলানন্দ স্বামী যাই বোঝাক না কেন, পুরুষাঙ্গ বাদ দিয়ে পৌরুষের অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। আমার তো ভ্রমর নেই, তবে কেন রোহিনীকে ভয়? পাপকে ভয় নয়, ভয় দামিনীর শরীরকে। পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে বাসনা বল্গাহীন ঘোটকীর মত বাঁধা-নিষেধছাড়া। ভীতিপ্রদ।···ঘুমুতে চাই; সুপ্তিতে আচ্ছন্ন হতে চাই; কিছুক্ষণের জন্য চেতনা অবশ হয়ে যাক।

ঘুমিয়ে থাকা রাজা আর দাসে কোনো তফাত নেই। নিদ্রাদেবী সাম্যের জয়গান গায়। জাগ্রত অবস্থায় অহঙ্কারী পদক্ষেপ; বসার ভঙ্গি ঋজু; স্বরক্ষেপণ পরিশীলিত। কিন্তু নিদ্রাদেবী যাদুকরী; তার যাদুর মায়ায় কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকে রাজপুত্র এবং গ্রাম্য ভাঁড়। চোখ বন্ধ, মুখ হাঁ-করা; বাঁহাত ডান কানের তলায়, অন্য হাতটি

অসহায়ভাবে এলানো ; এক হাঁটু বুকের কাছাকাছি, অন্য পা ছড়ানো। শচীশকে দেখছে দামিনী। শুয়ে আছে অসহায়, ব্যক্তিত্বহীন। অন্ধকারে চোখ জ্বলছে দামিনীর ; এ অন্ধকার আদিম, ক্ষুধার্ত ; সৃষ্টির আগের অন্ধকার। অন্ধকারে সৃষ্ট হবে প্রাণ। আভরণহীনা দামিনী ত্যাগ করে তার আবরণ ; বসন এখন অকিঞ্চিতকর। পুরুষের পুরুষাঙ্গের আগুন ও নারীর গর্ভের জলে লালিত হবে প্রাণ। বর্বর পুরুষের সাথে আজ মিলিত হবে আদিম নারী। মন নয়, বুদ্ধি নয়—দামিনী এখন শুধুই শরীর।

…এ কি অজগর! সাপিনীর লালাসিক্ত বেণ্টনে আমি আবদ্ধ। বুকের উপর নরম মাংসপিণ্ডের পেষণ। মুখের উপর গরম নিঃশ্বাস। পুরুষাঙ্গ ভয়ে সংকুচিত ; বিকল। এই আদিমতা আমার অজানা। কী ভাবে নিস্তার পাব! আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। চেতনাকে প্রাণপণে জাগরূক রাখার চেষ্টা করছি। কামনার জালে জড়াতে চাই না ; বাসনার জারকরসে সিঞ্চিত হতে চাই না। আমি চাই মুক্তি ; দীর্ঘ নিশ্বাস ; খোলা তেপান্তরের মাঠ। জড়ভরত আমি…অসার দেহ আস্তে আস্তে ভারমুক্ত হল। তবু ভয় আমার টুঁটি টিপে আছে। পাথরে মাথা ঠোকার শব্দ ; বোবা কান্না ; অস্ফুট কণ্ঠস্বর : 'পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো…'

ক্ষমা কর দামিনী। আমি পারিনি। আমি ভীত, সন্ত্রস্ত। এলিমেন্টাল ফিয়ার। তোমার শরীর যে আমার পৌরুষের পরীক্ষা নেবে। তোমার মোহভঙ্গ হবে! অকৃতকার্যতার মুখোমুখি হতে আমি ভয় পাই। আমি পাথর নই। আমি সন্ত্রস্ত কাছিম যে খোলসের মধ্যে ঢুকে গেছে। কঠিন বর্মকে তুমি ভাবছ পাথর। তোমার ভাবনা যেন এই খাতেই বয়ে যায়। তোমার মোহমুক্তি যেন না ঘটে। মোহ ভাঙলে তুমি ভাঙবে, আমি ভাঙব। শ্রীবিলাস জানে আমি কবি। তাই তো অসামান্য লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে আছি ; যৌবনের প্রান্তে এসেও আমি সম্ভাবনাময়। লেখনী উদ্যত নয় ; উত্থিত নয় লিঙ্গ। মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাক তোমরা—শ্রীবিলাস প্রশ্ন তুলবে না আমার কলম কেন অচল ; দামিনী জানতে চেয়োনা আমার লিঙ্গ কেন নিদ্রিত। এলিমেন্টাল ফিয়ার।

পটভূমি

শহুরে কেতায় অনভিজ্ঞ শ্রীবিলাস এন্ট্রান্স পরীক্ষা কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ দিয়ে উচ্চশিক্ষার আশায় গোলদীঘির পাশের কলেজে অ্যাডমিশন নেয়। এই কলেজেই শচীশের সঙ্গে তার পরিচয়। কলকাতার সমাজে তার পরিচয় নিয়ে কেউ ভাবিত নয়। তার নাম আছে, কিন্তু পদবী অজ্ঞাত। শুধু কুলপরিচয় : নিষ্ঠাবান কায়স্থ ঘরের সন্তান। এই পরিচয়েই কলকাতার সমাজে তার উপস্থাপনা। গাঁয়ের নিষ্ঠাবান কায়েতের ছেলে জানত না কলকাতার আভিজাত্য কাঞ্চনে। বনেদী বড় মানুষের পিতামহ-প্রপিতামহরা নিমকের দালালি করে মৃত্যুকালে অধস্তন পুরুষদের জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা

রেখে যান। এই বনেদী বাবুসমাজে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, সোনার বেনে, গন্ধবেনে সবাই কাঞ্চনচ্ছটায় আলোকপ্রাপ্ত। গ্রামের ছেলের স্থানগত অবস্থান নিয়ে তাই শচীশের কোনো দ্বিধা ছিল না। শচীশ তাকে কৌতুকভরে ডাকত বিশ্রী নামে। গাঁইয়ারা শ্রীহীন; বিলাস কলকাতার বাবুদের মোনোপলি। নামেও এসে যায়, যখন সৌরভ অনভিজাত।

শচীশ ও শ্রীবিলাসের মধ্যে সম্পর্ক; সান্নিধ্যে, শ্রদ্ধায়, তাচ্ছিল্যে, দ্বিধাহীন আনুগত্যে, করুণায় দ্রব এক নিবিড় সম্পর্ক যা অনুধাবন করা যায়, কিন্তু সংজ্ঞা দেয়া যায় না। শচীশ-শ্রীবিলাস বন্ধুত্ব কৃষ্ণার্জুনের সখ্যের মতো—কর্তৃত্বের কাঠামোয় ধৃত। ভক্ত-ভগবানের নৈকট্য।

শচীশ

সাহিত্যের অধ্যাপক উইলকিনস্ সাহেবের প্রিয় ছাত্র শচীশ। ইংরাজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি যতটা ফেমাস, ততটাই বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার জন্য নটরিয়াস। ক্লাসে পড়ানোর সময় বাঙালি-অবয়ব নিয়ে কিছু বাঁকা মন্তব্য করেন: বাঙালির সরু সরু পা-গুলি শুধু চামড়া আর হাড়; হাঁটু সদাই কাঁপছে। মোদ্দা কথা: দ্য বেঙ্গলী'জ লেগ ইজ দ্য লেগ অব্ আ স্লেভ। এই বাঙালি-বিদ্বেষী সাহেবটির পক্ষপাত কি শুধুই শচীশের মেধার জন্য? খটকা লাগে। ওই সরু সরু খালি পা সম্বল করেই বাঙালিরা গোরাদের ফুটবলে পর্যুদস্ত করে শিল্ড জিতেছিল, তবুও ওই বিদ্বেষদুষ্ট মন্তব্যে তো সাহেব পিছপা হননি। দুর্মুখদের মন্তব্যে কি কিছু সারাৎসার আছে? শচীশের কটা রং দেখে সাহেবের কি মনে হয়ে থাকতে পারে তার ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের আট-আনি না হলেও, সিকি, দু-আনি বা অন্তত এক আনি য়ুরোপীয়?

শচীশের চেহারার সাথে আশ্চর্য মিল জ্যাঠামশাইয়ের। যে সন্তান মনে মনে কামনা করেছিলেন শচীশের মধ্যে তাকে খুঁজে পেলেন তিনি। হরিমোহন যখন পুরন্দরের বিয়ে দিতে তড়িঘড়ি ব্যস্ত, জ্যাঠামশাই ইংরাজি ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন পাঠে শচীশকে আগ্রহী করে তোলেন। জ্যাঠামশাইকে শুধু নাস্তিক বললে অল্পকথনের অভিযোগ উঠবে; তিনি নাস্তিকতাবাদের প্রচারক। "ঈশ্বরের উপর মানুষের ভাল করার দায় না চাপিয়ে নিজেই সে দায় কাঁধে তুলে নাও। গ্রামের পর গ্রাম যদি মায়ের দয়ায় উজাড় হয়ে যায়, তবে, বাবা, মায়ের চাইতে জেনার সাহেবের উপর আস্থা রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। গো-উপাসকদের কথা আলাদা; কারণ তাদের মস্তিষ্কে গরুর ত্যাগ-করা বস্তুর আধিক্য।"

নিষেধের বেড়াজালে মন পঙ্গু হয়ে যায়। তাই শচীশের সাথে সমস্ত বিষয় নিয়েই খোলামেলা আলোচনা করতেন জ্যাঠামশাই। সেক্ষপীয়র, বেন্থামের সাথে সাথে তিনি 'কুমারসম্ভব' কাব্য থেকে পড়ে শুনিয়েছেন শিব ও উমার মিলনের বর্ণনা। শচীশের

মধ্যযৌবনে নলিনবালা—প্রথম নারী ; নলিনবালা অসহায়, অনূঢ়া, হতভাগিনী। শচীশ হতভাগিনীর উদ্ধারকর্তা। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধনে নিমগ্ন প্রাণ। শচীশ-নলিনবালা ; পুরুষ ও নারী। কিন্তু এ প্রথম দর্শনে প্রেম নয় ; অনেকদিনের উষ্ণ সান্নিধ্যে ঘর বাঁধতে প্রতিজ্ঞ যুবক-যুবতী নয় এরা। একজন আশ্রয়প্রার্থী—অন্যজন আশ্রয়দাতা। শচীশের বিবাহের প্রস্তাব কোনো প্রেমের পরিণতি নয়। ব্রাত্যকে সমাজে অ্যাকোমোডেট করার সাধু চেষ্টা। বিয়ের প্রস্তাব নলিনবালাকে দেয়া হয়নি। শচীশ প্রস্তাব রেখেছিল জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

শচীশ-নলিনবালার বিয়ে মোটামুটি স্থির হয়েছে। জ্যাঠামশাই শচীশকে বিয়ের আগে নিভৃতে নলিনবালার সাথে খোলাখুলি কথা বলতে নির্দেশ দিলেন।

শচীশ : অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তোমাকে বিয়ে করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। জ্যাঠামশাইয়ের বয়স হয়েছে। দাদার উৎপাত থেকে তোমায় রক্ষা করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

নলিনবালা নীরব ; দৃষ্টি আনত।

শচীশ : এতবড় অন্যায় আমার চোখের সামনে ঘটতে দেব না। কুলের কালি মোছার জন্যই আমার এ প্রস্তাব, নইলে বিয়ে করার সখ আমার নেই।

নলিনবালা : এ বিয়ে হবে না।

শচীশ : হবে না !

নলিনবালা : আপনি মহানুভব, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করার প্রয়োজন নেই। তাতে আমার গ্লানি বাড়বে।

শচীশ : আমার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না।

নলিনবালা : আমি আমার কথা ভাবছি। আপনার দাদাকে জ্যাঠামশাই পাষণ্ড ডাকলেও, তিনি রক্তমাংসের মানুষ। আপনি অশরীরী—অশরীরীর সাথে ঘর বাঁধা যায় না। আপনার চোখে আমি নারী নই, শুধুই বোঝা।

শচীশ : কিন্তু জ্যাঠামশাই !

নলিনবালা : তাঁকে আমি বুঝিয়ে বলব।

শচীশের ডায়রী :

মহত্ত্বের জন্য কোনো খেসারত দিতে হল না আমাকে। ননি আমাকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে আত্মহত্যা করে। ছাপোষা সংসারীর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল না। অব্যাহতি পেলাম বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব থেকে। আমার কথা ভেবেই বোধ হয় নলিনবালা প্রসব করেছে মৃত সন্তান। ওই অবাঞ্ছিত শিশুকে নিয়ে আমি কি করতাম ? ডেকার্টের লেখা একটি চিঠির অংশ মনে পড়ছে ; আমস্টার্ডামে লেখা ; ৫ মে, ১৬৩১ : 'এই বড় শহরে, আমি ছাড়া, আর সবাই কাজে ব্যস্ত ; এত ব্যস্ত তাদের লাভ-লোকসান নিয়ে যে আমি সারাজীবন এখানে থাকলেও আমি কারো গোচরে আসব না।...প্রতিদিন বিভ্রান্ত জনতার মাঝে আমি পায়চারি করি। রাস্তার দু'পাশে গাছের সারি। আমার চোখে মানুষগুলি সারিবদ্ধ গাছগুলি থেকে আলাদা নয় অথবা আলাদা নয় বাগানে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো

পশুগুলি থেকে। তাদের কোলাহল ঝর্ণার অর্থহীন কুলকুল ধ্বনির মতো ; আমার দিবাস্বপ্নে তা ব্যাঘাত ঘটায় না।'

...নন্দিবালা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে...আমার চোখ দেখতে শেখেনি। আমার চোখে সে ছিল শুধুই কলঙ্কিনী ; জগতের হিত করার আমার উদগ্র বাসনার মাধ্যম। দেখতে পাচ্ছি তার ম্লান মুখ, কিন্তু মালিন্যের ছোঁওয়া নেই। তার কাল চোখে গভীরতা ; আছে মৃত্যুর ছায়া।

দামিনী

সেদিন আকাশে আলো ফোটেনি তখন ; নদীর ধারের পোড়ো বাড়ির আস্তানা ছেড়ে শচীশ ওপারে বালুচরে চলে গেল। দামিনী অভুক্ত, প্রতীক্ষারত। এ প্রতীক্ষা শান্ত নয় ; সমাহিত নয় ; এ অস্থির। আবেগতাড়িত। অধোমুখী নারী শচীশকে গৃহস্থালির পাকে জারিত করতে চায়। অনাসৃষ্টির বর্গে বসিয়েও মন মানে না...নারীর জিগীষা মাথা চাড়া দেয়...পোষ মানাতে ছোটে পুরুষকে। সূর্য মধ্য আকাশে। খাবারের থালা নিয়ে হাঁটুজল ভেঙে নদী পেরিয়ে অন্যপারের দিকে চলল দামিনী। তমসা-আবৃত রাতের প্রত্যাখ্যান কি দিনের আলোয় পুনর্বিবেচিত হবে।

পায়ের নীচে চারদিকে শুধু বালুরাশি ; শুকনো, তপ্ত। মাথার উপর শূন্যতা আগ্রাসী-ভাবে শূন্য। সীমাকে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে শূন্যতা।

অন্তহীন শূন্যতার মাঝে অনুসম স্থান জুড়ে আছে দামিনী। ক্ষুদ্র। অকিঞ্চিতকর। মথিত আবেগ বাষ্প হয়ে শূন্যে লীন। পৃথিবীর রং বোঝা যাচ্ছে না। জলহীন বাতাসে মৃত্যুর স্বাদ। সূর্য প্রাণের উৎস নয়, মৃত্যুর দোসর। বেলা-অবেলা-কালবেলা একাকার।...দামিনীর হাত থেকে থালা খসে পড়ে।...দামিনী ভীত ; দামিনী ভয় পেয়েছে। দামিনী পালাতে চায়...দামিনী পালায়। ঘরে ফিরে চার দেয়ালের মাঝে বুক ভরে বাতাস নেয় দামিনী।

শ্রীবিলাস

দামিনী আমার মুখে বোল ফুটিয়েছে।

শব্দ : বাক্য : কথা—দর্শন। আমার দর্শন নেই ; কারণ আমার কথা নেই ; আমার কথা নেই ; কারণ আমার বাক্য নেই ; আমার বাক্য নেই ; কারণ আমার শব্দ নেই। য়ুরোপীয় শব্দ-বাক্য-কথা আত্মসাতের প্রচেষ্টায় ছাত্রজীবনে আমি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ মার্কা। উচ্চ-বর্গের শব্দরা আমাকে শাসন করে। চালনা করে। অদৃশ্য সুতোর টানে আমার বুদ্ধি বাঁধা থাকে—মন উচাটন হলে শাসন করে শব্দ ; আমার নয়। শচীশের কথা আমার কথা ; জ্যাঠামশাইয়ের মত আমার মত ; লীলানন্দস্বামীর প্রলাপ আমার প্রলাপ। কিন্তু আমি দামিনীকে দেখেছি। আমি কথা পেয়েছি, শব্দ পেয়েছি। দেখতে শিখেছি : আমার দর্শন। শব্দগুলোর পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে ; জীর্ণ ; ভণিতা-সর্বস্ব। সৃষ্ট হচ্ছে নতুন শব্দ অথবা চেনা শব্দরা পাচ্ছে পুনর্জন্ম। আমি শ্রীবিলাস (উচ্চবর্গের লেখক আমাকে পদবীহীন করেছেন) এখন দ্বিজ হলাম (আশাহত হলেন অনেকে)।

... ...

ফাল্গুনের ক্ষত নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম একা। সঙ্গে দামিনী নেই। শ্মশানে চিতার আগুনে দামিনীর রোগে-ভোগা দেহ ছাই হয়ে গেল। আগুনের সাথে দামিনীর মিল আছে; তবে কিছুটা। আগুন শুধুই পোড়ায়। দামিনী পোড়ায় এবং নিজেও পোড়ে। দামিনীর কি স্বর্গবাস হবে? পরলোক নিয়ে আমার দুর্ভাবনা নেই; তবু। মৃত্যুর মুহূর্তেও দামিনী আমার কাছে মোহময়ী। মরণের পূর্বক্ষণে আমাকে (দামিনী তার স্বামীকে) প্রণাম করে বলেছিল: "সাধ মেটেনি, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই"।

মৃত্যুকালীন উক্তি আদালতেও সত্য বলে গ্রাহ্য হয়—কিন্তু আমার বেলায়? একি সত্য না শেষ স্তোকবাক্য। দামিনী অমৃতময়ী। দামিনী অনৃতভাষিণী। সাধ অবশ্যই তার মেটেনি। সাধ্য কি আমার দামিনীর জীবনপিয়াস মেটাই? জন্মান্তরে আমাকে তো পেতেই হবে; আমাকে অবলম্বন করেই শচীশকে পেতে হবে। খুঁজতে হবে তার দয়িতকে।

লীলানন্দস্বামীর আখড়ায় মস্ত কড়াইয়ে রস সৃষ্টি হচ্ছে; প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে পুরুষের রসের সাধনা। শচীশের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আমি সঁপে দিয়েছি আমার/জ্যাঠামশাইয়ের নাস্তিকতা লীলানন্দস্বামীর পায়ে। এখন আমার কথা নিবৃত্তিযোগ: লীলানন্দস্বামীর দান। মানুষের লীলা মোটামুটি চলছিল, কিন্তু বাদ সাধল দেবতার লীলা। দামিনী। পরলোকের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে বিদ্রোহিনী। উদ্ধত গ্রীবা; ভ্রূকুটিতে ঘৃণা জানায় চারদিকের ভীরুতাকে।

... ...

আমি দামিনীকে দেখলাম। আমি দামিনীকে আবিষ্কার করলাম: কামনা-বাসনার শরীরী মূর্তি; লজ্জাহীন-শোণিতবর্ণ। বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনায় সংকুচিত নয়; স্বচ্ছন্দ ইন্দ্রিয়বিলাসিনী; শুচি নয় অশুচি নয়, সহজ স্বৈরিণী। অনেক নরক মন্থনের পর উঠে এসেছে নারী; একহাতে অমৃতপাত্র, অন্যহাতে বিষভান্ড। সুধায়-গরলে দীপ্র নারী: আমার উদ্ধার। তার চোখে বিশ্বব্যাপী কালিমা; নীল কালি: যমুনার জল। উন্নত বুকে তুফানের আভাস, নিটোল উরুর গতিতে কাপড়ের ভাঁজ থেকে ছিটকে আসছে আদিম বিলাস।

শচীশ মাধুর্যের সন্ধানে শূন্যপানে চেয়ে আছে; দৃষ্টি নামিয়ে আনলে দেখতে পেত মধুরতমাকে। জীবনে লজ্জাকর অনুপস্থিতি নিয়ে বেঁচে আছে শচীশ। প্রচুরতম মানুষের প্রভূততম সুখসাধন! প্রচুরতম মানুষ কোথায় থাকে—কিভাবে থাকে—কি তাদের গ্রাসাচ্ছদন—কিভাবে প্রেম করে—সন্তানের জন্ম দেয়—কিভাবে মারা যায়: সব শচীশের অজানা। এই আশ্চর্য অজ্ঞতা শচীশের জীবনযাপনে কোনো ছায়া ফেলেনা। মানুষ তার কাছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া; মানুষী প্রকৃতির চর। দামিনীকে চোখভরে দেখেনি শচীশ: দেখতে পায়নি তাই ধন্যবাদ শচীশকে। ঈশ্বরের করুণা

শচীশের জন্য তোলা থাক। আমি তাতে ভাগ বসাব না।' বৈরাগ্য নয় : রাগের সাধনেই আমার পরম সুখ। দামিনীর পায়ের তলায় আহ্লাদী বিড়াল। আমি ভাষা পেয়েছি ; আমি আর দুর্লভ তোতাপাখী নই। আমি বাঁচতে শিখেছি।

আমি জানি শচীশ আমাকে নিয়ন্ত্রণ করে ; কিন্তু সে জানে না আমি তাকে কতটা নিয়ন্ত্রণ করি। যে পাটাতনে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে, তার দিকে তাকানো শচীশের ধাতে নেই ; দৃষ্টি নিবদ্ধ উপরে। পায়ের তলার পাটাতন সরে গেলে ? ···ঝপাস। শচীশকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি দামিনীকে। পারি না। না-পারা ভালবাসা না দুর্বলতা। এই অনুভূতির সংজ্ঞা কে দেবে প্রভু না দাস ? প্রভুত্বের পাঁকে ডোবা, নিয়ন্ত্রণের আস্বাদে অভ্যস্ত শচীশের আনন্দ কেন কেড়ে নেব ? গ্রেটেস্ট গুড অব্ দ্য ফিউয়েস্ট নাম্বার আমার ডেস্টিনি।

দামিনীর সঙ্গে শ্রীবিলাসের বিয়ে হয়েছে। দামিনীর ভার স্বামীজির ঘাড় থেকে নামল। ভার অবশ্য অনেকটাই হাল্কা হল স্বামীজির। তার সৌরজগৎ থেকে চ্যুত হল প্রধান দুটি গ্রহ—শচীশ ও শ্রীবিলাস। শ্রীবিলাস গৃহী। শচীশ গৃহী নয়, কিন্তু গৃহস্থের গৃহের বন্দোবস্ত শচীশ ঠিক করে দিল। জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ীতে স্থান পেল শ্রীবিলাস-দামিনী। গৃহ পেলেও গৃহী হওয়া হল না শ্রীবিলাসের ; কারণ দামিনী গৃহিনী নয়। সে নয় শ্রীবিলাসের অর্ধাঙ্গিনী। শচীশের দেখাশোনার ভার নিল দামিনী। অতএব শচীশকে সামলানোর দায় শ্রীবিলাসেরও ! ছা-পোষা গৃহস্থ নয় শ্রীবিলাস ; সে শচীশের সেবাইত। সে দামিনীর স্বামী নয়, দামিনীর অবলম্বন।

আমি মহাভারতের রাজাদের মতো। অপেক্ষা করে আছি ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্য ; দেবতার অনুগ্রহ হলে দেহ দিয়ে লালন করে জন্ম দেবে দামিনী একটি নতুন প্রাণের। দামিনীর আত্মজকে পিতৃ-পরিচয় দেব আমি। এবং অপত্য স্নেহ। কৃপণ নয় দামিনী, অকৃতজ্ঞও নয়। মাঝে মাঝে অনুগ্রহ পাই—প্রেমহীন সঙ্গমে চরিতার্থ হয় একজনের কামনা—অন্যজনের ঋণশোধের দায়।

শচীশের ডায়রী :

নদিবালার মাঝে আমি যে নারী দেখতে পাই সে বিষাদময়ী ; সুন্দরী। তার কালচোখে মৃত্যুর ছায়া। কিন্তু সে মৃত্যু করাল নয়। সে মৃত্যু শুধু সমাপন। দামিনী মৃত্যুঞ্জয় ; জীবনকে নিংড়ে নিয়ে তার রসের শেষ ফোটাটুকুও চেখে দেখতে চায়। চোখে জ্বলছে অপরূপ উজ্জ্বলতা ; ধাপদিনীর মতো। অনন্যা···ক্ষীণাঙ্গ পুরুষের শরীর বেমানান, অশ্লীল।

দামিনী

সূর্যের আলোয় চকমক করছে তার বর্ম, তলোয়ার। ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে সবার মাঝখানে এসে চকিতে তুলে নিল, ভীত-সন্ত্রস্ত আমি, আমাকে ঘোড়ার পিঠে। রোমশ বুকে নিষ্পেষিত আমি ; পাঁজর টনটন করছে ; বিবস্ত্র হচ্ছি আমি। দূরে দাঁড়িয়ে শিবতোষ জপ করছে : নারায়ণ, নারায়ণ।··· ···ভীষণ-দর্শন ওঝা আমার খোলা পিঠে চাবুক মারছে—সপাং সপাং···সারি সারি মুখ, বিস্ফারিত

চোখ ; উল্লাসে চিৎকার করছে : আরো, আরো, আরো। গলগল করে বইছে রক্তের নদী ; দুই কূল উপচে পড়ছে. ভেসে গেল গ্রাম-জনপদ।···তন্দ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন শরীরে ঘন নিঃশ্বাস···গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী। কদাকার গিরগিটি শরীরের আনাচ-কানাচ চেরা জিভ দিয়ে চাটছে···ক্লেদাক্ত, পিচ্ছিল। ···সৌম্যদর্শন বুড়ো সালঙ্কারা কন্যাদান করছে এক ধূসর রঙের শেয়ালকে। ···স্বয়ম্বরা ; সভায় অসংখ্য শচীশ···উদ্‌ভ্রান্ত বালিকার হাতের বরণমালা ঈগলপাখী হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। ···পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কালো ঘোড়া ছুটে চলছে।

আমি মানুষ নই ; আমি মেয়েমানুষ। আমি কন্যা—পুরুষের আদরের-স্নেহের বস্তু ; আমি স্ত্রী—পুরুষের সেবা যোগানোর, কামনা-বাসনা মেটানোর বস্তু ; আমি মা—সন্তান ধারণ ও লালনের বস্তু।

আমি সন্তানহীনা বিধবা। আমার ক্লীব স্বামী মৃত্যুর আগে স্থাবর সম্পত্তি সমেত আমাকে সঁপে দেন গুরুর পায়ে। মেয়েমানুষের আহ্লাদ থাকতে নেই, বাসনা থাকতে নেই, মন থাকতে নেই। মাটির ঢ্যালার মতন আমাকে নিয়ে এক হাত থেকে আরেক হাতে নাড়ানাড়ি চলছে। আস্তে আস্তে স্বামীজি ও তাঁর চ্যালারা বুঝতে পারছেন আমি কাদার তাল নই ; আমি মহামায়ার অংশ।···নপুংসকদের মাঝে আমি দেখতে পেয়েছি পুরুষকে। তাঁকে আমি টানি, কিন্তু সে আকর্ষণের জোর বড়ই কম। ফাঁদের চারপাশে আসে, ফাঁদে ধরা পড়ে না। অবহেলা, উপেক্ষা করে চলে যায়। শ্রীবিলাসবাবু আমার দেহের তুলনা খুঁজে পেয়েছিল আমেরিকার কলোরাডো নদীর সাথে। দু'শ বছর ধরে কলোরাডো একটু একটু করে পাথর কেটে এগিয়ে চলেছে।

শ্রীবিলাসবাবুর সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। বড় ভাল মানুষ ; মাঝে মাঝে মনে হয় বড় অন্যায় রকমের ভাল। তার রাগ নেই, অভিমান নেই, জ্বলুনুনি নেই। সন্তান কামনা করলেও, জানে তার সন্তান আমি গর্ভে ধরব না। তবু তার কোনো বিকার নেই ; উল্টে আমার সমব্যথী।

.....'অসীম, তুমি আমার, তুমি আমার'—বলে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে কোথায় হারিয়ে গেলেন ? তাঁর মনের হদিস কোনো দিন পাইনি, কিন্তু মাঝে মাঝে দেহটার পরিচর্যা তো করতে পেতাম ! এখন আমার বাঁচার অবলম্বন কী হবে ?

অবজ্ঞায়-অনাদরে শরীর ঠিক থাকে। বিয়ের পর শ্রীবিলাসবাবুর যক্ষ্মে ব্যামো নামের বিলাসিটি শরীরে উপসর্গ হয়ে দেখা দিল। বিভিন্ন চিকিৎসায় হাড়মাস এক হওয়ার পর ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন হাওয়া বদল করার। কোনো লাভ নেই জেনেও শ্রীবিলাসবাবু আমার শেষ খেয়াল মেটাতে নিয়ে এসেছেন সমুদ্রের ধারে।···শমন শিয়রে ···তাঁর দেখা নেই। কিন্তু জন্মান্তর আছে ; অনেক জন্ম আছে। আমি কলোরাডো নদী···পাথর আমি কাটবই। আমার হাতে আছে দু'শ কোটি বছর।

শব্দের বেড়াজাল কেটে আমাকে মুক্তি পেতে হবে। এবার আমার প্রতিপক্ষ আমি ; সাধারণ মরদেহ জীবদের বোঝানোর পালা নয়। যে নিপুণ জাল বুনে এসেছিল, আজ

মাকড়সা তাতেই বাঁধা পড়েছে। যে কথার মোহজালে অপরকে বেঁধেছি, তারই জালে আমি ধরা পড়েছি। আমি মুক্তি চাই। শব্দকে অর্থহীন হতে হবে; হতে হবে নির্ভার, ধ্বনিশূন্য। আমাকে দাও সেই অনুভূতি যা ইন্দ্রিয়শাসিত নয়! আমার প্রমাণ করার কিছু নেই। আমি সৃষ্টি করব না, সৃষ্টিকর্তার মাঝে লীন হব। সৃষ্টির অসংখ্য বাঁধনে তিনি বাঁধা থাকেন; তিনি লীলাময়। ঈশ্বরের লীলাতেই যদি মজে থাকি, ঈশ্বরের খোঁজ আমি পাবনা। ...এক বিশাল না-এর গহ্বরে আমি ধীরে, অতি ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি।

... ...

কোথায় পড়েছিল শ্রীবিলাস : দ্য সেইন্ট ইন হুম গড্ ডিলাইট্স্ ইজ দি আইডিয়াল্ ইউনাক্।□

চণ্ডিকার উদরে বৃশ্চিক

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যটন মানুষের এমন এক প্রবণতা যা সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে বিকশিত এবং সূক্ষ্মও হয়েছে। এর মধ্যে দুষ্টা মানুষের এক বিবর্তনও লক্ষ করা যায়। আমাদের জ্ঞান ও শিল্পান্বেষা শুধু নয়, জীবনযাপনও এক পর্যটন। আক্ষরিক ও লঘু অর্থে তা ভ্রমণ।

সহজে এবং আরাম-আয়াসে যেসব ট্যুরিস্ট-স্পটে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব সেসবই এখন আবর্জনাস্তূপ, ভীড় সেসব স্থান কলুষিত করেছে। পর্যটন পরিস্থিতির সঙ্গে সাহিত্যের, সাহিত্যপাঠের, রসাস্বাদনের সাদৃশ্য কোনও অভিনব আবিষ্কার নয়। এই প্রসঙ্গের অবতারণা অন্য কারণে। প্রযুক্তিপুষ্ট হওয়ায় আমাদের স্থানান্তরিত হওয়া মাখনমোলায়েম আজ। তবু অনেকে এ পথ মাড়াতে চান না। দুর্গমস্থান খোঁজেন। মেগাসিটির আরাম তাঁদের কাছে মলমূত্র। তাঁরা চান বাঁচাটা গড়েপিটে নিতে।

সাহিত্য পর্যটনে আরাম আয়াসের নাম বিনোদন। এই বিনোদিনী আর আনন্দকন্যা এক কথা নয়। সংকটে পড়তে হয় যখন বিনোদনের সঙ্গে আনন্দকে গুলিয়ে ফেলা হয়। বা বিনোদনের একটিই স্বৈররূপ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে। যেমন, গোটা পৃথিবীর মানুষকে প্যান্টসার্ট পরিয়ে পাবলিকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, দেশ-কাল-ঐতিহ্য নির্বিশেষে পশ্চিমী গণতন্ত্র চাপানো হয়েছে তাঁদের ঘাড়ে, সেইরকমই হতে হবে লেখাপড়ার ব্যাপার এবং শিল্পপিটিপও। উদ্ভট প্রশ্ন, পাগলামি—বরদাস্ত করা হবে না। বিপুল-বিশাল এই শৃঙ্খলা-জালটিতে একটি, দুটি ফুটো পর্যন্ত রাখা হয়নি। ছিদ্রের আশঙ্কা নির্মূল করতে আছে কড়া নজরদারি।

জনমনোরঞ্জক সাহিত্য সর্বদেশে, সর্বকালেই ছিল—ধরে নিতে পারি। তার বিনোদন ধর্ম স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সাহিত্যের জন্ম সাহিত্যের গর্ভে (সম্পূর্ণত) যা সাহিত্যের বিকাশ ও পুষ্টিতে এক পর্যটন, সাহিত্যকে প্রশ্ন করে, তার সংজ্ঞা বদলানোর স্পর্ধা দেখায়, তাকে আক্রমণ করে—জনমোহিনী সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এ আলাদা জাত। তার ব্যর্থতা, সাফল্য আলাদা।

সাহিত্য ব্যবসায়ীদের এতে রুষ্ট হবার কোনও কারণ দেখি না। বিশেষ করে এই গরিব দেশে দু-পাঁচজন লেখক এই করে দুটো পয়সা রোজগার করছেন, বালবাচ্চা নিয়ে সংসার চালিয়ে মারুতি-টারুতি চাপতে পাচ্ছেন, এ কম কথা নয়। এই বিভাজন তবু তাঁদের পীড়া দেয়, সেজন্য একটা মরিয়া চেষ্টা চালান সীমান্তরেখা মুছে ফেলতে এ-কাজে তাঁদের দোসর পুস্তক সমালোচক মাস্টাররা, মান্ধাতার আসলের সিলেবাস উগড়ে যাঁদের পেট চলে।

কেন এই চেষ্টা (অনুপ্রবেশের), কেন সব তালগোল পাকাতে হয় ?
ওই প্রশ্নের দুটি জবাব ভাবা যেতে পারে, একটি সাহিত্য ব্যবসায়ী লেখকদের দিক থেকে, অন্যটি বাংলা বইয়ের সীমিত এবং অপরিণত বাজারের দিক থেকে।
সাহিত্যসেবা কথাটা আজকাল আর কেউ বলেন না ঠিকই কিন্তু ধারণাটি রয়ে গিয়েছে। মহৎ একটি কাজ করছেন, সাহিত্যজীবীরা তা প্রমাণ করতে চান। তা না হলে শ্রদ্ধা ভক্তি কাড়া যায় না। সমাজের বাবা-কাকা হওয়া যায় না। ব্যবসার স্বার্থেই এটা দরকার। আর তাই শঙ্কর বা অতীতে বিমল মিত্রের মতো সাহিত্যজীবীদের তরল-জনপ্রিয় সাহিত্যের প্রতিনিধি খাড়া করে তাঁর ছোড়া হয়েছে। এভাবে সীমান্ত লোপাট করে তথাকথিত মেনস্ট্রিমের মধ্যেই সাহিত্যের গোটা মানচিত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। যেন এর বাইরে আর কিছু নেই। ঠিক ভোটদাতা নাগরিকের অবস্থা, হয় কংগ্রেসকে ভোট দাও না হলে সি পি এমকে।
বাজারের দিক থেকেও এর সমর্থন মিলবে। গণ-মানসে লেখক দেবতা, সর্বজ্ঞ লেখক, তিনি উদাসীন, রোম্যান্টিক, স্বপ্নের জনক সাধারণের ঊর্ধ্বে এক ব্যক্তি। তাঁকে ঘিরে একটি জ্যোতি-বলয় থাকা চাই, নাহলে বই বিক্রি সহজ হবে না। রশিদ খান বোমা ফাটালে তাঁর বিবৃতি চাই, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন নিভে গেলে সেই ছাইয়ের উপর চাই তাঁর পদচিহ্ন, বন্যা হলে তিনি, ধর্ষণ হলে, ভোট হলে, কিছুই না হলে কেন কিছু হচ্ছে না সেজন্যও তাঁর মত জানতে হবে। তাঁর এই উপস্থিতি নব্বর টেন সিগারেটের স্টিকারে পর্যন্ত লক্ষ করা গিয়েছে। এই অতিমানব, জীবনের থেকে বড় মাপ ব্যবসার এক অনিবার্য শর্ত।

পাঁজড়ার গল্প ॥

এ নিবন্ধে আমাদের প্রসঙ্গ 'খেলার প্রতিভা' একটি দীর্ঘ গদ্য রচনা। তারই মুখপাত হিসাবে উপরের কয়েকটি অনুচ্ছেদ মনে হতে পারে তেমন অপরিহার্য ছিল না। এ তর্ক মূলতুবি থাক। ১৯৭০ সাল নাগাদ বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য বলে যা বহুজন কর্তৃক সমাদৃত, প্রচারিত ও পুরস্কৃত হয়েছে 'খেলার প্রতিভা' সেই গোত্রভুক্ত নয়, শুধু এ কথাটাই বলতে চাওয়া হয়েছে।
'খেলার প্রতিভা'য় আমরা দেখতে পাব বাংলার গ্রাম, বাংলার লোক-সংস্কৃতি, আচার ও বহুজন সমাজের এক পটচিত্র। গর্বের অতীত থেকে উৎখাত, দুর্ভিক্ষপীড়িত এক জনসমষ্টি, গ্রাম চলেছে অন্নের দেশের খোঁজে। চলমান এই গ্রাম দেখি আমরা। দেখি তার গার্হস্থ্য ইতিহাস। শুনি হেঁয়ালি, রসিকতা।
কিন্তু এই গ্রাম বৃত্তান্ত পশ্চিম অনুসারী বাস্তবতা নয়। আবার রবীন্দ্র যুগের ভদ্রলোক সংস্কৃতির মোড়কবন্দিও নয়। লেখক কমলকুমার মজুমদারের থেকে অনেক বড় এখানে কথক কমলকুমার। গ্রাম ও যৌথ জীবনের সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলি গ্রন্থটিতে বেশির ভাগ জায়গা দখল করেছে। বলা যেতে পারে এ এক বিমূর্তায়ন। যার দুটি

স্তর থাকলেও বেদী যৌথের সংস্কৃতি, যৌথের চেতনাস্পর্শী। লোকসংস্কৃতির চালচিত্রে শহুরে, শিক্ষিত, উচ্চ বর্গের কিছু সাংস্কৃতিক বোধ ও ধ্যান-ধারণা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই রীতি দু'য়ের ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতাকেই স্পষ্ট করে। ব্রেষটিয় অ্যালিয়েনেশন এফেক্টের মতো।

'খেলার প্রতিভা' একদমে পড়ে ফেলা অসম্ভব, এ যত টানে, দূরেও ঠেলে ঠিক ততোটাই। শুধু ভাষাশৈলী নয় চিত্রকল্পের এক সাঙ্কেতিক লিপি যেন। যার একটি অভিধান রচনার কথাও ভাবতে পারেন কেউ।

'সাবধানতা! এখনও সাবধানতা বশে ক্রমে তাহারা ভেড়ী পথ হইতে নামিল, সকলে মিলিত একটি গতি, একটি তাজ্জব কীট সদৃশ। তবুও নিশ্চিত যে এইখানে রামধনু বেগোড় হইবে না।

'এই কীট রামধনুকে প্রভাবিত করণের সূত্রত্ব বহিতেছে; তাহারা ভোর হইতে জাত হইল, তাহারা অদ্ভুতক্রমে চলিতে আছে। যখন ডান দিকে টাল সামলাইবে তখন তারা গো-পালক, যখন পিঠের উপর টাল ন্যস্ত করিতেছে তখন পিতৃত্ব; এইভাবে অনন্তকাল যে চলন—তাহার কিয়দংশ, এখন যেহেতু ফরসা হইয়াছে মাত্র, পরিষ্কার মীমাংসা করা যায় যে উহাদের মধ্যে আছে। প্রখর তাপেই যাহা নিশ্চিহ্ন হয়।'

এইটি চিত্র। শরীর দিয়ে গড়া, গ্রন্থের অন্যত্র হাড় দিয়ে গড়া চিত্রও আছে। যা বিশাল কীট তাই আবার রামধনু। অদ্ভুতক্রম চলন এক মাত্রা, তাতে পিতৃত্ব, গো-পালকত্ব ইত্যাদি ছবি মূর্ত হয়, রূপ পরিগ্রহ করে। সদা এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ, এই হয়ে ওঠার সৃজন প্রক্রিয়া 'খেলার প্রতিভা'। শরীর এখানে জীবনের অনেকখানি, শরীর-ভাষা থার্ড থিয়েটারের ঢঙ, রীতি আত্মসাৎ করেছে গ্রামটির চলায়।

আবার দেখুন:

'...তাহারা হাঁপাইতেছিল।—এই মুহূর্তে তোমাদের হাত ধরিবারে আমরা মরি; তোমাদিগের করের তালু যাহার কড়া (কার্যক্রমে নিম্নশ্রেণীর লোকদের হাতের তালুতে কড়া পড়ে, বাঁক যে বহন করে তাহার কাঁধে যে কুঁজ, এমনি বিবিধস্থানে; অনেক উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পায়ের আঙ্গুলিতে কড়া পড়ে; সেতার বাদকের মেজরাফ্ ধারণে হাতের তর্জনীতে কড়া, এমনি বিবিধ) এখন কিছুটা তত কঠিন নহে, তাহা, সেই সেই তালু স্পর্শিতে আমরা ইচ্ছুক।'

কড়া, কুঁজ ও মেজরাফের চিহ্নে শরীরের এই সব সূক্ষ্ম বদল, এই রূপান্তরও এক শিল্প-কর্ম যেমন সোমনাথ হোর অঙ্কিত 'উল্ড' চিত্রমালা।

দেহের দাবি খাদ্য, আকাল এই দেহবিনাশী। খাদ্যান্বেষণে গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করার সময় তবু দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষজন ভুলতে পারে না শিল্পসুষমামণ্ডিত যৌথের জীবন কাহিনী। বহুবিধ আচার, ব্রত, বিশ্বাস ও নৈতিকতা, যেসবে দেহধারণ হয়ে ওঠে জীবন ধারণ।

'তাহারা এই বিপর্য্যয়ে, ভাবিতে পারার তারিখা তাহারা ভুলিয়াছে, অনাহারে এখন কিছু

মনে করিতে ভাবিতে যাইলে পেট নিঙড়াইয়া মোচড়া দিবে, কহিবে, শালা সেই গিন্নি, গৃহিনী মাছটির ঘাই! শালীর নথটা পেটময় খোঁচাইতে আছে, নথ একটি বৃত্ত যাহা স্বর্ণ বা অন্য ধাতু দ্বারা গঠিত; ইহা স্ত্রীলোকরা নাসাপুটে ধারণ করে: মূর্ত্তি নিদ্ধারিণে আছে যে, নথ রিপু বৃত্তির রাশ টানিয়া থাকে!'

খাদ্য-খাদক সম্পর্কে শুধু নয় মানুষ ও মাছের মধ্যে 'গিন্নি' শব্দটি ঢুকে পড়ে সম্পর্কের এক নতুন মাত্রা রচনা করে যেন প্রয়োজনটাই সব নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত এই সম্পর্ক শিল্প বিশেষ, যেখানে 'নথ' নৃতাত্ত্বিক প্রসঙ্গও টেনে আনে। স্মরণ করায় এক নৈতিকতা, অবদমনও। আবার সেই তারাই ভেবে ফেলে '...আকালগ্রস্ত দেহের ভিতরে বাহিরে এখনও কত স্থান বাকি আছে যাহা যন্ত্রণা পাইবে! দেহ শুকায় হাঃ যাতনা বোধ শুকায় না কেন'? যন্ত্রণার অভিশাপ মনুষ্যজন্ম ঘিরে থাকে বলেই হয়ত। দেহজীবনের একেকটি পাঁজড়া দিয়ে রচিত 'খেলার প্রতিভা' সেই যন্ত্রণারই এক বিশদ বিবরণ।

বড় আশা করে এ পিঞ্জরে ॥

সাহিত্যের মোড়কে অবোধ বালক বালিকার জন্য সুখপাঠ্য ইতিহাস রচনা নয়, বা সেই ইতিহাসকে প্রামাণ্য করে তুলতে মৌজা নম্বর, দাগ নম্বর পেশ-ও নয়, পরচার ইতিহাসও নয়। কোনও ভীতু সমাজসেবী, বা সংস্কারক আত্মগোপন করে নেই এই রচনার আড়ালে।

দেহপিঞ্জর এখানে গীত। ১৯০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে সচেতন প্রয়াস ছিল যেন গীতের এই লাইনটিকেই ইম্প্রোভাইজ করা। যেমন আমরা প্রত্যক্ষ করি উচ্চাঙ্গ সংগীতে, একটি কলি ফিরে ফিরে, নানাভাবে গাওয়া হচ্ছে আর তাতে একের পর এক উন্মোচন ঘটে চলেছে। এই জিনিসটা ঘটছে চোখের সামনে। তৎক্ষণাৎ।

এই তাৎক্ষণিক ধর্ম, মুহূর্তপ্রাণ খেলার প্রতিভায় গ্রামটির চলনের শ্বাস। কেউ যেন আগাম ভেবে, পরিকল্পনা করে, পাশার চালে তা রচনা করেননি। বরং যেভাবে খেলার মাঠের ধারাভাষ্য দেওয়া হয় সেরকমই। খাদ্য অন্বেষণে তাদের এই যাত্রা দেহের টানে, ঘোর বিপদে, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে কষতে এক বস্তুময়তা স্বীকারে ('সেই দেহই এখন স্থানবাচক এবার পচিবে') বাধ্য করাচ্ছে। কিন্তু তারা জীব, জীব বস্তু, আবার তারা মানুষ যাদের স্মৃতি আছে। স্মৃতি আছে বলে ইতিহাস আছে, সেই আত্ম-জৈবনিকতা থেকে তারা মুক্ত নয়। সঙ্কটে যখন দেহ বিনাশের মুখে, দু মুঠো খাবারই যখন সব, তখনও স্মৃতি পীড়া দেয়! স্মৃতি যদি অতীত হয় স্বপ্ন এক ভবিষ্যত।

'স্বপ্ন ইহাদের নাই, স্বপ্ন এই মহলেই নাই, স্বপ্ন এক সভ্যতার, ইহা এখান হইতে বিশ ক্রোশ দূরে সেখানে যে সকল গ্রাম যেখানে শুধু বামুন কায়েতের বাস, সেখানে নারীপুরুষ শিশুরাও স্বপ্ন দেখে; স্বপ্নে পর্যন্ত্য যদি খারাপ ভবিতব্য প্রত্যক্ষ হয় তখনই মানসিক করিল। পূজা দেয়!'

বিপর্যস্ত, সর্বনাশগ্রাহ্যগ্রস্ত এই মানুষজনের স্বপ্ন বিনাশের কথাটা, স্বপ্নের নিশ্চিহ্ন

হওয়ার কথাটা কী করে তাহলে তাদের মাথায় আসে। তারা ভাবে কী করে ? যখন তাদের মন স্বপ্নের বেদী নয় তখন স্বপ্নকে বাস্তবেরও বেশি ভাবার সেই স্মৃতিই বা কী করে মনে জাগতে পারে ? অথচ কী আশ্চর্য, ভুলতে তারা পারছে না ওই কথা, স্বপ্নে বিপদের আশঙ্কা টের পেয়ে, বাস্তবে সুস্থ শিশুর হাতে তারা তাবিজ বেঁধেছে, মানত করেছে মনসা বা চণ্ডীর কাছে। আর এই যে দুর্ভিক্ষের বাস্তব, এর কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি, মনের কোথাও যে ছিল না, বাস্তবে ছিল না (অন্তত তারা তা দেখেনি, সংসার সুখে-দুঃখে চলে যেত ঠিকই), সে এসে তাদের ভিখারি করে ছেড়ে দিল।

ভিখারি আগেও ছিল, 'জাত-ভিখারি' কিন্তু শ্রীহীন ছিল না, সেই কাঙালও 'মা' বলে ডাকতে জানত এবং উচ্চারণ করত সেই পদটি, যা এখন আকালপশে ভীতিপ্রদ, অবিশ্বাস্য, শুনলে অন্তর শুকায় : 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক'।

এ এক মিশেল, রচনা। জীবন রচনাও বলতে পারি অনায়াসে। যেভাবে ধুতি, শাড়ির ফুটো তারা সূক্ষ্ম সূচোশিল্পে রিফু করে নিত, খাদ্যবস্তুর অভাবের কারণেও কখনও খিচুড়ি রান্না করত নিপুণ হাতে, ভবিষ্যৎ অভাবের আশঙ্কায় একমুঠো চাল সরিয়ে রাখত, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রেখে দিত একটি তামার পয়সা। এসবে অভাবকে তারা জীবনের একটা প্যাটার্নের মধ্যে স্থান দিয়েছিল, ওইটুকু কালি চালেন্স পিটুলি গুলে, লক্ষ্মীর পা এঁকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে ফেলত। কী হবে ওই তিলটুকুকে তাল করে। এ-ও স্বপ্ন, দৈনন্দিনের সেই ছিল বেদী। হায়, আজ সে নেই! অভাব ঘর ভেঙেছে। ভেঙেছে জীবনের সেই প্যাটার্ন। এই রচনা তারই এলিজি।

ওই যে একটি ক্ল্যাসিক প্যাটার্ন ছিল, সেইটি কি আরশি যা এই 'বিরাট জনসঙ্ঘ' ভাঙতেও দেখে ? এর প্রতিই কি, 'মেয়েছেলেটির' সেই 'ভাঙা টুকরো' চুড়িটির প্রতি তাকিয়েই কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 'হে সত্যযুগের আয়না আমাদের ভোগান্তির শেষ কোথায় ?' কিন্তু এই রচনায়, জনসঙ্ঘের এই শেষহীন, স্বপ্নবিনাশী যাত্রায় যেহেতু বাবুসকল, এলিট শ্রেণীর মুখও বিদ্যুৎচমকে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তাই এরকম হুতাশন, এরকম স্টেটমেন্টও আকাশবাণীর মতো শোনা যায়, 'আমরা আমাদের মধ্যরাত দ্বারা তোমাদের বিয়োগ করিলাম'। পাঠক মধ্যরাত প্রসঙ্গে 'মিডনাইট'স চিলড্রেন' স্মরণ করুন। হাঃ সাধের স্বাধীনতা !

তাই কি হাত এমন, 'দেখ লো চুলের কি বা দশা', 'মরণ', 'এ কোন অশান্তি গো !'

বিচ্ছিন্নদের পরিত্যক্তদের বিলাপ (বিলাপ এই রচনায় শিল্পের মাত্রা পেয়েছে) :

...'বিস্মৃত হইও না যে আমরা উপছাইয়া আছি, আমরা সতত তোমাদের পথ চাহিয়া রহি, আমরা সঞ্জীবনী ; আমাদের বাহু তোমাদের শিথান, আমরা চাল কাঁড়াই, আমরা আঁধারে ল্যাম্পো ধরি...আমরা সচে সুতো পরান ভুলি নাই !' সেই তাদেরই একজন বলে ওঠে : 'হ্যাদে দেখ তোমরা ; মোর হাত এতাদৃশ কেন, কেন এ মরণ দশার ছাইপাশ হলুদ রঙ'। যারা নাকি মৃত্যুর উল্লেখ করত, বিয়োগের কথা বলত ভিন্ন সুরে ও ভাবে। তাতে প্রকাশ থাকত গভীর মায়া, গভীর সম্বন্ধ। 'আমার মরামুখ' দেখবে

গোছের বাক্য উচ্চারণ করত। হাত, চুল, মুখ, চক্ষু, তাদের বক্ষ ও পাঁজরে মুদ্রিত ছিল ওই সম্বন্ধ। হলুদমাখা হাত নিপুণ রন্ধননিশল্পীর, মঙ্গলাচারের গাত্রহলুদ, এখন হলুদের অর্থ ন্যাবা। এখন তাদের জিহ্বা শুষ্ক, এখন প্রাণ দেহ ছেড়ে যায় যায়। দেহ খাঁচা, একটি বস্তু মাত্র পড়ে থাকবে।

'শুধু নাসিকা সক্রিয় আছে! শ্বাস লইতেছে, তাই তাহারা শুঁকিয়া অন্য কোন গল্প বাহির করিবে'।

গল্প বস্তু ও সঙ্গীত বস্তু ॥

মনে হতে পারে রূপকথা। যদিও জীবনযাপন কৌমের ক্ষেত্রে, চাকর বাকরের আচরণ নয়—আমরা জানি। সেখানে রচনার, সৃষ্টির স্পষ্ট ভূমিকা প্রত্যক্ষও করেছি। সেসবের মুদ্রা, সুর রূপকথাকেও হার মানায়। যেমন,

এক যে ছিল বুড়ি, নাতি হওয়ামাত্র সে আঁতুর ছেড়ে দৌড়ে যেত হাল ও হাল গোরুর কাছে, ডেকে ডেকে বলত, ওগো আমার নাতি এসেছে! যেত পুকুরের কাছে, বলত, ওগো আমার অমুকের কোলে সোনার চাঁদ এসেছে। ক্ষেতের কাছে গিয়ে বলত, ওগো ক্ষেত আমার নাতির যেন হাসি থাকে। রাস্তার কাছে গিয়ে বলত, ওগো রাস্তা আমার নাতি যেন সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফেরে।

এই বৃদ্ধা তার স্বামী পুত্র, পুত্রবধূরা, নাতি নাতনি ও প্রতিবেশীদের 'নিমিত্ত মৎস্যসকল এক নিয়মিত সময়ে ঘাটে ওতঃপ্রোত হয়' এবং এইটিই গল্প 'খেলার প্রতিভা'র। বা, এরকমই অজস্র গল্প জীবন্ত কৌমের খেলার প্রতিভায়। এ প্রতিভা পুস্তক রচনায়, কোনও একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখায়, সূত্র আবিষ্কারে গড়ে ওঠেনি। বেঁচে থাকা, বাঁচার নান্দনিকতা সৃষ্টিতেই তার প্রকাশ। আধুনিকতার একটি দুর্লভ লক্ষণ অজ্ঞাত, অনুচ্চারিত থেকে যাওয়া—মৎস্য সকলের মতোই তা এ জীবনে ওতপ্রোত। আবার ওই বুড়ির গল্প রূপকথাও বটে। কেননা এতে আছে আলোআঁধারি, আছে সমাজ-অর্থনীতির সূত্রগুলিকে অস্বীকারের প্রবণতা, মূর্ত বাস্তব ওই বুড়ির কাছে প্রায়শঃই অর্থহীন, প্রলাপ। এই যে অযৌক্তিকতা, উন্মাদ-সদৃশ এই অস্বীকার তাকে যেন ঠেলে দেয় বাস্তবের বৃত্তের বাইরে। সে হয়ে ওঠে রহস্যময়।

সার্বিক, সনাতনপন্থী লেখকধর্ম কমলকুমারের মধ্যে থাকায় অতীত শত হলেও গর্বের, বর্তমান এক পতন ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। গ্রামজীবনের এই সমবেত গীতে তাই অস্পষ্ট হলেও যেন শোনা যায় ইপটার (আই পি টি এ) গানের সেই কলিটিও 'হঠাৎ কখন এল শমন অনাহারের' ইত্যাদি। তদবধি শুধু যাত্রা, শুধু রাস্তা, বাঁধ, প্রান্তর।

বাঁচার প্রেরণা তবু অনিঃশেষ, দিগন্তও অতিক্রম করবে তারা আমানির খোঁজে। এ গল্প তাই দুর্ভিক্ষের, অনাহারের।

...'বাঁচিবার জন্য প্রতিতেই স্বীয় দেহকে মা ভাবিল ও সেখানে লুকাইতে চাহিল'—গল্পবস্তু মুহূর্তে সঙ্গীতবস্তু, যা ঘাটের ঝাঁক ঝাঁক মাছের মতোই ওতোপ্রোত। অক্ষর

ও শব্দের না হলেও সব শিল্পেরই নিজস্ব ভাষা আছে। সাহিত্যের ভাষা যে মানসিক চিত্রকল্প সাংবাদিকতা-সর্বস্ব এখনকার বাংলা গদ্যের চাপে আমরা তা ভুলতে বসেছি। সুর ও বাণী যদি সঙ্গীতের আত্মা ও দেহ হয় তাহলে 'খেলার প্রতিভা' প্রায় পেঁছে যায় সঙ্গীতের প্রান্তে। জনসঙ্ঘের যাত্রার বিবরণ পেশের ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলতে থাকে। কমতে-কমতে খোসা তথা বাঁহরাবরণ ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে কতবার তা হয়ে ওঠে ওই নির্যাসটুকু, যা সঙ্গীত।

মন্দিরের যেমন স্তম্ভ। কাঠামোটি দশ হাতে ধরে রাখে। অজস্র গল্পবস্তুর খেলার প্রতিভা টেরাকোটায় খচিত অসংখ্য দৃশ্য। হাজার-হাজার মানুষ পুতুলের কর্মরত ও বিভিন্ন ভাবের মন্দির চিত্র যেন। কিন্তু এখানে সঙ্গীতবস্তু স্তম্ভগুলি। তা করুণ রস, বাৎসল্য ও আরও বহুবিধ রস সৃষ্টির তা পাঁজর। হারমোনিয়ামের রিড হাভাতে মানুষজন। তাই দেহ এতখানি। নেই নায়ক নায়িকা, চরিত্র, এমনকি আমরা জানতে পারি না একজনেরও নাম।

এই রচনার স্থান কাল আছে। আছে একটি লৌকিক পটভূমি। দক্ষিণবঙ্গ। দক্ষিণবঙ্গের খাল-খাঁড়ি-নদী ও স্থলভাগ পরস্পর মাখামাখি। তাদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এখানে গল্পবস্তু ও সঙ্গীতবস্তুও সেই জলস্থল। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য তারা প্রকট না করে আত্মগোপন করেছে পরস্পরের মধ্যে। যেজন্য সঙ্গীত এখানে চিন্তাও। গল্পবস্তু ল্যান্ডস্কেপ। কেন্দ্র তাই একটি নগ্ন বহু, অজস্র সৌর সংসার। প্রান্ত যেজন্য টানতে পারে। আবার এরকম একটি প্রকৃত গতিশীল প্যাটার্ন যেহেতু নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে গড়ছে তাই কেন্দ্রেরও আছে দারুণ পরিবর্তনশীলতা।

একটি বাক্যাংশ···'কল্পনার চোখ অবধি জল।' বিসর্জনের প্রতিমার চোখে দশমীতে যা দেখে থাকেন কল্পনাপ্রবণ মানুষজন। এখানে এই মন্তব্য বা পর্যবেক্ষণ সুন্দরবনের লৌকিকদেবতা দক্ষিণ রায়ের 'অদ্ভুত কল্পনার চোখ' সম্পর্কে। আমরা দেখব শৈল্পিক সূক্ষ্ম সামঞ্জস্যরক্ষায় কী অসামান্য নৈপুণ্যই না দেখালেন কমলকুমার। এবং এই নৈপুণ্যের একটি গাণিতিক স্তরও রয়েছে :

মন্তব্যটির একটি প্রেক্ষাপট আছে, তা এরকম :

···'মহান দাতা চাউল যখন দিতে আসেন, তখন অসংখ্য হাভাতে তাঁহাকে ঘিরিয়াছিল, হাভাতেরা আঁচড়াইল, কামড়াইল, প্রহারিল ; দাতা রক্তাক্ত দেহে মরিলেন, চাউল ছড়াইয়া পড়িল, চাউল পাখীতে খাইল! আমরা বলি যে ঐ ঘটনা মিথ্যা মানিতে চাহি না।'

এ ঘটনার সত্য মিথ্যা অপ্রাসঙ্গিক। প্যালাস অ্যাথিনে যেভাবে জিউসের মাথা থেকে ভূমিষ্ঠ হন পূর্ণরূপে। সমগ্র হিসাবে। যাকে আমরা অখণ্ডরূপ ও আকৃতি বলে থাকি। জিউসের থেকে অ্যাথিনের জন্ম তার সৃষ্টিই বড় কথা। লেখকের থেকে লেখার। যেন এরকম এক অখন্ড রূপ পৃথিবীর কোথাও না কোথাও ছিলই। লেখক আবিষ্কর্তা মাত্র।

মহান দাতা ও হাভাতের এই সঙ্ঘর্ষ প্রকৃতই না ঘটেও থাকতে পারে। কিন্তু খেলার প্রতিভায় এটা ঘটল আচম্বিতে, কল্পনার তাতে কিছু অবদান আছে। সেই চোখ, দৃষ্টি সে। কিন্তু এ দৃশ্য তো তাকেও পীড়া দেয়। কল্পনার চোখ, জল, এইসব এখন জলবৎ। গ্রন্থের শুরুতে, প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যাংশে কমলবাবু যে লিখেছেন…'আমরা হই অতীব সরল, যেইটি হয় আমাদের সব' এ আদৌ লেখার ঝোঁকে, লেখা নয়। এ দেশীয় শিল্পকর্মের রসাস্বাদনে শুধু নয় রচনায়ও কোনও নৈর্ব্যক্তিক রক্তহীনতার স্থান নেই। কীর্তনিয়ার দু-চোখে অশ্রুধারা নামে।

আবার লেখকের নৈর্ব্যক্তিকতা এখানে জিজ্ঞায়িত নয়, রুমালের খুঁটে আড়ালে কে চোখ মুছতে যাবে এখানে! লেখা তো মায়া, জাদু, আমি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করলাম—এ রকম ঘটেনি, ঘটতে পারে না। তাতে অভিঘাত বেড়ে গেল আরও বহুগুণ। সৃষ্টি ও ধ্বংসে, স্বীকার-অস্বীকারে, শিশুর সারল্যে নির্দেশিত হল একটি দিক—এই মরুভূমি আমার দেশ নয়, সেখানে এমন নির্দয় ঘটনা ঘটে না।

এ তাই দুঃস্বপ্ন। আবার তা চিত্রকল্প, চিত্রভাবনাও বটে। ব্যঞ্জনাময় এক প্রতীক। অন্যভাবে, অন্যভাষায় তা ব্যক্ত হবার নয়। সাহিত্য ভাষা-শিল্প, তাই এই উন্মোচন ভাষাতেই। কিন্তু সে ভাষা চিরনবীন, সদ্যোজাত, তার শরীরে সেইরকম রোঁয়া আছে, রক্তের দাগও।

বক্তৃতামঞ্চ নয়, সম্পাদকীয় স্তম্ভ নয়, প্রতিবেদন নয়—এইসবে ভাষা নিঃশেষিত, জীর্ণ হয়েছে। চোখ ও জল এই রচনায় আরও কয়েকবার ঘুরে ফিরে এসেছে, তা আকাশ ও শিশির হয়েছে : 'শিশিরে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়।' এভাবে ধানের শীষ ও তার উপর একটি শিশিরবিন্দুর ইতিহাস সমৃদ্ধতর হল।

বুড়ি পৃথিবী ॥

পৃথিবী এক বৃদ্ধা, ঢের-ঢের বয়স হয়েছে এখানকার নরনারীদের। সভ্যতা পত্রমোচী বৃক্ষ হতে না পেরে কেবলই জীর্ণ থেকে জীর্ণতর। আর নেই নতুন কোনও গল্পের সম্ভাবনা। শিল্প তাই ঐতিহ্য শোষণকারী। এখানে জ' ককতোর সঙ্গে কমল-কুমারের কোনও ভেদ নেই। একমাত্র পুনরুজ্জীবনেই রূপ পরিগ্রহ করতে পারে নতুন শিল্প। তাই ফিরে তাকাও উৎসের দিকে। মানুষের অন্তর্গত নির্বাসনের বীজ রয়ে গিয়েছে ভাষার মধ্যেই। ভাষা শিল্পী এই ইতিহাস খুঁড়ে দেখবেন ও কিছু হীরকখণ্ড তুলে আনবেন এটাই সঙ্গত, স্বাভাবিক। আধুনিক লেখক তাই একান্তভাবেই হবেন এক মননশীল পাঠক। তাঁর সৃজনক্ষমতার একটি বড় স্তম্ভ হল উঁচুদরের ওই পাঠক-বৃত্তি। সৃজনক্ষম এই পাঠকের রচনা বস্তুত এক সমালোচনা, ব্যাখ্যা, টীকা ও মন্তব্য। একালে তাই ঈশ্বরপ্রতিম লেখক নেই, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হয়ত এই মৃত্যুঘণ্টা বেজেছিল, সাহিত্যভাষা সৃষ্টির ঊষাতেই, মহাকাব্য রচনার কালেই। আমরা কান পেতে শুনিনি এইযা।

ককতোর 'অফি' চিত্রনাট্যের কথা স্মরণ করুন। বাঙালি নারীর নিতান্ত ঘরোয়া বিস্ময়-প্রকাশ ধ্বনি 'ইস মাগো!' ককতো স্পর্শ করে উচ্চারিত হচ্ছে এমনটা কখনও দেখিনি। ককতোর চিত্রনাট্যে আয়নার মধ্য দিয়ে মৃত্যুর আগমন ও নিষ্ক্রমণের কথা আছে। আর 'খেলার প্রতিভা'য় দেখি :

'আয়না বহিয়া, আয়নার ভিতর দিয়া আইসে ; ইস মাগো !··· এ হেন যে ভাবিল, যে মৃত্যু আয়না দিয়া আইসে, সেই কবি সাক্ষাৎ কত পুণ্যের !'

পাপপুণ্যের গপ্‌পে আমরা না হয় নাই থাকলাম কিন্তু আমরা তো জানি দুর্ভিক্ষ-মিছিলে এমন নারীও আছে যার বর্তুল হাত আজ হাড়-সর্বস্ব হওয়া সত্ত্বেও সে হাতে চুড়ি এখনও আছে। এবং ওই চুড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ হবে, সেখানে প্রতিফলিত হবে আলো।

'ঐ চুড়ী ভাঙিবে এবং এই কূট বাস্তবতার সহিত মিশিবে। তখন জলে জল !'

অতি সাধারণ, গ্রামের এই মেয়েদের জলের সামনে মুখ রাখতেও দেখেছি। জল তখন আয়না। সেখানে নিজের মুখ নয় তারা মৃত্যুনারীকেই দেখে, যা দুর্ভিক্ষও বটে। ককতোর প্রতিভার থেকে এই গ্রামীণ মেয়েদের প্রতিভা তাহলে কোনও অংশে কম নয়। তারা এসব কথা লেখেনি, ফিল্ম বানায়নি। শিল্প তাদের জীবনে ওতোপ্রোত। শিল্প বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র হয়নি বলেই গ্রামের ওই মেয়েটি ও অন্যরা ককতো নয়।

তারা ভয়ঙ্কর এক দুর্দশার শিকার। ধ্বংস হচ্ছে জীবন, যে জীবনে ছিল হাজারো সূক্ষ্ম শিল্প। ওইসব জীবনশীর্ষ, তারা ভাবে। আর এখন কী মর্মান্তিক পতন।

এরা যে অনাহারে জীবন কাটাবার জন্য জন্মায়নি, এদেরও অলঙ্কার বুদ্ধি ছিল, সেসবের আর চিহ্নমাত্র থাকবে না। ভয়ঙ্কর ও সর্বগ্রাসী সেই নেতি, সেই 'না'-এর বিপুলে যা মিশবে, যা পড়বে সমস্তই না হয়ে যাবে। জলে যেমন জল।

এই প্রসঙ্গে কমলবাবু গোতিয়ের এক চিত্রকল্প আমাদের স্মরণ করান :

'গোতিয়ে-এর লেখার মধ্যে এমন এক জলাশয়ের কথা আছে, পদ্মের মধ্যে নৌকা ভ্রমণ— এখানে শব্দের ennui শব্দের ব্যবহার লাগসই !'

অন্যত্র—

···'মহিমার এবম্বিধ যোগপাট ! হাঁস, জলকণা, মেয়েছেলে !'

মানবের শৈশবের স্বপ্ন, বাস্তব, রূপকথা। কমলকুমারের স্মৃতিকাতরতা বলে একে গণ্য করলে ভুল হবে। এখানে গোতিয়ে প্রসঙ্গে এমন এক কাব্যামোদে তিনি ডোবেন যে এরপর নৈঃশব্দ ছাড়া কিছু থাকে না। এ যেমন শ্রদ্ধাঞ্জলি তেমনি একটি ফাঁক রচনাও বটে। ওই ফাঁক, ওইটুকু যতি তথা বিরাম ভারসাম্যের স্তম্ভ বিশেষ। গদ্য-পদ্য এতে একাকার। 'খেলার প্রতিভা' সময়চ্যুত, স্থানচ্যুতও বটে। স্থান কাল তখন পৃথিবী ও আদি অন্তহীন সময়। কমলকুমার তখন লেখক নন। আবার ইতিপূর্বে লেখকের মৃত্যু সম্পর্কে আমরা যে কথা বলেছি তাঁর অবস্থান হুবহু সেইরকম না—লেখকের

(সাহিত্যিক অর্থে) নয়। বরং বলা যায় তিনি এক অন্তর্বর্তী লেখক। তাঁর অবস্থান ধ্রুপদী লেখক ও না-লেখকের মধ্যে।

এখানে প্রতিভার যে খেলাটি আমরা ক্রমোন্মোচিত হতে দেখি তা যেন বার্গম্যানের ছবির চিত্রকল্প : মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলা।

দৃষ্টান্ত : ১

'ও পো'র বাপ, ত্বরা পাকুড় পোঁত গে !
ও পো'র বাপ, কোমর বাঁধা, কাঁঠাল পোঁত গে।
ও পো'র বাপ, জলদিকর উত্তরেতে নিম পোঁত গে'।

এই ছড়া, সঙ্গীত ছন্দ শেষ হতেই গদ্যকারের টীকা ও মন্তব্য—

দৃষ্টান্ত : ২

'পাকুড় তথা অশত্থ ঐ মহৎ সনাতন বৃক্ষ উহার ধর্ম্ম হইক, কাঁঠাল উহার মলমাংসের খাদ্য, নিম উহার দুয়ারে ঢাল তলোয়ার লইয়া জাগুক ! তাহা সত্ত্বে বেচারীকে উক্ত মাতৃরূপ সকল আটকাইতে গোহরানিল ; এবং চিকিতেই সে ক্রমে বিকট হয় !
হায়, সময় যদি ঈদৃশী খুনখারাবী কালসিটে গ্রস্ত না হইত ; ভগবানের মার যদি না নামিয়া আসিত !'...

ভগবানের মারে, আকালের গ্রাসে মৃত্যু পথযাত্রী ওই মানুষজন অশ্বত্থ, কাঁঠাল ও নিমের মধ্যে বৃক্ষ নয় প্রত্যক্ষ করেছিল মাকে। তারা প্রকৃতিমানুষ, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াই মৃত্যু, যে মৃত্যু ক্রমে গড়ে উঠেছে, অগোচরে এবং এখন চিকিতে বিকট। মৃত্যুর এই ঘেরাটোপের মধ্যেও কী করে মেয়েটি চক্রাকারে নাচে।

...'আঃ ঐ সেই ঘুরন্ত অবলা !'

যেন বসুধা। আবার এইটি প্রতীকতম হওয়ায়, লেখকের হস্তক্ষেপও ঘটে, 'এখানে উল্লেখ যে এইভাবে ক্রমান্বয়ে চক্র দেওয়া অসম্ভব—কিন্তু আমাদের বাস্তবতা বোধের মীমাংসায় উহারা আষাঢ়ে নহে'।

আমাদের শৈশব, জীবন অন্যরকম ছিল। এইটি গর্ব। এইখানে কমলবাবু বড় মাপের ধ্রুপদী শিল্পী। লক্ষণাদি মিলে যায়। ভবিষ্যৎ জানি না। কিন্তু একথা যেন হলফ করে বলতে পারছেন আমাদের অতীত ছিল স্বর্ণখচিত। সেই অহঙ্কার ও গর্বে ঘুণ ধরেছে। আকাল তাই চিকিতে বিকট হলেও তার দাঁত অতীত গৌরব ধ্বংস করে চলেছিল অনেক আগে থেকেই ইংরেজ জমানার ভূমিসংস্কার, সহজ স্বাভাবিক সমাজ ব্যবস্থার উপর সিভিল কোর্ট স্থাপন, রেলপথ, জেলখানা, সবই একেকটি দাঁত।

কেমন ছিল সেই অতীত : আঁধারে লাঠি ঠুকে বা হাততালি দিয়ে চলেছি—পাছে সাপের গায়ে পা পড়ে, পরের ক্ষেতের জল কেটে নেওয়ার গল্প শুনে, যারা কাটে সমস্বরে তাদের ডেকেছি—'ও তোরা আয়, আমাদের দেশে, ছিঃ পরের আল কাটা' !

আর এখন ঘুরন্ত অবলার কেশ উড়ছে। 'আমাদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছে' যে আমরা পেট না পড়ে ভেবে শুকনো চাল চিবিয়েছি, কারও শুষ্ক মুখ দেখে আগাম বলেছি,

তুমি বড় ক্ষুধার্ত, এসো চাট্টি মুখে দাও। দুয়ারে যে এসেছে তাকেই অতিথি গণ্য করেছি। কত গল্প আছে এ নিয়ে।
এখন 'আকালের ঘাস মানুষের মাই খায়!' ...'হায় এ দেহতে মানুষ ও প্রকৃতি দুইই মরে'।

নির্বাসন ॥

বেচাকেনা নয়। বেচাকেনার শিল্পে জ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে স্পর্শাতুর, উৎসাহী হওয়া চলবে না। যেভাবে হোক তাকে একটা সরল রেখায় পাঠকের তুষ্টি করতে হবে। কখনও তা গল্প সাজানোর গোয়েন্দাগিরি, কখনও-বা সমাজপিতাদের কথা মাথায় রেখে মোটা দাগের সমাজচেতনা ইত্যাদি করে যেতে হবে। শিল্পের মোড়কে জোলো সমাজতত্ত্ব, বা নীতিকথা একদিকে, অন্যদিকে বয়ঃসন্ধিক্ষণে পড়া চটি পর্নোপুস্তক নীল শায়ার উন্নত সংস্করণ কিংবা গোয়েন্দা গল্প। সকলের পথ তো হতে পারে না, একটা ধাতের ব্যাপারও থাকে। কমলবাবুর ছিল শিল্পের ধাত, তাই তাঁর পুরস্কার নির্বাসন।
'খেলার প্রতিভা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ সালে। দেশে নকশাল বিপ্লবের শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাওয়ারও পরে। নকশাল বিপ্লব সাতচল্লিশ-উত্তর দেশে গ্রাম ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের কথা বিপুল চিৎকারে, রক্তপাতে এবং আত্মত্যাগে একেবারে সামনে এনে দেয়। গ্রাম ও বিপ্লব জড়িয়ে বেশ কয়েকজন উপন্যাস-টুপন্যাস লিখলেন তখন। তাঁদের অনেকের ব্রাহ্মণ বিদায় ও সমাধা হয়েছে পুরস্কার দিয়ে। সত্তরের সাহসী ছেলেরা গ্রামের পতাকা হাতে নিলেও এই অবোধরা গ্রাম ও গ্রামসমাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না— এরকম একটা ব্যথা কমলবাবুর ছিল। হতে পারে 'খেলার প্রতিভা' রচনায় এভাবেও তিনি প্ররোচিত হয়েছিলেন। এই গ্রন্থের প্রকাশক প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়, যে ছিল তখন প্রেসিডেন্সির ছাত্র এবং ওই আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মী। প্রিয়-র সঙ্গে কমলবাবুর অনেক তর্কের কথা একসময় শুনেছি। তর্কের কেন্দ্রে থাকত গ্রাম, গ্রামের মানুষ, সমাজ। এই তথ্যটুকু কাজে লাগতে পারে ভেবে লিখে ফেললাম।
এখন নির্বাসন প্রসঙ্গ। সাতের দশকের চিহ্ন এই রচনার ভাষায় খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কমলকুমারের অন্যান্য রচনার যে সাধারণ ভাষা মেজাজ এখানে তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভাষার এই মেজাজ যেন সময়ের বিপরীতধর্মী। আবার তাই-বা কেন, সময়ের তো দুটি মুখই বর্তমান, অগ্র ও পশ্চাৎ। সময় যেতে পারে দুদিকেই। যেমন, মৃত্যুপথযাত্রীদের সম্পর্কে যদি বলা হয়, তারা অতিমাত্রায় জীবিত, তাতে ভূত ও ভবিষ্যতের টানাপোড়েনে সৃষ্টি হতে পারে এক মোক্ষম মুহূর্ত, যা সত্যও বটে।
...'এখানে "তাহারা" বদলে মানুষ লেখা যাইত, তাহাতে এখনকার ভাগ্যহীনরা চোখের সামনে হইতে সরিয়া একটা সাংবাদিক রূপ লইত, সৌখীনতা নিছক যাহা ; তাহারা ত দারুণভাবে জীয়িয়া আছে।' অথচ এই 'তাহারা'-র একজনেরও নাম আমরা জানতে পারি না, কারও সম্পর্কে বড়জোর লেখা হয়, 'আয়নাদার চুড়ী যাহার ছিল, সে'...।

ফলে 'সে' অপেক্ষা 'আয়নাদার চুড়ী' বড় হয়ে ওঠে, তাতে 'সে' নির্বিশেষ, যে আবার দেহভাষা ও কিছু মুদ্রায় বিশেষও বটে। এভাবে বহু লীলা সৃষ্ট হয়। কেন্দ্রে এক। জীবন মৃত্যু, আলো-অন্ধকার—আদি সারল্য। তা কেমন বুঝতে এই গল্পের একটি চিত্রকল্পই যথেষ্ট (অজস্র, স্বাধীন টুকরো গল্পের যে মোজাইক এখানে সৃষ্ট তার প্রতিটিই চিত্রকল্প বিশেষ) :

'আমার এই সানকিটা নদীতে ফেলিয়া দিও! ইহা দেখিলে পাখীরা চঞ্চু পর্য্যন্ত হারাইবে'—এইরকম উন্মাদকল্পনা একমাত্র রূপকথায়, লোককথায়, সারল্যের গল্পেই সম্ভব। এর এক শতাংশ কাব্যশক্তির জোরে কত লোক রাজকবি হয়ে গেল।

'খেলার প্রতিভা'র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ লক্ষ করুন :

'এই সকল লোক তথাহি দল, যে ইহাদের দেহ যেটুকু তাহাতে লজ্জা আছে, বসন যেটুকুন আছে তাহা রেললাইন আছে বলিয়া আছে, ইলেকট্রিক আছে বলিয়া, সম্মানে, স্ত্রীলোকদেরও ; হায় স্ত্রীলোকেরা, ইহাদের বসনপ্রান্ত এমনধারা যে অপরাহ্নের ঈষৎ হাওয়াতে যদিস্যাৎ শব্দিত, যদি ক্বচিৎ বেসামাল, তবে তাহারা কহিল, মরণদশা! বাতাস কীদৃশী হয় লা'!

কমলকুমারের ভাষার সঙ্গে যে পাঠক পরিচিত নন তাঁর পক্ষে একথা মনে করা অসম্ভব নয় 'ঠিক যেন বঙ্কিম পড়ছি'। কিন্তু এই পাঠক যদি একটু মনোযোগী হন তাহলে দেখবেন বঙ্কিম শব্দু বহিরঙ্গে, তাও সর্বত্র নয়। আবার সাদৃশ্য যেটুকু তাই বা বঙ্কিম কেন, বলা যেতে পারে এ হল রবীন্দ্রপূর্ব যুগের বাংলা গদ্য। ওই একজন, রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যকে এক লহমায় 'আধুনিক' করে ছেড়েছেন। এইটি নিশ্চয়ই খুবই বড় একটা প্রাপ্তি কিন্তু এই লহমা বিপ্লবের যে কিছু বিপদও ছিল আজ তা যথেষ্ট টের পাওয়া যাচ্ছে সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যের হাল দেখে। বহুজনের রচনায় একটা ন্যূনতম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভাষাটা গড়েপিটে নিতে পারলে, বিভিন্ন-ক্ষেত্রে তাকে খাটাতে পারলে এই করুণ দশা হতো না।

এইটি কমলকুমার ভালরকম উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সাম্প্রতিক জোলো ভাষা খুকু গদ্যের দিকে কোনও টান অনুভব করেননি। বেছে নিয়েছিলেন ইতিহাসের ফেলে আসা অধ্যায়ের অপূর্ণ কাজ। অতীব নিষ্ঠা এবং প্রেমে সেই কর্তব্য নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এরকম অযৌক্তিক কাজ উন্মাদ শিল্পী ও ভাষাপ্রেমীর পক্ষেই সম্ভব। কমলকুমার তাই আমাদের সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতু।

নতুনের আবাহনে প্রাচীন ধ্বংস হয় না নবরূপ পরিগ্রহ করে, আরও সমৃদ্ধ হয়। একেই আমরা বলব ঐতিহ্যচেতনার সৃজনশীল প্রকাশ, যা মূর্ত কমলকুমারের গদ্যে। তাঁর উৎস সংস্কৃত সাহিত্য ও লোক সংস্কৃতি। এ দুই অস্ত্রে তিনি যুদ্ধ করেছেন এলিট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, বাবুদের বিরুদ্ধে। বঙ্কিমও যার অন্তর্গত। কমলকুমার বঙ্কিমের প্লট রীতি স্পর্শ পর্যন্ত করে দেখেননি। কারও সাধ্য নেই এই রচনার কোনও সারসংক্ষেপ করেন। তাই এখনকার মগজহীন সমালোচকরা যেভাবে একটি উপন্যাসের

সমালোচনা করতে গিয়ে লেখকের বলা গল্পটি ফের বলে যান, 'খেলার প্রতিভা' সম্পর্কে তাঁদের এ জাতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে এটা অনায়াসে করা যায়।

বঙ্কিম স্মৃতি শুধু 'যদিস্যাৎ', 'কীদৃশী' এইরকম দু-একটি শব্দেই সীমিত, লিখন-রীতি স্বতন্ত্র, এযেন বর্তমানকে প্রাচীনত্ব দান। যাতে 'রেললাইন' শুধু নয় 'ইলেকট্রিক'-এর থাকাটাও পিছিয়ে যেতে পারে কয়েক শতক। 'মন্দির' এই শব্দটি উচ্চারণই এখন ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, যদিও মনে ভেসে আসছে প্রাচীন এক মন্দির, অনুমান করুন পাঁচশো বছর পরের তাজ বেঙ্গল হোটেলটি। ওটি তখন নির্ঘাৎ প্রাচীন স্থাপত্যের এক দ্রষ্টব্য। নান্দনিক দিক থেকে না হলেও।

ধ্রুপদী মেজাজ, মোড়কে আধুনিককে, বর্তমান তথা সাম্প্রতিককে ঘিরে ফেলা, তাকে একটি সুরক্ষাবলয় দানই যেন কমলকুমারের লক্ষ্য। বা, উল্টোদিক থেকেও ভাবা সম্ভব, বর্তমান তাঁর শিল্পচেতনায় অতীত, যেন এক ভবিষ্যতের শিল্পী বর্তমানকে দেখছেন। আবার এই দেখা, লেখকের দ্রষ্টার ভূমিকাও তিনি নিজের মতো গড়েপিটে নিয়েছেন, সেকথা পরে হবে।

সাহিত্য রচনা যেমন সাহিত্যের বিকাশ আবার তা সাহিত্যের সমালোচনাও বটে, এই সমালোচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের উল্টোদিকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কমল-কুমারকে। একা তিনিই এর প্রতিপক্ষ। কেউ একে নির্বাসন বলতে পারেন, বা হয়ত একটু শুধরে বলবেন স্বেচ্ছা নির্বাসন। আমরা একে নির্বাচনও বলতে পারি, সম্ভবত তাহলেই কমলকুমারের প্রতি শুধু নয় আমাদের সাহিত্যের প্রতিও সুবিচার করা হবে।

গল্প উপন্যাসের কাঠামো, তার ব্যাকরণ সাহেবদের মতো হতে হবে, এই মাথার দিব্যি পাকাপাকিভাবে মেনে নেওয়া হয় বঙ্কিমযুগে, আমাদের সাহিত্য সম্রাট সাম্রাজ্য বিস্তারে এই মদতটুকু করেন। আখ্যান, নকশা, মঙ্গলকাব্য, চরিতকথা, কেচ্ছা ও সমস্ত রঙ্গরস বিসর্জনে তৎপর হয়ে ওঠেন বঙ্কিম পরবর্তী যুগের লেখককুল। গল্পের টানে পাঠকতোষণ, সামাজিক বক্তব্য ও নীতিকথার মিশেলে ইংরেজি শিক্ষিত ভদ্রজনের জন্য সাহিত্য রচনার সেই ঢেউ রবীন্দ্রযুগ পর্যন্ত প্রশ্নহীন, বাধাহীন তরতর বয়ে চলে। বাংলাসাহিত্যের বয়স খুব কম, তুলনায় অনেক বেশি পরিণত ; এরকম গর্বের কথাও আমরা অনেক শুনেছি। হয়ত কালে সাহেবের নন্দনতত্ত্ব আমরা হজমও করতে পেরেছি। এবং যেহেতু আমাদের সাহিত্য ভদ্রলোকের সাহিত্য, ছোটলোকের নয় এবং ভদ্রলোকরা আন্তর্জাতিক জীব তাই সেসব এখন মানিয়েও যায়। কল্লোলের পাঁকের পর থেকে ছোটলোক আমাদের সাহিত্যে এসেছে ঠিকই, আর এখন তো প্রগতিশীল সাহিত্য রচনার একটা পূর্বশর্তই হল ছোটলোক আমদানি। কিন্তু তারা এসেছে ভদ্রলোকের বিনোদনের স্বার্থে।

ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া একটি অধ্যায়ের দায়িত্ব উন্মাদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব, কমল-

কুমার সেই উন্মাদ। আমি কোনও টানটান ওঠাপড়ার গল্প বলব না, বক্তব্য পেশ করতে যাব না, শুধু মুখের ভাষা বা কেতাবের ভাষায় সাহিত্য রচনা করব না, লেখার পিছনে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনও ছক—যেন এইরকম লিখতে চেয়েছিলেন। লেখার এই রকম, কীভাবে লিখব এই প্রশ্ন থেকেই উৎসারিত তাঁর সাহিত্য। তিনি প্রাচীন ও রক্ষণশীল এই অর্থে যে রচনার পিছনে আছেন এক দ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ লেখক, আছে শীতল নৈর্ব্যক্তিকতা এবং গভীর দরদ দুই-ই।

এ শুধু বিবরণ, ন্যারেশন, ন্যারেটিভ কিন্তু সাহেবদের মতো নয়, সংস্কৃতঘেঁষা, বিশ্ব-সাহিত্য শোষণ করে রচিত বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের এক বিকল্প সাহিত্য। সংস্কৃতের বোঝা ঝেড়ে ফেলে রাতারাতি স্বাবলম্বী বাংলা গদ্য নয়। গণিতজ্ঞের বুদ্ধিতে রচিত বাহারি প্লটের গল্প উপন্যাস নয়। এ এক ভাষা স্রোত যেখানে বাঙালি গার্হস্থ্য জীবন, লোকজীবনের আচার, প্রবাদ-প্রবচন, ধর্মশাস্ত্রের মীমাংসা সমস্তই কিছু রেখে যায়, স্রোতটি হয়ে ওঠে জীবনস্রোত, চলমান এক ইতিহাস (ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে নয়, গ্রহণ বর্জনে নয়, তার সংগ্রহ চরিত্রে)। ইতিহাস শব্দটি এখানে খুব লঘুভাবে ব্যবহৃত হল। সঠিক শব্দটি সম্ভবত হবে বাঙালি জীবনেতিহাসের কোনও একটি পর্বের মহাফেজখানা। 'খেলার প্রতিভা' আমাদের বলে দেয় এই জীবন ইতিহাস সংস্কৃতির। জীবন যেন অজস্র উৎস ও উপাদান আর তার সৃষ্টি মাত্র একটিই, তা হল সংস্কৃতি। এই বিমূর্তকে তিনি খুঁজেছেন নানা লোকাচারে, এমনকি স্নানের ঘাটেও।

কল্পনায় বাস ॥

সোনার বাংলা কল্পনা। অতীত গৌরবের অনেকখানিই তাই অলীক কিন্তু মিথ্যা নয়। মিথ্যা ও কল্পনার মধ্যে আমরা তফাত করি।

...'আমরা সমৃদ্ধিতে ছিলাম, ঘরে মরাই ছিল—কাঁসি সমেত কুকুরে দিতাম'...এখানেই শেষ নয়...'আমরা পরের ক্ষেতের জল কাটিয়া লওয়ার গল্প শুনিয়া সমস্বরে যাহারা কাটে, তাহাদের ডাকিয়াছি—ও তোরা আয়, আমাদের দেশে, ছিঃ পরের আল কাটা'—ছিল ভূমি, জলসম্পদ, বাস্তবে কল্পনায়। তাহলে কি অনাহার ছিল না, দাসত্ব ছিল না ?

তবু 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক' একথা আজও ভিখারি বলে। ভিখারি আছে, ছিল। ভবিষ্যতের ভিখারিও কি এই সাবেক পদ উচ্চারণ করে, তাতে সুর সংযোজন করে ভিক্ষা চাইবে ?

এখন তো 'চিমটি কাটিলে' লাগে না, সমাজপিতা, মাথার উপরে থাকা বাবুদের উদ্দেশে নিবেদন করে 'বাবু মহাশয় ইচ্ছা করে আপনাদের কোলে মুখ লুকাইয়া এ জনমের শোধ কান্দিয়া লই', 'বাবু মহাশয় আপনকার দিককারি আমাদের বড় কষ্ট দেয় !' আবার একথাও তো মনে পড়ে যায় যে একদা তারা, এই হাভাতেরা, গৃহহীন, উৎখাত সমাজের বাইরে, দেশের বাইরে নিক্ষিপ্ত প্রান্তজন, দরিদ্র কৃষকরা ভিন্ন আচরণও

জানত : 'অতীব সন্তর্পণে আপন লাঙ্গল রাখে যাহাতে নিকোন স্থান খারাপ না হয়'… বাসি মুখে, এলোচুলে রমণীরা কখনও এই লাঙল ছোঁবে না।

এসব আর নেই, তার পরিবর্তে আছে এই চিত্রকল্পটি :

'পুলিসবর্গের দৃষ্টি হেড দারোগার পেটের, ইহা হাপরিত হইতে আছে, প্রতি আকৃষ্ট থাকে ; ততঃ ঐখান হইতে চোখ ঘুরাইয়া, তাহারা গ্রামের দিকে নেহারিল ; উহা নিথর এক বসতি চিহ্নমাত্র ; চারদিকে জল, জোয়ার ভাটা হয়, আর চাঁদের আলো !'

গ্রামটি কি তাহলে ওই দারোগা খেল, খেল আইন যে এই আকালেও 'আইন রোগা হয় নাই'। 'পুলিসবৃন্দ তদ্রূপ হাঁকিতে আছিল'…তাদের শরীরে কী একটা উড়ছে 'তবে কি উহা শরীর নহে উর্দ্দি !' যেজন্য 'কোর্ট তোমাদের সাক্ষী নাকোচ করিবে' !

রোগা না হওয়া আইন, দারোগার পেট ইত্যাদি বাবুরা মাথায় স্থান দিয়েছেন, কোর্ট বসিয়েছেন মাথায়। আর সেসবের ভয়ঙ্কর চাপেও তারা, গ্রামটি, গ্রামগুলি, হাভাতে হল। কিন্তু প্রতিবাদ করল না, প্রতিবাদ যেন তাদের রক্তে নেই, ঐতিহ্যে নেই। বড়জোর প্রশ্ন করতে পারে :

'পাগল ! পাগল ! আমরা কি চোর ! চোর যদি নহি তবে এ জাঁত দুর্ভোগ কেন।'

শুধু জানতে চায়, কেন তাদের এই হাঁড়ির হাল ?

এখন তারা ক্রন্দনযন্ত্র মাত্র 'হাড়সার বক্ষ ! হৃদয় নাই, ফুসফুস নাই'—

'খেলার প্রতিভা' গ্রন্থটির এক এলোমেলো পাঠ হয়ত এ রচনা। বহুজন বহুরকমে 'খেলার প্রতিভা' পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারেন, এই পর্যন্ত এসে আমার দমে এতটাই টান পড়েছে যে কষ্ট হচ্ছে। এ রচনা এখানেই শেষ হবে, গ্রন্থটির ১২৮ পৃষ্ঠায় লেখকের সরাসরি প্রবেশ ঘটে একটি বাক্যে 'কত বিবিধ ইতরোমির মধ্যে বসিয়া এই লেখা লিখিতেছি তাহা ভগবানই জানেন না।' ইতরোমি এখন লক্ষগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু ওই লেখকটি আর নেই।□

কমলকুমার এই রচনায় ক্ষুধার তুলনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় স্মরণ করেছেন বাসওয়ালৎ-এর খোদিত চণ্ডিকা মূর্তি। ওই মূর্তির উদরে এক 'কুরকর্ম্মী' বৃশ্চিক আছে।

□ Space Donated By A Well Wisher □

আমি এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে

উদয়ন ঘোষ

উদয়ন ঘোষের এই রচনাটি দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি প্রকাশিত হয়েছিল যোগসূত্র, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ সংখ্যায়। এবার প্রকাশিত হল দ্বিতীয় তথা শেষ অংশটি।

পঞ্চম অধ্যায়

এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে ঘুরে যায়

বীর্যসংক্রান্ত সমস্যায় পড়ি প্রথম, মনে আছে ভালো ক্লাশ সেভেনের অ্যানুয়াল পরীক্ষা দেবার পর, শীতে। তখন থেকেই স্বরভঙ্গ আমার, আজও গেল না।
তখন সবে বিবেকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। তখন বিবেকের গানের সুরের ছোঁয়াচ লাগত মনে, খুব। তার কোকিল-কণ্ঠী গীতশ্রী মেজদির দৌলতে, তখন থেকেই সঠিক সুরে গান গাইতে পারত সে। গলাও ছিল ভরাট। তবে ওর হাঁপানী ছিল বলে গলার স্বর কখনো চিকন, কখনো ভারি হত বেশ।
ওদের বাবা বাদে, বাড়ির আর সবারই গলা ভালোই ছিল। স্বরভঙ্গ ছিল না কারুর। বিবেকের মার গলা ছিল সর্বাপেক্ষা মোহময়ী। অনেকটাই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত। মিষ্টি তো বটেই, উপরন্তু প্যাসানেট। বিবাহের আগে ওঁরও নাকি গানের চর্চা ছিল ভালোই। বিবাহের পর ঐ চর্চায় ডাকঘরের ডেডলেটার-স্ট্যাম্প মেরেছিলেন ওঁর স্বামী, বিবেকের বাবা। তাঁর গলা ছিল বাজখাঁই। পোস্টমাস্টার ছিলেন। কম কথা বলতেন। বল্লে ঐ, অর্থাৎ বাজখাঁই।

না লিখে পারছি না যে, বিবেকের মার ঐ গলা শুনবার জন্য, অকারণ কথা বলতাম তাঁর সঙ্গে। ঐ ক্লাশ সেভেনে, বীর্যসংক্রান্ত সমস্যায় পড়ার আগেই, ঐ গলা শুনে, মাপ করবেন, ঐ গলা শুনে কেন যে যৌনতা জাগত আমার, আজও ভেবে পাই না। লতা মুঙ্গেশকরের গলা শুনলেও আমার যৌনতা জাগে অদ্যাপি। অদ্যাপি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনেও ঐ। তবে এই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ঐ যৌনতা ছিল অম্নিপোটেন্ট। কেন অম্নিপোটেন্ট ব্যাখ্যা করতে পারব না। "আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে"...শুনলে, ঐ হত, ঐ অম্নিপোটেন্স জাগত।
কি আর বলব, বিবেকের মার চোখ দুটো ছিল অবিকল মেরিলিন মনরোর মত, আধ-বোজা। মায়াবী। অথচ আয়ত। এবং সাংকেন। ন্যাচারাল মাস্কারা ছিল ঐ কোলে। দেখতে ভুল হয়নি, বিশ্বাস করুন।
বিবেক তখনি গাইতো, "বল বল বল সবে/শতবীণা বেণুরবে/ভারত আবার জগৎ সভায়/শ্রেষ্ঠ আসন লবে/কর্মে মহান হবে/ধর্মে মহান হবে..."ইত্যাকার গানে, অথবা এর পাশাপাশি ছোঁয়াচে কোনো গানে ঐ 'বীর্য' কথাটা ছিল। আজ আর অবিকল মনে নেই।

ঐ বীর্য গান শুনে, বিবেককে একদা জানাই আমার বীর্য সমস্যা। স্খলিত বিন্দুর কথা। নিভৃতে। প্রকাশ্যে সে প্রথমে জানায়, গানের বীর্য আর আমার বীর্য এক কথা নয়। অর্থাৎ প্রথম বীর্যে কোনো সমস্যাই নেই, অর্জন করা যা সমস্যা, এবং ব্যক্ত করাই তার কর্ম; কিন্তু দ্বিতীয় বীর্যের সমস্যা সীমাহীন, তার সঞ্চয়, তার অপচয়ে বড়

হানাহানি। গানের বীর্য বা প্রথম বীর্য হল 'বীর' বিশেষণের বিশেষ্য রূপ। আর ঐ দ্বিতীয় বীর্য বা শরীরী বীর্য হল 'সিমেন', শরীরের সমস্ত কেমিকালের সারবস্তু, ভাইটাল ফোর্স, মরাল ফোর্স, শুক্র। প্রজননকর। বীজগুণান্বিত। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। প্রবহমান। ব্যক্তি-আশ্রয়ী হয়েও সে সমাজাশ্রয়ী।

বিবেক বরাবরই পড়াশুনোয় ভালো। আমার চেয়ে শতগুণ তার পড়াশুনো। তার পিতার দৌলতে নানা ডাকঘরে বদলি হতে হতে বিবেক শিখেছিল সেই সর্বশক্তিমান ইংরাজি। হিন্দীও শিখেছিল কাজ চালানোর মত। আমি যার 'হায়' অবধি জানি আর কোনো 'মতলব' জানি না। বার বার ঠাঁই বদলানোর জন্য ওরা ছিল বহতা পানি, অর্থাৎ নির্মলা। আর আমার ইংরেজি বরাবরই 'ক' অক্ষর গোমাংস। যতটুকু শিখেছি, তার ১৪ আনাই আনন্দময়ীর কৃপায়। বাকি দু আনা, বলা বাহুল্য, বিবেক দংশনে। ইংরেজি নিয়ে কম ঠাট্টা বিবেক আমাকে করেনি!

মনে আছে ভালো, আমি কত সোহাগ করে, একবার গর্বভরে বলেছিলাম, 'শূন্যে', বিবেকের ভুলে, 'শূন্যে' মূর্ধণ্য 'ণ' is uncorrect।

সঙ্গে সঙ্গে বিবেক দংশন করে, uncorrect is incorrect.

ঐ সুরু। বন্ধুসংসর্গে ইংরেজি শেখা। এখন বলতে দ্বিধা নেই, বন্ধুসংসর্গেই সব হয়। মানুষ অতলে তলিয়ে যায়, অথবা শীর্ষে ওঠে।

আমার বীর্যসংক্রান্ত সমস্যা শুনে, আভিধানিক ব্যাখ্যার পর, বিবেক জানায়, এই সমস্যা বয়ঃসন্ধির। বয়ঃসন্ধির ইংরেজি অব্দি শুনি, তখনি, adolescent, adjective, passing from childhood to maturity.

বলার পর, এক রবিবার, সে, বিবেক, আমাকে গোপালদার কাছে নিয়ে যায়। গোপালদা তখন আর. এস. এস. করেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কৃষ্ণনগরী সেনাপতি ছিলেন।

কত কী শিখেছিলাম তাঁর কাছে, বীর্যরক্ষা, স্বপ্নগুণ, নারী মাত্রই মা অথবা বোন। সিঁথিতে সিঁদুর থাকলে মা, না থাকলে বোন। বীর সাভারকরের গল্প। ছত্রপতি শিবাজীর গল্প। মহারাষ্ট্রের জীবনপ্রভাত। মুসলিম আন্দুল্যে রাজপুতদের জীবন-সন্ধ্যা।

"লাঠি তোমার দিন গিয়াছে"—এই বঙ্কিমী বাক্যে শোকবিহ্বল না হয়ে লাঠিখেলা শেখা ছিল সব শিক্ষার সেরা শিক্ষা। যতদূর মনে পড়ে, দেহের অঙ্গের বিভিন্ন অভিধা, নাম ইত্যাদি, শিখিয়েছিলেন, যথা, যতদূর স্মরণযোগ্য, তথা ঐ, অর্থাৎ তামেচা, বাহেরা, শির, কোটি, ভেন্ডার, হুল—শেষ অব্দি শত্রুর বীর্যেই আঘাত করা অথবা আপন বীর্যরক্ষা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবার মূলাধার।

রাত্রে শোবার আগে স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ। এও শিখিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ আমার অদ্যাপি উপাস্য। 'I Socialist' পড়ার পর আজও তিনি

আমার পাঠ্য। তাঁর ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তো একপ্রকার আমার মাস্টার। যদিও ১৯৭০-এ তাঁকে চিনি। নকশালবাড়ির দাবানলের আলোয় এমন অনেকানেক বিপ্লবী চিন্তানায়কদের মুখ দেখি। উজ্জ্বল মুখবয়ব সব। ঐ ভূপেন্দ্রীয় ভ্রাতৃত্বে 'বিবেকানন্দ' দেখলেই কেবল 'I Socialist'-এর মর্মোদ্ধার হয়। ১৯৭০-এ এও শিখি যে, বিবেকানন্দকে নরেন্দ্রনাথ হিসেবে দেখতে হবে। দেখতে হবে রামকৃষ্ণ মিশনারী কভার স্টোরির ইন-বিটুইন লাইনসে গিয়ে। ভায়া ভগিনী নিবেদিতা।

আর. এস. এস. কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে হিন্দু-মংক হিসেবে দেখাতো আমাকে।

এই হিন্দুত্ব আমার মন থেকে ধুয়ে মুছে যায় ১৯৪৮, ৩০ জানুয়ারি, গান্ধী-হত্যার পর।

এত দুঃসংবাদ দেয়ার মধ্যেও, মনে হচ্ছে, আমার কত সৌভাগ্য যে, *My Early Life* : M. K. Gandhi ছিল আমাদের ম্যাট্রিক র‍্যাপিড রিডার। গান্ধীজীর বাল্যলীলা। ছেলেবেলো। রবীন্দ্রনাথের চেয়েও যে ছেলেবেলা কষ্টিপাথরে যাচাই করা। এখন আমি বলতে বাধ্য কোনো কিশোরকে, বলা উচিৎ কোনো কিশোরের প্রতি আমার তিনটি উপদেশ, কার্যত চারটি : প্রথমত গান্ধীজীর ছেলেবেলা থেকে শেখো। দ্বিতীয়ত, একমাত্র গান্ধীজীর ছেলেবেলা থেকেই শেখো। তৃতীয়ত, ঐ গান্ধীজীর ছেলেবেলাকেই কেবলমাত্র অনুসরণ করো। শেষপর্যন্ত, ঐ গান্ধীজীকেই ফলো করো early life-এ। কেননা, তিনি, গান্ধীজী, ছেলেবেলায়, নিরামিশাষী রক্ষণশীল পরিবারভুক্ত হয়েও মাংস চেখে দেখেছিলেন। চুরি অব্দি করেছিলেন। বিড়িও খেয়েছিলেন। এখানেই মনে পড়ে, শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, আমার বন্ধু, যিনি ড্রাগের প্রকোপে ২/৩ বছর হল সুইসাইড করেছেন, তাঁর, বিড়ির প্রতি ঝোঁক ছিল খুব। পারতপক্ষে সিগারেট খেত না। বিড়ির সুখটানে জানাত, "মায়ের দেয়া শাদা সুতো মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন দুঃখিনী মা যে মোদের সিগারেট দেবার সাধ্য নাই"—এও সগর্বে হাইটোনে বলত, "Smoke Bidi only, be Indian, buy Indian Bidi, Even Gandhiji Smoked." হ্যাঁ, সিরিয়াস হলেই সে ইংরেজি বলত।

যা বলছিলাম, গান্ধীজীর কথা। ঐ মাংসভক্ষণ, ঐ চুরি, ঐ বিড়িপান—ইংলন্ডে মদ্যপান, নাচ, মহিলাসঙ্গ—সব কিছু চেখে, পিঁয়াজবিলাসী রামকৃষ্ণের মতই এ গালে পেঁয়াজ, ও গালে পেঁয়াজ দিয়ে, "ওঃ, আমার পেঁয়াজ খাওয়া হয়ে গেল রে হৃদে!" বলেই ক্ষান্ত দিয়েছিলেন ঐ মাংসভক্ষণ, ঐ চুরি, ঐ বিড়িপান, ঐ মদ্যপান, ঐ নাচ, আর ঐ মহিলাসঙ্গ।

এজন্যই তিনি, আমার অনুসরণ যোগ্য। আমিও তাঁর মতই ছাড়তে চাই, বিশ্বাস করুন, ছাড়তে চাই সিগারেট, মদ্যপান, নারীসঙ্গ (মাকে কেবল পেতে চাই—না বোন না, ওসব হঠকারিতায় আর নেই।) ছাড়তে চাই।

কতটা ছাড়তে পেরেছি, সেটা বড় কথা না, মানুষ কতটা ছাড়তে পারে, সেটাও বড় কথা না, বড় কথা হল, মানুষ কতটা ছাড়তে চায়, কেননা ও-সব মানুষকে শৃঙ্খলিত করে।

ভালোই জানি যে, freedom is the recognition of necessity, আমার প্রবৃত্তি আমাকে স্বাধীনতা দেয় না, আমার আসল প্রয়োজনকে স্বীকার করে না, কেবল আমার প্রবৃত্তিজনিত অভীপ্সায় আমাকে মারধোর করে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার স্ত্রী একবার মদের বোতল কেড়ে ঐ বোতল দিয়ে আমাকে প্রহার করেছিলেন খুব। তাতে বোতলটাই ভেঙেছিল আমাকে পরাধীন করে। না, প্রবৃত্তি, আর না।

তবে "লোভ কোরো না"—এই আপ্তবাক্যে আমার অবশ্য বরাবরই ডিলেমা, কেননা দেখেছি, লোভ আমার হস্ত-পদের নখাদির তুল্য। যত কেটে বাদ দিতে চাই, ততই পুনরায় বৃদ্ধি পায়।

কখন যে লোভ যায়, তার একটিমাত্র উদাহরণ আমার জানা।
আমার বোনের বাদামভাজা ছিল বড় প্রিয়। নিরলস লোভ ছিল তার ঐ বাদামভাজার প্রতি। একবার আমার জাঁদরেল, মাসিক হবার আগেই বিধবা পিসিমা, তাকে তিনদিন কেবল বাদামভাজা খাইয়ে রেখেছিলেন। তিনদিনের মাথায় সে যখন কেবল আনডাইজেস্টেড বাদাম ত্যাগ করে, তখনি তার বাদামভাজার প্রতি লোভ যায় চিরতরে। জন্মে তাকে আর ঐ বাদামভাজা খেতে দেখিনি। সে যে এত চানাচুর ভালোবাসে, সেও ঐ বাদাম বেছে বাদ দিয়ে খায়। এখনো তাই।

অতএব লোভ আসে প্রবৃত্তি থেকে। যায় স্বাধীনতা গেলে। যায় বিপন্নবোধে।

যাই হোক, ঐ ৩০ জানুয়ারী, ১৯৪৮, গান্ধী হত্যার সূত্রে টের পাই হিন্দুত্ব কত লোভী। বুক ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, যখন জেনেছি, আর. এস. এস. তথা গোপালদা, ঐ গান্ধী হত্যার দিন, সন্ধ্যায়, পেটভরে সরভাজা খেয়েছিলেন, প্রকাশ্যে, কৃষ্ণনগরে।

বিবেকও অন্তর্হিত তখন বিবেকানন্দ তথা হিন্দুমংক থেকে। হায়, বিবেকানন্দ! বিবেক আবির্ভূত হল ভিন্ন ইংরেজিতে: Give me blood, I shall give you freedom. বলতে দেরি করল না।
সেও এক দুর্ঘটনা। আমাকে নিয়ে গেল ভেল্টুসের কাছে, সদ্য আজাদহিন্দ প্রত্যাগত সিঙ্গাপুর থেকে। তাঁর কল্যাণে শুনি কদম কদম গান, শুনি, "Look up"।

সেও যায়, অর্থাৎ ঐ আজাদহিন্দ। আসে ১৯৪৭। ১৯৪৭, ১৫ আগস্টে কৃষ্ণনগরে তুমুল স্বাধীনতা। আমি ও বিবেক আদ্যন্ত নেতাজী সেজে, বুকে ব্যাজ এঁটে, আমি ও বিবেক, ট্রেনে-ট্রেনে আনন্দ করি, কেননা ট্রেনে তখন যাতায়াত ফ্রি। এবং তখনো নেতাজী কিছু আছেন।

বাড়ি ফিরি, মনে আছে ভালো, ঠিক দুপুর দুটোয়। দেখি বাবার মুখ কালো। মার মুখও কালো।

ভাত-ডাল-আলু পেঁয়াজভাজা মা বেড়ে দিলেন আমাকে, মুখে বাক্য নেই। কেমন যেন অমঙ্গল লাগে। মন খারাপ হয়ে যায়।
মা নিজের থেকে বল্লেন, তোমার বাবার মন খুব খারাপ, বাবার সামনে আজ 'জয়হিন্দ' বোলো না। আমাদের দেশ তো পাকিস্তানে চলে গেছে। বাবার তাই মন খুব খারাপ।

জানি না আর কোনো দেশের ভাগ্যে এমন হয় কিনা, জন্মভূমি স্বদেশ অব্দি বিদেশ হয়ে যায়।
বিকেল হবার আগেই টের পাই, স্বাধীনতা নয়, দেশভাগই হল ঐ ১৯৪৭, ১৫ আগস্ট।

"নচিকেতা was a fool বলেছিলেন, উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ, নচিকেতা দেশভাগ দেখে নাই, দাঙ্গা দেখে নাই—ঐ 'উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ' এখন বিলক্ষণ চড় খাবে। রিয়ালি নচিকেতা was a fool."

বিকেলে সে-সব বলি বিবেককে। বিবেক আমাকে শোনায়, গ্লাসে অর্ধেক জল থাকলে, দুভাবে বলা যায় সেই কথা, গ্লাসে অর্ধেক জল, অথবা গ্লাস অর্ধেক শূন্য। প্রথমটা positive সত্য। দ্বিতীয়টা negative, তাও সত্য। তবু positive সত্যই সত্য।

না কেবল positive সত্যই সত্য না, negative সত্যও সত্য এবং negative-positive মিলেই তা neutrality তাই কেবল সত্য।
তুমুল তর্কে বিবেকের সঙ্গে আমার সেদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।
আমি একা, মন খারাপ করে, অলি-গলি ঘুরতে থাকি।
প্রায় সে-সময় জগৎ দা, আর. এস. পি., জনা কয়েক জনমানুষ নিয়ে অলি-গলি মিছিল করছেন। স্লোগান: সারে-গালিমে সোর হায় কংগ্রেসপার্টি চোর হ্যায়।··· এ আজাদি ঝুটা হায়। এবং ঐ 'এ আজাদি ঝুটা হায়' স্লোগানই হল ঐ মিছিলের ধ্রুবপদ। আমি ঐ মিছিলের পাশাপাশি একান্তে হাঁটতে থাকি। একসময়, ঐ দিন ঐ মিছিলে আমি ঐ ধ্রুবপদের কোরাসে, অজান্তে যোগ দি'। এবং জগৎদার সঙ্গে পরিচিত হই। ক্লাশ ফাইভে প্রথম দেখা জগৎদা, আমার প্রকৃত জগৎদা হন। ঐ সুরুু। আমার মার্কসবাদী দীক্ষার ঐ সুরুু। ঐ জগৎদার কাছে।

শিখি যে, এ পৃথিবী কি ও কেমন, এই দেখাই কেবল দর্শনের কাজ নয়। এই পৃথিবীকে কি করে বদলানো যায় এ দেখাও দর্শনের কাজ। এবং প্রধান কাজ। কেননা, আমরা জন্মাই—এ পৃথিবীতে বসবাস করব বলে। এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায় আমাদেরই। অন্তত আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার দায় আমাদেরই। 'এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব আমি'—এ প্রত্যয় সুকান্ত ভট্টাচার্য থেকে আমাতে ছড়ায়। আমি বুঝি এ পৃথিবীকে বদলাতে হবে।
স্থিতাবস্থা ভাঙতে হবে। স্থিতাবস্থাকে ভাঙা ও পৃথিবীকে বদলানোর স্বপ্ন আমার

এখনো গেল না। শিখি যে, এ পৃথিবীর এতকালের ইতিহাস, কেবল শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এবং এ পৃথিবী আজও শ্রেণী বিন্যস্ত। রাষ্ট্র হল—এক শ্রেণীর দ্বারা অপরাপর শ্রেণীদের শাসন-শোষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যম মাত্র। কিছু মানুষের ভালো থাকার থেকেই রাষ্ট্র জন্মায়।

শিখি যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদই কেবলমাত্র পৃথিবীকে সঠিক ভাবে চিনতে সাহায্য করে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ক্লাশে ঢাকুদা, হ্রিদিব চৌধুরী, শেখান, সমাজের বিবর্তন ঘটে সর্বদা, কেননা এ বিশ্বজগৎ, এ পৃথিবী, আমাদের এই মানব-সমাজ, সবই পরিবর্তনশীল। সমাজও পরিবর্তনশীল। সে বদলায় শ্রেণীসংগ্রামে। প্রথমে সমাজ ছিল আদিম সাম্যসমাজে, তারপর এল দাসসমাজ। পরবর্তীতে ক্রমে সামন্ত সমাজ, বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী সমাজ। শৈল্পিক পুঁজিবাদী সমাজের আবির্ভাব ঘটে ঐ শ্রেণী দ্বন্দ্বেই। দ্বন্দ্বই হল বস্তুর মর্মকথা। বীজের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দ্বন্দ্বে বীজ অঙ্কুরে পরিণত হয়। তেমনি রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণে সমাজে দুই প্রধান শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ দ্বন্দ্ব হিংসাত্মক। কেননা এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে পদানত রাখতে চায়, নইলে তার অস্তিত্ব টেকে না। সে পদানত রাখতে গিয়ে অত্যাচারী হয়।

যেহেতু শাসক-শোষক শ্রেণীর হাতিয়ার হল অস্ত্র, আইন-কানুন, প্রশাসন, পুলিশ ও সেনাবাহিনী, অর্থাৎ হিংসাত্মক মাধ্যম—যাদের দ্বারা ঐ শ্রেণী অত্যাচার করে—এবং ঐ দ্বন্দ্বের রণক্ষেত্রে তাই অত্যাচারিত শ্রেণীকেও হিংসাত্মক হতে হয়। বন্দুকের নলই শক্তির উৎস।

হ্রিদিব চৌধুরীর কাছে এ-সব শিখতে, সপ্তাহে একদিন আমাকে বহরমপুর যেতে হত।

এভাবে আমি ক্রমে ক্লাশ টেনে উঠি ও ১৯৫১-তে কলেজে ভর্তি হই। তখন আমার বয়স ১৬। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের বছর ঐ ১৯৫১।

জগৎদা আমাকে, বয়স বাড়িয়ে, ২১ করে, ভোটার করেন। নিমেষে আমি সাবালক হই। সে সব কথা পূর্বেও লিখেছি।

এখন লিখি যে, আমার এই ভোটার হওয়ার বৃত্তান্ত প্রমাণ করে, আমি আসলে ভিতরে ভিতরে শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন চাই। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে চাই। ডুমার নির্বাচনে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক পার্টি) সর্বজনস্বীকৃত নেতা লেনিনের অংশগ্রহণ তত্ত্ব আমরা পড়ি ও অতি উৎসাহে নির্বাচনে লড়ি। তখন থেকেই ভুলগুলি আমার চরিত্র নষ্ট করে। কেননা ডুমা নির্বাচন আর ১৯৫১-র ভারতবর্ষীয় নির্বাচন একই রেখায় আসে না। এই ভুল।

অবশ্য চরিত্র নষ্ট আমার ক্লাশ ফাইভেই হয়ে গিয়েছিল। যখন কলেজ থেকে আর. এস. পি. কমিউনিস্ট, বাণীন রায়, বিতাড়িত হন এবং তাঁকে কলেজে পুনরায় রাখতে আমরা স্কুলে হরতাল পালন করি ও মিছিল করি বহরমপুরে। আমাদের স্কুল থেকে ঐ

বহরমপুরে নিয়ে যান ঐ জগৎদা, তখন তাঁকে মোটে চিনতাম না। বহরমপুরের স্কোয়ার ফিল্ডের পাশ দিয়ে আমাদের সম্মিলিত মুর্শিদাবাদ-নদীয়ার স্কুল-কলেজের মিছিল যায়। কালেকটোরেটের কাছে আমাদের মিছিল স্তব্ধ হয়। সম্মুখে সশস্ত্র পুলিশ। সবার অগ্রে ঘোড়ার পিঠে মুর্শিদাবাদের এস. পি. বিল সাহেব। তার দুহাতে দুটো উদ্যত পিস্তল।

আমরা, নদীয়া, প্রথম সারিতে। বিশেষত আমি। আমার ভীত, সন্ত্রস্ত, বিস্ফারিত নয়ন বিলসাহেবের রক্তিম নয়নের সঙ্গে চোখাচোখি হয়। ভয়ে মরে যাবার মত হয়। উপরন্তু বিলসাহেব কয়েক কদম এগিয়ে আসেন।

একেবারে আমার মুখোমুখি।

আমার চোখের পলক পড়ে না।

সহসা দিকবিদিক কাঁপিয়ে শুনি, বৃটিশ সিংহ বিলসাহেবের সিংহনিনাদ, বিশ্বাস করুন, সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে—তখন সবে শেষ করেছি সেই শ্লোগান : "বাণীন রায়—কলেজে থাকবে" অন কনট্রাডিকশন, তৎক্ষণাৎ, বিল সাহেবের সেই সিংহনিনাদ, আমাকেই লক্ষ্য করে, "ক্কি, বাণীনডায় কালেজে ঠাকবে ?"

—না, থাকবে না। বলার অপেক্ষায় থাকি না আর। পা দুটো পলায়নী হতে থাকে। ভয়ে নীল হয়ে ঐ "না থাকবে না" বলামাত্র মিছিল ভেঙে স্থানান্তরে পালাই।

তো ঐ ১৯৫১-তে, ১৬ বছরকে ২১ করে, আমি যে নির্বাচনে ভোট-ভোট করে লড়ি, সে তো ঐ মিছিল পালানোর শ্রেণী চরিত্রেই।

সেই ১৯৫১-র মে দিবসে আরেকটি ঘটনা ঘটে। শহরের সর্বত্র দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়ে : মে দিবস জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজদুর এক হও।

কেবল আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লকের পোস্টার পড়ে। তখনো কমিউনিস্ট বিগব্রাদার সি. পি. আই. আসরে নামেনি। জগৎদা বলতে ছাড়েন না, "দেখলি তো ঢাকুদার ঐ সুইংব্যাক বইখানার পাতাগুলি কেমন মিলে যাচ্ছে, ঐ সি. পি. আই. হল, সংসদীয় পথে যাওয়া মেকি বিপ্লবী, দেখছিস তো মে-ডের শ্লোগান আদ্দি ভুলে গেছে, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' দেয়ালে লিখতে ভুলে যাচ্ছে।

জগৎদারও জগৎ দেখা বাকি ছিল।

মে-ডের অতি প্রত্যুষে দেখা গেল সব পোস্টারের তলায় কেবল সি. পি. আই-এর শিলপ আঁটা। ঐ আর. এস. পি. ও ফরোয়ার্ড ব্লকের পরিচয় আদ্যন্ত ঢেকে।

বুঝতে বাকি থাকে না যে, সব শেয়ালের এক রা হলেও শেয়ালেরা শিকারের তরে দলবদ্ধ হয় না সাধারণতঃ।

এখানে সবিনয়ে লিখে রাখি, নেহাতই উপমাবশত ঐ শেয়ালপ্রসঙ্গ, নতুবা কমিউনিস্টদের ব্যাপারে যা কিছু ভাবি না কেন আমার সোনালী সিংহের গল্প মনে পড়ে, তারই আবহ থাকে অন্তত। একটা লাইন ঘুরে ফিরে মনের ভিতর কাজ করে যায় খুব। সে লাইন

যতদূর মনে পড়ে, তবুও ইতিহাসে ফের সোনালী সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে যদি না সূর্যাস্তে ফের হয়ে যায় সোনালী হে'য়ালী।
যদি ভুল না ভেবে থাকি, তাহলে ঐ সোনালী সিংহ হল আমাদের স্থিতাবস্থা ভাঙার প্রতীক, সে অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হতে চায়—কিন্তু তাকে অবশ্যই ঠিক মুহূর্তকে ধরতে শিখতে হবে, সে যেন সূর্যাস্তকে সূর্যোদয় মনে করার সোনালী হে'য়ালীতে আর না পড়ে। এই 'সোনালী হে'য়ালী'ই হল 'সুইং ব্যাক', একেবারে রাজনৈতিক ভাবে, ঐ হল রিভিশনিজম।
৬০-এর দশকের গোড়ায়, তৃতীয় নির্বাচনে, আমি আসানসোল। মাইনে পাই ২৩৫ টাকা পঞ্চাশ পয়সা। হাতে তাই পাই। ঐ হাত থেকে ১০০ টাকা তুলে দিলাম নির্বাচনী ফান্ডে। মজার ব্যাপার ঘটল। ঐ একশ টাকার নোটে, ইমোশন-বশত আমি জল ছাপের হোয়াইটে, একটি ছোট্ট লাল তারা এঁকে দি' সঙ্গে ছোট্ট করে কাস্তে হাতুড়ি। মোটেই তেমন করে চোখে পড়ার মতো ছিল না। আর ছিল না বলেই ঐ মজার কাণ্ড। পূর্বে বাদামী খামে ক্যাশটাকায় মাইনে পেতাম। খামের উপর লেখা থাকত সব। স্ত্রী, বুকের ভিতরের পকেট থেকে, ঐ খাম বের করে ড্রয়ারে রাখবার আগে গুনে নেয়।
—একশ টাকা কম কেন ?
—বিপ্লববাবু নিয়েছেন।
—ঐ সেই বকবক মাস্টার। কি যেন সাবজেক্ট ?
—ইতিহাস।
—ইতিহাসের লোকেরা বড় বকবক করে। দেখবে, টাকা ফেরত পাবে না।
—পাব। কালই পাব।

—দিলেন ফেরত, টাকা ? আজই তো দেবার কথা ছিল।
—আজ পারলেন না। কাল ঠিক দেবেন।

কৈ, দিলেন ফেরত, টাকা ? জানতাম—দেবেন না, কেবল কাল কাল করবেন।
বিপ্লবকে বাঁচাতে বাল্যবন্ধু প্রভাতের কাছে হাত পাতি।
এই পোড়া আসানসোলে তখন একমাত্র মরুদ্যান ঐ প্রভাত।
—একশ টাকা ? দাঁড়া দেখি !
নো প্রোবলেম রঞ্জনদার কাছে রেডিমেড টাকা থাকে। চল্, যাই।
—রঞ্জনদা কে ?
সে কি রঞ্জনদাকে চিনিস না, আসানসোলে ভোট-ভোট করিস, চল দেখাবি। নো প্রোবলেম।
হাটন রোডে যাই। বিশাল পানের দোকান। ভিতরে দাঁড়িয়ে দুলতে দুলতে পান সাজছেন এক ফর্সা, ছিপছিপে ভদ্রলোক।

—রঞ্জনদা ?
—বল্। কি ব্যাপার ? আর যে দেখাই নেই, তবে আমিও যাচ্ছি না তোদের রেলে অনেক দিন, বর্ষা তো। বল, কি ব্যাপার !
—একশ টাকার যে খুব দরকার।
—আগে পান মুখে দে তো !
—অমন কড়কড়ে একশ টাকা, এক কথায় দিয়ে দিল ?
—তাই দেয়।
—পানের দোকানের এত আয় ?
—দূর, ঐ পানের দোকান তো একটা নামাবলী।
—মানে ?
—মানে উনি হলেন আসানসোলের মুসকিল আসান। আগে কংগ্রেস ছিলেন, এখন সি. পি. আই.। যে দলেই থাকুন। তোলার রোজগার বন্ধ হয় না। হাতে অনেক গুণ্ডা। ওর দাপটেই সি. পি. আই. রেলপাড়ে ঢুকতে পেরেছে। নে, এ টাকা ফেরত দিতে হবে না।
—মানে ?
—উনি টাকা দিলে টাকা ফেরত নেন না। অন্য সুবিধে নেন।
—কি ?
—আরে আমি রেলে কাজ করি না !
—তো, কি ?
—উনি যে বড় বড় কাপড়ের দোকানগুলির হয়ে তাদের মাল, সে বম্বে থেকেই আসুক, অথবা হাওড়া থেকে, উনি হাপিস করেন। ওয়াগন ভেঙে। তারপর ঐ দোকানদারদের যার যার জিনিস দিয়ে দেন। দোকানদাররা কাপড়ের গাঁট খোয়া যাওয়াতে কোম্পানী থেকে পুনরায় মাল পায়। কোম্পানী রেল থেকে / বীমা থেকে কমপেনসেশন আদায় করেন। অর্থাৎ ঐ রেল-বীমায় আমাদের কর থেকে যে টাকা হয়, সেই টাকাই খাটে। উনি আর ফেরত নেবেন কেন ? ও তো তোর-আমারই টাকা, আলটিমেটলি।
—কি যে বলিস ?
—গভমেন্টকে ট্যাক্স্ দিস তো ?
—হ্যাঁ, দি তো, কি ?
—সেই টাকায় রেল হয়, বীমা হয়, মিলিটারী হয়, পুলিশ হয়, কোর্ট হয়, জেলখানা হয়, মন্ত্রীদের গাড়ি হয়, বাড়ি হয়, তারা ঐ টাকায় ভি. আই. পি. হয়—কত কি হয়, সরকার দেয়। সরকারের রোজগার আছে নাকি ? সরকার কি চাকরি করে না ব্যবসা করে ? সরকারের রোজগার হল ঐ ট্যাক্স্। যা হোক তোকে এসব জ্ঞান দেয়া আমার কম্ম নয়। সোজা কথা, টাকা পেয়েছ—খরচ করো—নো প্রোবলেম।
বাড়ি গিয়ে স্ত্রীর হাতে তুলে দি একশ টাকা। গর্বের সঙ্গে।

—দেখলে তো বিপ্লব শেষ পর্যন্ত ঠিকই ফেরত দিল। স্ত্রী খুঁটিয়ে দেখে টাকা। জলছাপ আছে দেখে আলোয়।
—একি !
—কি ?
—এ টাকা তো চলবে না।
—কেন ?
—এই দেখো, লাল তারা আঁকা। আবার কাস্তে হাতুড়ি।
হাতে নিয়ে ঐ লাল তারা কাস্তে হাতুড়ি দেখতে দেখতে হতবাক হয়ে যাই। বুকে বাজে সার্কাসের ড্রাম। জোকার বাজায়।
উদয়ন ঘোষের সঙ্গে পরিচয় হয়, মনে আছে, ১১ আগস্ট ১৯৫৮। ঐ দিন থেকে আমি তাঁর কোলাঁগ। তাঁকে কিছু কথা মাঝে মাঝে বলি। একদিন অশুভ মুহূর্তে ১৯৭০-এ তাঁকে আরও কিছু বলি। বলি যে, লাল তারা কাস্তে হাতুড়ি এখন মস্তান হয়ে গেছে। তিনি হাসেন কেবল। চুপচাপ থেকে একটা ডাইরী খোলেন। পকেট ডাইরী। সেখানে দেখি পদ্য লেখা। তার থেকে একটি পদ্য পড়েন :

সুকান্ত শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রিয়তমাসু—পাঠে আপনি যে পদ্যটি লিখেছিলেন
১৯৪৬ এ—
১৯৭০ এ আমি তার পাঠোদ্ধার করি।
এখন '৭০-এর দশকে
যখন ধানের দোসর হতে চায় কাশফুল,
তখন ভালোই বুঝি আপনার প্রিয়তমা কে !
এও বুঝি, কেন আপনি সীমান্তের প্রহরী ছিলেন !
আপনি কবি, তবু কেন আপনার গায়ে
সৈনিকের কড়া পোষাক !
কেন আপনি কবিতাকে ছুটি দিলেন,
কেনইবা আপনার প্রয়োজন হল না কবিতার স্নিগ্ধতা।
—এসব ক্রমে বুঝি।
কেন পূর্ণিমা চাঁদ আপনার ঝলসানো রুটি মনে হল !
আর কেনইবা গদ্যের কড়া হাতুড়িকে
আপনি হানতে চাইলেন—
এও ক্রমশঃ বুঝি।
আপনি তো আমাদের জানিয়েইছেন ১৯৪৬ এ—
পরের জন্য আপনি যুদ্ধ করেছেন অনেক
এবার আপনি যুদ্ধ করতে চান নিজের ও দেশের জন্য।

শুনুন, সুকান্ত।
আপনি যখন দেশের জন্য যুদ্ধ সুরু করার আগে
অকালে নিহত হলেন
বিনা চিকিৎসায়
রাজরোগে—
তখন সেই স্বাধীনতা, ১৯৪৭ এলো। ১৫ আগষ্টে।
তখন বুকে নেতাজীর ব্যাজ পরেও বুঝিনিতো,
স্বাধীনতা নয়
দেশভাগই বস্তুত
১৫ আগষ্ট, ১৯৪৭ ?
এও বুঝিনি, আমিও অবাধ্য হয়েছি ঢের।
ভরদুপুরে নিজের গোয়ালের গাইডাক শুনেও শুনিনি।
শুনিনি জ্যোৎস্না রাতে পাড়ার কুকুরের কান্না।
রাশিয়া-চীন-ভিয়েৎনামের যুদ্ধ জয়ের ফাঁকে ফাঁকে
কতবার আপনার মতো আমারও হৃদয় জ্বলেছে
অনুশোচনার অঙ্গারে। পরের ভাবনায়।
পরের ভাবনায় নিজের দেশের জন্য কিছু কি করেছি ?
নেমেছি কি কাস্তে হাতে মাঠে ?
গাঁয়ের জন্য এক আঁজলা জলও এনেছি কি ?
চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছি কি অত্যাচারীর কৃপাণ ?
দেশ ও দশের ভাবনায় এক ঘুম
কেড়েছি কি সুপ্তি থেকে ?
এসব প্রশ্নে এখন বুক পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে আমার।
সবাইকে দারিদ্রের মধ্যে ফেলে
দুর্ভিক্ষের আগুনে ছুঁড়ে
ঝড়ে ও বন্যায়
মারী আর মড়কের দুঃসহ আঘাতে
বারবার
অস্তিত্ব বিপন্ন করে
ছুটে গেছি এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে—
রাশিয়া থেকে চীন
চীন থেকে ভিয়েৎনাম
ভিয়েৎনাম থেকে কাম্বোডিয়ায়

অনেক ঘুরেছি আমি।
একবার ভাবিনি তো, আপনার-আমার
প্রিয়তমা দেশ
শেষ পর্যন্ত আছে কি নেই!
দুর্ভিক্ষে ফাঁকা আর বন্যায় তলিয়ে গেছে কিনা ভিটে
খোঁজ নি'নি তো!
লেনিন স্পন্দিত বুকে
'আমিই লেনিন', মনে হয়েও
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভেঙে
বেরিয়েছি কি অগ্রগামী অনুভবে স্নিগ্ধ হয়ে
দীপ্তমান কৃষিজাত জাতক মানবে?

আপনাকে আজ জানানো ভালো,
এই ১৯৭০-এ আমাদের চুল পর্যন্ত বিকিয়ে গেছে
বিদেশীর কাছে ঋণে
কাস্তে-হাতুড়ি-তারার বুকেই
ঐ হাতুড়ি মেরেছি।
খাপ সমেত ভোজালি গে'থেছি ভ্রাতৃবক্ষে।
কিন্তু এখনো আপনারই মতো আমিও সেই বাতিওয়ালা,
যে সন্ধ্যায় রাজপথে-পথে বাতি জ্বালিয়ে ফেরে,
অথচ নিজের ঘরেই যার নেই বাতি জ্বালার সামর্থ্য। নিজের
ঘরে জমে থাকে দুঃসহ অন্ধকার॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি

ঐ ১৯৫১-তে যখন আমার ১৬ এক কলমের খোঁচায় ২১ হল, তখন, তৎক্ষণাৎ, আমার সরু লিকলিকে বাঁ মণিবন্ধে ডান করতল বেষ্টন করে দেখেছি, বাঁ মণিবন্ধ পরিণত হয়ে কিছুটা মাংসল হয়েছে যেন। পূর্বে ঐরকম বেষ্টনে বাম মণিবন্ধ বড় রোগা লাগতো।

আনন্দময়ী তখন, লেখা বাহুল্য যে, এসে গেছেন। ঐ সুবাদে একদিন কারে ওঁকে নিয়ে উঠে, বাড়িতে কেউ ছিল না ঠাকুমা ছাড়া। তিনি তখন আফিঙের ঘোরে ঢুলছেন বড় ঘরে।
আমরা নীরবে কারে উঠেছি।

আনন্দময়ী, উঠতে উঠতে, বলতে ছাড়েননি, খুব যে লায়েক হয়েছিস, একেবারে টেনে ওঠাচ্ছিস আমাকে ?
আমিও বলতে ছাড়িনি কারে উঠে ও ওঁকে তুলে, জানো আজ আমার ২১ হল।
গালে চিমটি কেটে তিনিও বলতে ছাড়েননি, সে আবার কি ?
সব তাঁকে বলি। শীতল হয়ে যান, সর্বনাশ হবে তোর !

হ্যাঁ, সর্বনাশই হল আমার। এক ফোঁটা শান্তি রইল না আর জীবনে।

বরাবরই দেখেছি, বয়সকে বাড়িয়ে ভাবা, আমার এক দস্তুর। এত যে লোকে আমাকে এঁচোরে পাকা বল্লেন আকৈশোর, এত যে শুনলাম, পেকে পচে গেছি, তবু যদি চৈতন্য হয়, লোকসমাগমে আমি এখনো জ্ঞানদান করি। অসহ্য, নিজের কাছেই অসহ্য। আর লোকের কাছে তো বলার নেই। লোকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন, অন্যের কথায় হাসবেন, আমার দিকে একপলক, ঐ, "ও আচ্ছা" ধরনের জ্ঞানের কথা শোনার ভঙ্গি রাখবেন, তবু যদি আমার জ্ঞান হয়।

ভাগ্য ভালো, আমি যে এলাকার ভার পেয়েছি, সেখানে সি. পি. আই, অর্থাৎ কাস্তে ধানের শিষ। না, ভাগ্য ভালো না। ঐ সি. পি. আই. প্রবাহেই যা কিছুর জন্ম তাই দেখেছি শেষ অব্দি শুয়োরের খোঁয়ারে গেছে। এবং ঐ শুয়োরের খোঁয়ারেই সেই প্রসঙ্গ, যে প্রসঙ্গে গিয়ে আমি বকুনি খাই ঐ সি. পি. আই. থেকে।
—খুব বেশি পড়ে ফেলেছ। জ্ঞান দিও না আমাকে। ডুমা-নির্বাচনে লেনিনের দলিল আবার পড়। পড়ে পড়ে কণ্ঠস্থ করে ফেল।
হায় ডুমা, হায় ১৯৫১-র ভারতবর্ষ !

আমার সর্বনাশ হয়ে যায়, ১৯৫১-র ভারতবর্ষ বুঝতে। বুঝতে পারি না। আজ বুঝি, ঐ রুশ ডুমা মাথায় থাকলে কি করে বুঝব ?
এই সর্বনাশ আমার প্রাত্যহিকী জীবনেও ঢোকে। আমার জীবনে আমি আনন্দময়ীর আগমনের সমাজবৈজ্ঞানিক কারণ আর টের পাই না। কোন দ্বন্দ্বে আনন্দময়ী-বস্তুর প্রকাশ আমার জীবনে, বিশ্লেষণ করার মানসিকতা হারাই। অথচ মনে আছে ভালো, মার্কসবাদ শিক্ষাকালে আমি আয়ত্ত করছিলাম ঐ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ আমার জীবনে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বস্তুবাদের প্রবাহে যে আমার ও আনন্দময়ীর জন্ম তা বুঝি কিছু। মাতামহী স্নেহলতার অবজেকটিভিটিও বুঝতে সুরু করেছিলাম। পুরো বুঝবার আগেই ঐ নির্বাচন এসে গেল।
এ কি ডুমার নির্বাচন ?

রাশিয়ার নিহিলিস্ট দলের কথা পড়েছি। লেনিনের দাদা সেই দলে ছিলেন। তাঁরা চাইতেন, জারের ক্ষমতা খর্ব হোক। সাধারণ মানুষের ক্ষমতা বাড়ুক। দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দেশের প্রজাদের হাতেই থাক। এমনকি, এই জার-ক্ষমতা খর্ব

করতে তারা ব্যক্তিগত আক্রমণে গেলেন। ১৮৮১ সালে, দ্বিতীয় আলেকজান্ডার, তখনকার জার, নিহিলিস্টদের বোমার আঘাতে নিহত হলেন। দলের উপর অত্যাচার সুরু হল। নিহিলিস্টরা ছত্রভঙ্গ হলেন। এই হয়—ব্যক্তিহত্যার ফলশ্রুতি হল এই, কেননা ব্যক্তিহত্যা দলের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে নষ্ট করে। সমাজতন্ত্রী দল গড়ে উঠল ঐ সময় প্রায় একই উদ্দেশ্যে। কেবল তফাত এই তাদের মধ্যে ছিল আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের হাত থেকে দেশ-শাসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কৃষক-শ্রমিককে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য সংগঠিত করা। লেনিন এই দলের নেতা। নেতা আরও ছিলেন। ট্রটস্কি। স্ট্যালিন।

১৯০৫-এ ঐ তিন নেতার নেতৃত্বে রাশিয়ায় এক বড় ধরনের বিপ্লব হয়। শেষরক্ষা হয় না। দুবছর আগে ঐ সমাজতন্ত্রী দলে উপদলীয় কোন্দল সুরু হয়। এই আরেক মনুষ্যস্বভাব, এই উপদলীয় কোন্দল। মানুষ ভালো, মানুষের সহৃদয়তার সীমা নেই, তবু মানুষ পরনিন্দা বড় ভালোবাসে। যা থেকে উপদল হয়। জানি না, এও আমার পরনিন্দা হল কিনা!

ঐ উপদলীয় কোন্দলে দুটি দল হয়ে যায়। বলশেভিক, যে দলে অধিকাংশ বিপ্লবী, অধিকাংশ মানেই বলশেভিক। অপর দল মেনশেভিক। মেনশেভিক কথাটার মানে অল্পসংখ্যক লোক। লোক, খেয়াল করুন, আমি এস্থলে বিপ্লবী বলছি না। তো ঐ বিপ্লবী বলশেভিক ১৯০৫-এ বিপ্লব সংগঠিত করে। তখন রুশ-জাপান যুদ্ধে দেশের লোকের দুর্দশার অন্ত ছিল না। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একজন ধর্মযাজক, নাম ভুলে গেছি, গ্যাপন্ সম্ভবত, কয়েক হাজার লোক নিয়ে জারের কাছে প্রতিবাদী যখন, তখন জার ছিলেন নিকোলাস। কসাক সৈন্যরা ছিল নিকোলাসের ঠাঙারে বাহিনী। কোথায় বৈদেশিক শত্রুকে, জাপানকে মার দেয়ার ট্রেনিং নেবে, বদলে দেশের লোকদের মার দেয়ার ট্রেনিং নিল তারা। নিকোলাসকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল ওর তখনকার সেনাপতি। নাম ভুলে গেছি। সে সৈন্যসামন্ত নিয়ে অর্থাৎ মারকুটে বাহিনী নিয়ে ঐ যাজক নেতৃত্বের শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করেছিল চাবুক মেরে। অত্যাচারীরা ঐ রকমই অত্যাচার করে। নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন বোধ করলে তারা অত্যাচারী হয় কিন্তু তারা ঐ কর্ম কোরে আসলে নিজেদের পায়েই কুড়াল মারে। নিরস্ত্র জনসমাবেশের উপর অত্যাচার, অনেকটাই আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার মতো। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনা ঘটে ঐ রুশ ১৯০৫-এর প্রায় ১৫ বছর পর।

রুশ বিপ্লবীরা খেপে গেল। চতুর্দিকে ধর্মঘট-অবরোধ সুরু হল। প্রজাসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেবার ব্যাপারে সর্বদাই শাসকদল বড় কৃপণ হয়। কিন্তু এখানে তা হল না। অকৃপণ হতে বাধ্য হল জার। ১৯০৫-এই জার ঘোষণা করলেন যে একটি রুশ পার্লামেন্ট হবে, যার নামই ঐ ডুমা।

প্রথম ক্ষমতা দখলের পদক্ষেপে ঐ ডুমা বিপ্লবের একটি পদক্ষেপ। পুনর্সংগঠিত হবার 'স্টেপ্' মাত্র। কেননা তার আগেই ১৯০৫-এর বিপ্লবকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছে।

আমাদের ১৯৫১-র ভারতবর্ষের সঙ্গে মেলে কি ঐ অবজেকটিভ কন্ডিশন? বলতে গেলেই দাদাদের কাছে বকুনি খাই।
তাদের নির্দেশক্রমে লেনিনের ডুমা নির্বাচনের দলিল কণ্ঠস্থ করি। অনর্গল বলি ঐ দাদাদেরই কাছে। ডুমা নির্বাচনে কিন্তু লেনিন বিধিবদ্ধ পথে গেলেও, সংসদীয় পথে গেলেও, অবৈধ পথে, অসংসদীয় পথে, একসট্রা পার্লামেন্টারি মেথডের পথে সংগঠন করতে থাকেন আন্ডারগ্রাউন্ডে।
—তোমার বদহজম হচ্ছে। তুমি অন্ধ তাই দেখতে পাও না, আমরা একসট্রা-পার্লামেন্টারির পথ পরিত্যাগ করিনি।

দুদিনেই একসট্রা পার্লামেন্টারির পথ আমার দেখা হয়ে যায়।
নির্বাচনের দিন দাদারা রিকসো করে নির্দিষ্ট ভোটার আনতে নির্দেশ দেন বুথে। আমরা অনেক যুবা (যুবাই তো!), মহা উৎসাহে ঐ কর্ম করি। দাদারা কানে কানে বলে দেন, অনুপস্থিত কংগ্রেস ভোটারদের এই তালিকা কাজের ফাঁকে ফাঁকে পরীক্ষা কর। জেনুইন অ্যাবসেন্টির নামের পাশে টিক মারো। তাদের বাপ-ঠাকুর্দার নাম মুখস্থ কর। বিবাহিত মহিলাদের স্বামীদের নাম কণ্ঠস্থ কর। এই এরা থাকলে তোমাদের জিম্মায়, এরা ঐ অনুপস্থিতদের প্রকাশ দেবে। যেমন তোমরা দাও আর কি কলেজে, প্রকসি। মার্কামারা না হওয়া পর্যন্ত। মার্কামারা কংগ্রেস অনুপস্থিতদের হিসাবে এনো না। প্রকসির ব্যবস্থা করো যারা গন্ডালিকায়। না, আমি প্রকসি দিতাম না। আমি দেইনি কোনোদিন। নিজের বয়স ভাঁড়িয়েছি কিন্তু নাম ভাঁড়াতে কুণ্ঠা আসে। কিন্তু আমি ঐ অনুপস্থিতদের তালিকা compare করতে বাধ্য হই। বিশ্বাস করুন, ঐ ফলস ভোট ঐ ১৯৫১-তেই সুরু হয়। এখন তো গগনচুম্বী ও প্রকাশ্য। তখন অন্তত লজ্জা-সরম ছিল। ছাব্বা মারা হত না। বুথ দখলও না।

এই ফলস্ ভোটিং টের পেয়েছি, গণতন্ত্র তথা সংসদীয় পথের শত্রু। অর্থাৎ এই একমাত্র একসট্রা পার্লামেন্টারি পথ তখন সি. পি. আই.-এর। বাকি সব ক্রমে সংসদীয় বানের জলে ভেসে যায়। ভেসে যায় ডুমার দলিলে লেনিনের সেই নির্দেশ, "**ডুমায় যাও, জনসাধারণকে একত্রিত করো।**" ভেসে যায়, ঐ অমোঘ নির্দেশও, "**বলশেভিক তত্ত্ব বোঝাও জনগণকে, ভোটারদের—এই নির্বাচনী প্রচারে এখুনি বাধা পাবে না, এই মস্ত সুযোগ গ্রহণ করো।**" এ-সবই ভেসে যায়। ভেসে যায়, "আন্ডারগ্রাউন্ডের কাজ অব্যাহত রাখো।" ভেসে যায়, 'সংগঠনকে ঐ আন্ডারগ্রাউন্ডে মজবুত করো।'
এও ভেসে যায়, লেনিন এক সময় ঐ পার্লামেন্টকেই বলে বসলেন, শুয়োরের খোঁয়ার। যখন পার্লামেন্টে সাধারণ মানুষের ক্ষমতার কোনো অস্তিত্বই রইল না।

পার্টি গণতন্ত্র একপ্রকার ফ্যাসিবাদ। ঐ পার্টির মধ্যেই আমাকে ভোট দিতে হবে। বিকল্প নেই।

শুয়োরের খোঁয়ার দেখিসনি তুই ? অথচ লক্ষবার ঐ শুয়োরের খোঁয়ারের কথা বলিস চল্—তোকে দেখাই।

আনন্দময়ী একদিন ঐ কথায় আমাকে ধাঙড় পাড়ায় নিয়ে যান—দেখি শুয়োরেরা এক জায়গায় কেবল গুতোগুতি করছে, কেবল ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে, কেবল নিজের কোলে ঝোল টানছে, কেবল একজনকে ঢুঁশ মেরে খাবারের জায়গায় নিজে ঐ খাবার ইনডিভিজুয়ালি খাচ্ছে, কেবল এর-ওর-তার সঙ্গে সহবাস করছে, কেবলি শুয়োরের বাচ্চার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। ওদের স্তনও চার জোড়া।

মানুষের কিন্তু এক জোড়া। এর মধ্যেও তো এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্দেশ আছে। মানুষের সর্বাপেক্ষা বিপরীত শুয়োর। সেজন্যই তো মনুষ্যসমাজে সর্বাপেক্ষা বড় গাল হল শুয়োরের বাচ্চা। দুনিয়ায় সর্বত্র ঐ একই গাল। যদিও দুনিয়ার অনেকানেক দেশের ঐ শুয়োরের মাংসে রুচি।

আমি ক্রমে নষ্ট হতে থাকি।

একটি ঘটনায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই। যখন দেখি, নির্বাচনে জেতার জন্য কি আর লিখব, নির্বাচনে জেতার জন্য কাস্তেধানের প্রার্থীর স্ত্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিভূতি চাইছেন। যে বিভূতি রামকৃষ্ণ দিতে চাইতেন না।

বারোটা বাজে আমার। বারোটা বেজে পাঁচ।

কার কাছে যাব ? ঐ উদয়ন ঘোষও তাই। এক জ্বর কবিতা লিখে হাত ধুয়ে মুছে ফেলেন। কবিতাটা প্রকৃতই জ্বর।

কবিতাটা অবশ্য '৮০র দশকের। তবু এখন কবিতাটা, অর্থাৎ ঐ সময়ে কবিতাটা অর্থবহ ছিল অধিকতর।

শ্রুতি-প্রতিশ্রুতি

কথা কেউ রাখেনি
কথা ছিল ল্যাম্পপোস্টে
ঝুলবে অসামান্য কালোবাজার
এখন সামান্য ল্যাম্পও ঝোলে না সর্বত্র
তবে কি গীর্জামোড় থেকে স্টেশন রোড পর্যন্তই, কেবল
স্বর্গ কেনা হল ?
বাকি সব ঋণ শুধল আই. এম. এফের ?
তাহলে আর কোনো কথা না
হাড় হাভাতের হাত ধরা ছেড়ে দাও
প্রতিশ্রুতি লিখ না দেয়ালে
পার্লামেন্টে শুয়োর ঢুকছে

জাতীয় সংহতির পণ্য সুচেতনাকে ডেকো না আর
ভাসান আসছে
চলো বনে যাই
চলো ফের শুরু করি বর্বরতা।

তখন কে জানত, এই নির্বাচনী ডামাডোলে, এই বখে যাওয়া কান্তে ধানের শিষ ও হাতুড়ি তারায়, এই সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাংকে, এই গাঢ় অন্ধকারে, আমার সঙ্গে সরোজ দত্তের দেখা হয়ে যাবে একদিন।

অবশ্য ঐ উদয়ন ঘোষই আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন। তখন অন্তত ঐ উদয়ন ঘোষের বুক জ্বলতো খুব, কেন কে জানে? বলেছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে কোট্ করে পদ্য—বড় অদ্ভুত পদ্য :

কোথাও মানুষ ভালো রয়ে গেছে বলে
আজও তার নিঃশ্বাসের বাতাস নির্মল
যদিও উজীর, কাজী, শহর-কোটাল
ছড়ায় বিষাক্ত ধুলো, ঘোলা করে জল
তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে
নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে,
উপোসেও রমণীকে বুকে টানে, কারও
সাধ্য নেই একেবারে নষ্ট করে তাকে।

মনে পড়ে, নষ্ট হয়ে যাই, নষ্ট হয়ে যাই ভাবতে ভাবতে একদিন উদাস হই বড়। বলব কি, ওই আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী আমার, চোখ চেপে ধরেন, পিছন থেকে, আমার। করতলের গন্ধে টের পাই। মুখে কিছু বলি না। চোখ চেপে ধরে থাকেন। করতলের গন্ধে টের পাই। মুখে কিছু বলি না। কয়েক দণ্ড কেটে যায়। কয়েক মুহূর্ত হয়ত। অনন্ত হলে ভালো হত। ততমধ্যে আমি যদি মরে যেতাম আরও, ভালো হত। ইত্যবসরে আমি আরও যদি নষ্ট হয়ে যেতাম, আরও, আরও ভালো হত। আমি ঐ মাতৃগন্ধী করতল চেপে ধরি।

—খুবই পেকেছ যা হোক।
—বাঃ আমার ২১ না?
—হ্যাঁ একুশই তো, একুশে আইনের একুশ।
—আমার ভোট দেয়া সারা। আমার কর্তব্য সারা। আমার ছোট ভায়ের কাজ সারা।
—কি বাজে বলছিস? কেবল বকবক করে তোর মাথাটা গেছে। শ্লোগান দিয়ে গলাও গেছে। ভোট দিয়ে তোর দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
—মাথা খারাপ হয়নি, মাথা গরম হয়ে গেছে।
—কৈ দেখি?

বলেই মা আনন্দময়ী ঐ স্বর্ণময়ী পুকুরের ধারে, জ্যোৎস্নায়, আমার মাথার পিছনটা নিজের বুকে রেখে আমার কপালে হাত দেন।

—কৈ ? একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা তোর কপাল, তোর মাথা।

কি আর লিখব ! তার কত বছর পর ঐ কবিতা শোনা। ঐ 'তথাপি মানুষ আজো শিশুকে দেখলে নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে !'

সেদিন, বাস্তবিক, আমি মা আনন্দময়ীর বুকে মাথা রেখেছিলাম। কিন্তু ঘটনা একই। ঐ সরোজ দত্তকে দেখার পর, ভুল লিখছি, ঐ সরোজ দত্তকে দেখব বলেই, ঐ মাথা রাখায় আমার নিঃশ্বাস নির্মল হয়। জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম, তেমনি রেস্ট পেয়েছিলাম ঢের।

—এত মাথা গরম করিস কেন ? শুনলাম তোর সঙ্গে নাকি তোদের পার্টির ঝগড়া হয়েছে খুব ?

—ঝগড়া না, তর্ক।

—ঐ তর্কই ! কি নিয়ে ?

—সে তুমি বুঝবে না।

—খুব বুঝব। তোর মনের কথা তো বুঝব।

—এই ভোট-ভোট নিয়ে।

—সে আবার কি ?

—এই লেনিন নিয়ে।

—তোরা কমিউনিস্টরা মোটে সাধারণ লোকের মতো কথা বলতে পারিস না। তোদের কথা আর কি বলব, কথাটা ইনকিলাব, তোরা বলিস ইনক্লাব—ইনকিলাব মানে হল, বিপ্লব—আহারে, তোরা বিপ্লব কথাটাই উচ্চারণ করতে পারিস না।

—সে সবাই না। সবাই ঐ ইনক্লাব বলে না।

—না বল্লেও, শ্লোগান তো ঐ ইনক্লাবই হয় ! যাক তোর বিষয়টা কি ?

—কিছু না, কমিউনিস্টদের ভোটের পথে যাওয়া উচিত না।

—হ্যাঁ, কেবল ডাণ্ডাবাজি করা উচিত।

—হ্যাঁ, ডাণ্ডাবাজিই করা উচিত। যত ডাণ্ডা মারতে দেরি হবে, তত ওরা আত্মরক্ষার অস্ত্র শানাবে, তত আমাদের বুকে অস্ত্র বিঁধবে।

—তুই দেখছি, পুরোই কমিউনিস্ট হয়ে গেলি।

—কমিউনিস্ট মানে জানো ?

—জানি বৈকি ! যারা কম অনিষ্ট করে, কি খুশি তো ? কিন্তু ঐ তোরা কমরেড কমরেড করিস—ওর মানে হল তোরা আসলে কম রেড, বেশি রেড না।

—তুমি ভালো ইংরেজি জানতে পার—তাই বলে কমরেড-কমিউনিস্ট—এসব ট্র্যানস্লেট করতে পার না। ওটা করতে গেলে পড়াশুনো করতে হয়। কেবল পি. কে. দে

সরকার পড়লে হবে না, কেবল ইংরেজি বাইবেল পড়লে হবে না, কেবল ক্ল্যারেনডন রিডার পড়লে হবে না, কেবল পি. সি. রেন পড়লে হবে না, কেবল চেম্বার্স দেখলে হবে না, কেবল অকসফোর্ড দেখলে হবে না—কেবল—

—থামতো, তখন থেকে কেবল 'কেবল-কেবল' করে যাচ্ছিস! তোর মাথাটা সত্যি খারাপ হয়ে গেছে।

—শোনো, তোমাকে যদি কয়েকটা বই এনে দি'—ইংরেজি আমাকে বোঝাবার জন্য, পড়বে?

—কি বই?

—রাগ করবে না, বল!

—পড়াশুনোর ব্যাপারে রাগ করব কেন? বল!

—প্রথমে 'গোথা প্রোগ্রাম,' তারপর ঐ 'ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলোপমেন্ট অব সোসাইটি। ফ্যামিলি, স্টেট···, তারপর 'স্টেট অ্যান্ড রেভোলিউশন, তারপর মাত্র দুটি বই থেকে কিছু কিছু—ফার্স্ট হল, কালেকটেড ভলিউমস অব মার্কস অ্যান্ড এঙ্গেলস—লাস্ট হল, কালেকটেড ভলিউমস্ অব ভি. আই. লেনিন। আর যদি তোমার বিরক্তি না আসে, তাহলে এ-সব পড়ার পর, আমাকে বোঝানোর পর, দুজনে মিলে বোঝার পর, আমরা একসঙ্গে পড়ব মাও-সে-তুঙের, 'অন প্র্যাকটিস', 'অন কনট্রাডিকশন'। অন প্রোপাগান্ডা, 'অন কারেকট হ্যান্ডলিং অব কনট্রাডিকশন, অ্যামং দা পিপল'। আরো যদি সময় দাও, তাহলে ঐ 'ডাস ক্যাপিটল'। অন্তত থার্ড ভলিউম।

—তুই কি তাতে মানুষ হবি?

—হব।

—তাহলে নিয়ে আয় বইগুলো। আজই সুরু হোক।

—এতো সবই রবীন্দ্রনাথের কথারে, তোরা যে বড় ওঁকে বুর্জোয়া বলিস। তোকে তো আমি ঐ রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে গদ্যেই বোঝাতে পারব।

মুখে কিছু বলি না। কেবল মনে মনে ভাবি, "পুরাণ পুরুষ, গণমানুষ, নারী পুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব অর্থবিহীন হয়ে গেলে,—তবু আরেক নবীনতর ভোরে সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে তবুও কেবল দ্বীপ বানালো যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে। প্রাচীন কথা নতুন করে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে ভাবছে একা একা বসে রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে : আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ যে-দোর কঠিন; নেই মনে হয়; সে-দ্বার খুলে দিয়ে যেতে হবে আবার আলোয় অমার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে"।

—কিরে, কথা বলছিস না যে! পড়েছিস রবীন্দ্রনাথের 'অমৃত', শ্যামলীতে আছে ১৯৩৬-এ লেখা?

—না, পড়িনি।
—জানি তো পড়িসনি, তাই তো সাহস পাস ওঁকে বুর্জোয়া বলতে!··· শোন্—
—বলো! যা বলার এখুনি বলো···
—বলবই তো, তখন থেকে মুখিয়ে আছি। তবে শোন: কবিতাটা মুখস্থ নেই সব। কিছু কিছু আছে। ধর, এক ধনী পুত্র, বড় লোকের ছেলে, আর এক ধনী কন্যা, বড় লোকের মেয়ে। ঐ পুত্র ভালোবাসে মেয়েটাকে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না। সে নিয়েই কবিতা। ব্যর্থ প্রেমিক ঐ ধনী বিদায় নেবার আগে কন্যাকে জানায়, ভারতের একজন নারী বলেছিলেন, একদা, উপকরণ চান না তিনি, তিনি চান অমৃত, এই তো নারীর পণ, তুমি কি বল। সে কিছু বলে না। সে কন্যা, অমিয়া, রিয়ালি তাই। অর্থাৎ অমৃত।··· গোড়ার কথা এই, ঐ ধনী পুত্র, অমিয়াকে বিবাহ করতে চায়। অমিয়ার পিতা বলেন, যোগ্যতা দেখাও। দিন যায় রাত যায়, ঐ পুত্রের মাথায় চড়ে ওঠে সোনার মদের নেশা ঐ যোগ্যতা দেখাতে। "সঞ্চয়ের ধারা যত বাড়ে, ততই তাকে চলে ঠেলে।" থামতে পারে না সে, থামতে পারে না তার তাড়না। বিত্ত বাড়ে, খ্যাতি বাড়ে। বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চলে আত্মশ্লাঘা। শেষে তার ডাক্তার বলে, "বিশ্রাম চাই নিতান্তই, দেহের কল অচল হয়ে গেল বলে।"
স্বাস্থ্যোদ্ধারে সে নির্জনে যায়। প্রকৃতিতে। "প্রাণ উঠল দু-হাত বাড়িয়ে জীবনের সাচ্চা সোনার জন্যে।" একদিন কাছের এক গ্রামে, সাঁওতালদের গ্রাম, হাজির হয়। ঐ অমিয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। "ছাই রঙের মোটা শাড়ি পরা, দুইহাতে দুই গাছি শাঁখা। পায়ে জুতো নেই, ঢিলে খোঁপা অযত্নে পড়েছে ঝুলে। পাড়াগাঁয়ের শ্যামল রঙ লেগেছে মুখে।" ছোটো ঝারি হাতে পাঠশালার বাগানে জল দিচ্ছিল সবজি-খেতে। ধনীর জামার আস্তিনে ছিল মুক্তোর বোতাম। লুকিয়ে আস্তিনটা দিল সে উলটিয়ে। অমিয়ার জন্যে একটা হীরের ব্রোচ ছিল তার পকেটে। সে বুঝল, দিতে গেলে, হীরেটাতে লাগবে প্রহসনের হাসি।
অমিয়ার ঘরে যায়। চোখে পড়ে, লেখবার টেবিলে একটি ছবি। অল্প বয়সের যুবা। অচেনা। কয়লায় আঁকা। কাঁচকড়ার ফ্রেমে বাঁধানো। ফলাও তার কপাল। চুল আলুথালু। চোখে যেন দূর ভবিষ্যের আলো। ঠোঁটে যেন কঠিন পণ তালা আঁটা।
—এ কে?
—মহীভূষণ।
তার আগের কথা হল, আট বছর য়ুরোপে কাটিয়ে মহীভূষণ ফিরেছেন দেশে। বাবা বল্লেন, "বিষয় কর্ম দেখো।" ছেলে বল্লে, "কী হবে।" লোকে বল্লে, ওর বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোক্কর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা। অমিয়ার বাবা বল্লেন, "ভয় নেই, নরম হয়ে এল বলে দেশের ভিজে হাওয়ায়।" দুদিনে অমিয়া হল তার চেলা। যখন তখন আসত মহীভূষণ, আশপাশের হাসাহাসি কানাকানি গায়ে লাগত না কিছুই।

দিনের পর দিন যায়। অধীর হয়ে অমিয়ার বাবা তুল্লেন বিয়ের কথা। মহী বল্লে, "কী হবে।" বাবা রেগে বল্লেন, "তবে তুমি আস কেন রোজ।"
অনায়াসে বল্লে মহীভূষণ, "অমিয়াকে নিয়ে যেতে চাই যেখানে ওর কাজ।"
অমিয়ার শেষ কথা এই, "এসেছি তাঁরই কাজে। উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার।"
—কোথায় আছেন তিনি?
অমিয়া বল্লে, "জেলখানায়।"

সপ্তম অধ্যায়

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে

প্রথম নির্বাচন গেল। দ্বিতীয় নির্বাচন আরও বেশি মানবীয় সময় খরচ করে, আরও বেশি বেশি মানুকে হিড় হিড় করে টেনে, প্রকাশিতে, গণ বলাৎকারে সমাধিত হল।
ততদিনে এসে গেছি কোলকাতায়। এম. এ. পড়ছি। নরহরি কবিরাজের কাছে সপ্তাহে একবার যাই। পোলিটিক্যাল ক্লাশে। আমার বরাদ্দ ঐ ক্লাশের বাইরে আমি আরেকজনেরও ক্লাশে যাই, তিনি গণেশ ঘোষ।
মনে আছে খুব, পি. জি. সেলের, নাম করব না, বর্তমানেও বামফ্রন্টের কেউকেটা সি. পি. এম., আমাকে ধমকের সুরে বলেছিলেন, গণেশ ঘোষের কাছে যাও কেন?
অথচ গণেশ ঘোষ, একটুও বানিয়ে বলছি না, গণেশ ঘোষ তখন কমিউনিস্ট পার্টির স্টুডেন্টস' সেলের উপদেষ্টা, বিশেষত ঐ পি. জি. তথা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সেলের।
—জানো গণেশ ঘোষ আন্দামানে ছিলেন আর ঐ একসট্রিমিস্ট গ্রুপের প্রবক্তা ছিলেন! জানো, অতিবামপন্থা দক্ষিণপন্থারই আরেকটা রূপ? টাকার এপিঠ আর ওপিঠ হল—অতিবাম ঝোঁক ও দক্ষিণপন্থা। ইদানীং ঐ গণেশে লেগেছে অতিবাম ঝোঁক। শোনোনি, আমাদের এই পি. জি.-তে আমরা যে চীপ ক্যান্টিন, চীপ স্টোর্সের উদ্যোগ নিয়েছি, তাতে উনি বুর্জোয়া গন্ধ পাচ্ছেন? বলছেন, এ দেশের কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা বড় বেশি মধ্যবিত্ত, পেটি-বুর্জোয়া? ব্যাখ্যা করার সীমা থাকা উচিত! চীপ-ক্যান্টিন, চীপ স্টোর্সে নাকি বুর্জোয়া ধ্যানধারণাই পুষ্ট হবে। উনি এই সিলেবাস পোড়াতে চান। এই বিশ্ববিদ্যালয় নাকি রক্ষণশীলতার শেষ দুর্গ, একে উনি ভাঙতে চান। নেহাত উপদেষ্টা বলে। নতুবা কে শুনত তাঁর কথা!
শুনে অবাক হয়ে যাই। সেই নির্মল, সদাহাস্যময়, চিরসংগ্রামী, ধীর, স্থির মানুষটাকে এমন করে কাটাছেঁড়া? যেন নরহরি কবিরাজের মধ্যে সবই সঠিক। সবই যেন অতি-বাম ও দক্ষিণপন্থা থেকে সম দূরত্বে। হ্যাঁ, তিনি অবশ্য স্বীকার করেন, এই শিক্ষা-দীক্ষা, মেকলে সাহেবের পরিকল্পিত শিক্ষা-দীক্ষা যা পড়ে, শুনে, আমরা আকৃতিতে ভারতীয়, প্রকৃতিতে বৃটিশভক্ত হই। কিন্তু এই কথাটাই আরও লজিক্যালি বলেন

গণেশ ঘোষ। বলেন, এই শিক্ষা-দীক্ষা যে সাম্রাজ্যবাদীর অফিসে কেরানীগিরি করার শিক্ষা-দীক্ষা তাতে তো কোনো ভুলই নেই, কিন্তু এই শিক্ষা-দীক্ষায় শহুরে হাতছানি আছে। গ্রামকে অবহেলা করার মোটিভ আছে। নিজেদের দেশকে ছোটো করে ভাবা, সাহেবদের দেশকে স্বর্গ বলে ভাবার উপসর্গ আছে। তাই দেখো, গ্রামীণ ভারতবর্ষে ঐ শিক্ষা-দীক্ষায় আদ্যন্ত শিক্ষিত হয়ে কী কংগ্রেস কী কমিউনিস্ট সব শহুরে ব'নে আছে। কমিউনিস্টদেরও বর্তমান লক্ষ্য এম. পি. বা এম. এল. এ. হওয়া, তাও গ্রাম ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে না, শহরে থাকার, রাজধানীতে থাকার আহ্লাদে। ঐ দ্বিতীয় নির্বাচন-কালেই আবার এলাকার এম. পি. প্রার্থীর বাড়ি গিয়ে দেখেছি, সবাই উত্তেজিত দিল্লী যাবার জন্য। প্রার্থীর মেজ ছেলে, ক্লাশ টেনে পড়ত, তখন, আমার কাছে জানতে চায়, দিল্লীতে ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স পায় কি না এম. পি.-রা। ওখানকার কলেজে ভর্তি হবার প্রায়োরিটি থাকে কিনা এম. পি. পুত্রের।

কত আর লিখব, প্রার্থীর স্ত্রী তো ধরেই নিয়েছেন, উনি বছরে অন্তত বাদল অধিবেশনে দিল্লী থাকবেন, কেননা প্রার্থীর 'ইউসিনেফেলিয়া' খুব 'হাই', বর্ষায় আরও 'হাই' হয়, টান ওঠে, কাউকে থাকতেই হয়, রাত্রে, বুকে-পিঠে তেল মালিশ করার জন্য।
ভাগ্যি ভালো, প্রার্থী নির্বাচনে হেরে যান।

—তুই সাচ্চা লোকের কাছেই শিখবি! গণেশ ঘোষকে ছাড়িস না। উনি তোদের মত কমরেড না, উনি বেশি রেড।

ঐ সময়, আমার সঙ্গে মিহির গুপ্তের দেখা হয়। অ্যানাদার একসট্রিমিস্ট। সব লাইনেই অফ-রডওয়ে। যখন সাহিত্য তখন সুবোধ ঘোষ, নরেন মিত্তির, বিমল মিত্র, মনোজ বসু, গজেন মিত্তির ও অনেকানেক বিমল কর প্রমুখ খড়কুটোদের নস্যাৎ করত ঐ মিহির। তেমনি ভয়ংকর আবেগে তুলে ধরত জীবনানন্দ, সতীনাথ ভাদুড়ি, তারাশংকরকে। প্রেমেন মিত্তিরের মধ্যেও দেখত শিল্পবাস্তবতা। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ছিল ইউ. এস. ও.। পরিমল মুখার্জির ইউ. এস. ও. বলা যায়। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস' অর্গানাইজেশন হবে বোধ হয় ঐ ইউ. এস. ও.। আসলে স্ট্রং অ্যান্টি-কমিউনিস্ট। এবং সশস্ত্র। একদিন আমাকে রিভলবারও দেখায় ঐ মিহির।
আমি ঐ মিহির গুপ্তের হাতে পড়ি। সে আমাকে ছাড়ে না কেন যেন। আমাকে ডিবেট করার উৎসাহ দেয়। অশোক ঘোষের বাংলায় বিতর্ক সে সমর্থন করে। অথচ অশোক ঘোষের সংগঠনের (সি. পি. আই.) স্টুডেন্টস' হেলথ হোমকে বুর্জোয়া মনে করে। বিশ্বনাথনের ইংরেজি ডিবেটের ভক্ত। পরিমল মুখার্জিও ইংরেজিতে কম যান না। বলা যায়, পরিমল মুখার্জির চোস্ত ইংরেজিতে আমিও কম ইনভলভড হই না। এই আমার চরিত্রের দোষ। আমি ধর্মেও থাকি আবার জিরাফেও থাকি। আমি চাঁদেও যে 'দ' লিখি, গোদেও সেই 'দ' লিখি। দেখতে এক। হুবহু এক।

ঐ মিহির গুপ্তের পাল্লায় পড়ে আমি একটা গল্প আদ্দি লিখে ফেলি। ঐ প্রথম ও ঐ শেষ। সে গল্প কোথাও ছাপা হয় না। নিজের হাতে কপি করে ঐ গল্প সে বহন করে। একদিন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। ঐ গল্প এক বেশ্যার কাছে পড়তে বলে। সেখানে আমাকে নিয়ে যায়।

এই বেশ্যার সঙ্গে তাঁর নাকি পূর্ব পরিচয় ছিল। তার বৌদির দিদি নাকি! বিশ্বাস হয়নি। একসট্রিমিস্টরা যখন সিভিল জীবনযাপন করে, তখন তারা স্বপ্ন দেখে খুব। এক ইউটোপিয়ার জগতে বাস করে তখন। অনেক কিছু যেমন রি-কনসট্রাকট করে, তেমনি অনেক কিছু বানায়, কনসট্রাকট করে। ঐ বেশ্যা-বৃত্তান্ত পুরো বানানোই মনে হয়।

তবু সাগ্রহে ওর কাহিনী শুনি। এই বৌদির দিদি একজন সেলস-ম্যানেজারের স্ত্রী। তখনকার 'ফাইজার' কোম্পানীতে কাজ করতেন। বড় রমরমা তখন ঐ 'ফাইজার।' ওঁকে টুরে যেতে হত খুব। ভবানীপুরের বনেদী পাড়ায় বিশাল বাড়ি। দোতলা। এক ছেলে এক মেয়ে। শাশুড়ি আছেন। আর কেউ না। মাসের ২১ দিন স্বামী বাইরে। ভদ্রমহিলা খুব আমুদে। রোজ সিনেমা দেখতেন ম্যাটিনি শো-য়ে। রোজ মানে প্রায়ই আর কি! ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করার জন্য ঐ শাশুড়ি। ছেলে-মেয়েদের প্রতি কোনো নজরই ছিল না বলা যায়। ছেলেমেয়েরাও ঠাকুমার কাছে মানুষ। মাকে বড় একটা আমল দিত না। স্বামী ছিলেন বড় স্ত্রৈণ। স্ত্রীর কোনো বাসনাই অপূর্ণ রাখতেন না। তিনি নাকি মদ খেতেন খুব। শোনা যায় তাঁর নাকি এক সঙ্গিনী ছিল। সম্পর্কে মাসতুতো বোন তাঁর। বর্ধমানে ঐ বোন স্কুলে শিক্ষকতা করত। আর বর্ধমানে ঐ স্বামী মাসের সাতদিন তো থাকতেনই। বোনের ঐ বাড়ি নাকি তাঁরই কিনে দেয়া। বোনের বিয়েই হয়নি। বয়স পেরিয়ে গেছে নাকি। মিহিরের বৌদির দিদির সন্দেহ ছিল না যে ঐ বোনই, তাঁর, মাসে সাতদিন, শয্যাসঙ্গী হয়। একবার নাকি এক চিঠি পেয়েছিল বিয়ের আগে লেখা। সে চিঠি কেবল শয্যাসঙ্গীকেই লেখা যায়। কোনো লাগাম ছিল না লেখায়। সে চিঠি বিয়ের সাতদিনের মধ্যে পেয়ে, দেখে, বৌদির দিদি বড় অনর্থ করেছিলেন। পরে কি হয়েছিল জানে না মিহির। কেবল এই জানে যে, সে, ঐ বৌদির দিদি, নিজের জগতে বড় আমোদে থাকতেন। সর্বদা মুখে পান। ঐ পানে নাকি আনন্দ মোনাক্কা থাকত। আনন্দ মোনাক্কা নাকি একধরনের sex booster—মদনানন্দ মোনাক্কা। প্রায়ই মিহিরদের বাড়িতে আসতেন। আর মিহিরের কাছে উপন্যাস চাইতেন। যে-সে উপন্যাস নয়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুষ্কোণ, নবেন্দু ঘোষের সব উপন্যাস, মাদাম বোভারি, আনা কারেনিনা, স্কারলেট অ্যান্ড ব্ল্যাক। মিহির তৎপরতার সঙ্গে জুগিয়ে যেত। এক একটা বই হাতে নেন আর মিহিরের গাল টিপে দেন, খুব পাকা হয়েছ তো! একদিনেই সংগ্রহ করলে। পড়েছ নাকি?

একদিন নাকি চূড়ান্ত হল। উনি কড়কড়ে একশ টাকার নোট মিহিরের হাতে দিয়ে

নাকি, বল্লেন, কলেজ স্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি কলেজের ফুটপাতে, যেদিকে ওয়াই. এম. সি. এ. সেদিকে লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার' পাওয়া যাচ্ছে, ব্ল্যাকে, কিনে আনতে পারলে, তোমাকে এমন এক জিনিশ দেবো, ভাবতেই পারবে না। আজই যাও, নিষিদ্ধ বই তো, উবে যেতে পারে, দরাদরি কোরো না, হৈ-চৈ কোরো না, যা দাম চাইবে এককথায় দিয়ে দেবে। যতদূর শুনেছি, পঞ্চাশ টাকা দাম।
১৯৫৩-র কথা। তখন পঞ্চাশ টাকা মানে কত, সেটা বুঝবার আগে বুঝুন, ঐ সময় শ্যামবাজার থেকে ইউনিভার্সিটি আসা যেত এক আনায়, এখনকার ৬/৭ পয়সায়। ভাবা যায়? ভাবা যায় ৫০ টাকা মানে কি?

সেদিনই আরেক কাণ্ড করলেন ঐ মহিলা। মিহিরের মাকে, নিমন্ত্রণ করলেন, পরের দিন দুপুরে। মিহির নিয়ে যাবে ও মিহিরও দুপুরে খাবে, প্রকাশ্যে বল্লেন। উঁচুগলায়।
আর নিচুগলায় মিহিরকে ফিসফিস করে বল্লেন, ঐ বই কাল দুপুরেই নিয়ে যাবে। না হলে অনর্থ করব। পেটে গুঁজে নিও, পেট থেকে আমি নিজে বার করে নেব। রাত্রে মোটে পড়বে না ঐ বই।

মিহির নিয়ে নাকি গিয়েছিল ঐ বই। ঐ পেটে গুঁজে। সঙ্গে ধর্মের সাক্ষী ঐ মাও ছিলেন।
চোখাচোখি প্রথম হলে নাকি, ইঙ্গিতে পেট দেখিয়েছিল মিহির।

সবই বানানো। তবু ঐ বানানো কথাই লিখে যাচ্ছি বিশেষ এক কারণে। মিহিরের কথা লিখছি ঐ একই কারণে।
তার পরের ঘটনা বড় ক্ষিপ্র, কম্পিত। মিহির যত ইঙ্গিত করে এখুনি বইটা নেয়া হোক, তত মহিলা ইঙ্গিত করেন, পরে।
সেই পরে আসে খাবার পর। মিহিরের মাকে শাশুড়ির কাছে আহারান্তে ভিড়িয়ে দিয়ে ঐ মহিলা প্রকাশ্যে মিহিরকে বলেন, চলো, ওপরে চলো, রেকর্ডে গান শুনবে। তুমি ঘুমোও নাকি দুপুরে?··· ভালো, আমিও ঘুমোই না।
প্রকৃতই ওপরে উঠে লং প্লেইং ৩৩⅓ আর. পি. এম.-এ রেকর্ড চালান। বড়ে গোলাম আলির ঠুমরী। হাই টোনে। সবে বেরিয়েছে ঐ রেকর্ড প্লেয়ার। নিজের শোবার ঘরে তখন। কেবল তারা। ছেলেমেয়েরা স্কুলে। শ্বাশুড়িরা নীচে। দুজনেই লোলচর্মা। কানের মাথা খেয়েছেন। চোখেরও। ধান শুনতে কান শোনেন আর কান দেখতে পান দেখেন।
সুতরাং ওপরে, বন্ধ শোবার ঘরে লেডির লাভ সীন অবাধ হয়।
সে যে কি ক্রাইসিস, আজও, মিহির, ভাবলে নাকি মূর্ছা যায়।

ঐ মহিলা এখন নাকি অনন্যোপায় হয়ে, স্বামী-পুত্র-কন্যা ছেড়ে সদর স্ট্রীটে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়েছেন। এমনি তাঁর প্রবৃত্তি।

সেখানেই গেলাম মিহিরের সঙ্গে একদিন দুপুরে।

উনি ঘুমুচ্ছিলেন। নিদ্রাজড়িত তাঁর ঐ রূপ জীবনে ভুলব না। পরণে নাইটি। মাথায় চুল ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা। কপালে কয়েক গুচ্ছ চুল চোখে মায়া রাখছে খুব।

উনি মিহিরকে, আমার সামনে, টেনে নিজের কাছে নিয়ে, ভর্ৎসনা করলেন মৃদু, আসার আর সময় পেলে না ?

—বাঃ, তাই বলে সন্ধ্যায় আসব নাকি ?

—বেশ করেছ, ও কে ?

—আমার বন্ধু, তুমি গল্প ভালোবাসো, ও খুব ভালো গল্প জানে, গল্প লেখেও, একটা লেখা গল্প পড়বে তোমার কাছে।

—বাঃ বেশ। এসো।

ভিতরের ঘরে নিয়ে যান। শোবার ঘর। বিশাল খাট। ডিভান টাইপ। চমৎকার ধবধবে শাদা চাদর ঢাকা। ইতস্তত তাকিয়া, শাদা কভারের। এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা সেন্টার টেবিলে। শাদা।

উনি গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে আমাদের জন্য চা আনলেন।

তারপর শুয়ে পড়লেন। জোর করে আমাদের কাছে নিলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে বসি।

—যাঃ মুখচোরা ছেলে, পায়ের কাছে বসে নাকি ? এসো, উঠে এসো। যাই না। চকিতে উনি উঠে আসেন আমার দিকে। আমি ভয়ে, 'দিদি' বলি।

—নাও পড়, তোমার গল্প, আমি মুখোমুখি শুনব। মোটে দিদি ডাকবে না আমাকে। ···নাও পড়।

গল্প পড়ি। মনে আছে, গল্পটার নাম 'ব্লাড' ছিল। স্বামী-স্ত্রীর গল্প। ওদের বিবাহবার্ষিকীর গল্প। সকালে উঠে দুজনেই দুজনকে গোপন করে বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন করে। সেদিন ঝগড়া করে না। যে কেউ অপরের কথায় কনট্রাডিকট করে না। বেশ কাটে। বাজারে যাবার কথা হয়।

স্বামীর ইচ্ছা, ইলিশ মাছ আনে, স্ত্রী ভালোবাসে। স্ত্রীর ইচ্ছা, মাংস আনুক সে, সে ভালোবাসে।

—দাঁড়াও লিস্ট করে দি'। টাকা আছে তো কিছু ?···তাহলে তো ভালোই। বাজারের লিস্ট হয়। কোনোমতে তা পকেটে পুরে স্বামী যায়। যার পকেটে তখন মাত্র দেড় টাকা।

স্বামীর এক রোগ আছে। দু'হাতে কনুই পর্যন্ত এবং দু'পায়ে গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত, চাক চাক নীল দাগ। ডাইমেনশন আছে। চুলকায় খুব। চুলকালে শাদা খড়ির মত হয়ে যায় ঐ নীল।

স্বামী যায় মেডিক্যাল কলেজের কাছে। ডাক্তার বলেছেন, ঐ স্কিন-ডিজিজ লিভারের জন্য। ইনফেকসাস নয়। এই আশ্বাসে সে মেডিক্যাল কলেজের সামনে ব্লাড-ব্যাঙ্কার ধরে। তারা অন্যত্র তাকে নিয়ে তার ব্লাড টানে এক বোতল। দশটাকা দেয়। ১৯৫১-র দশটাকা।

তাতে সব হয়। এমনকি একগুচ্ছ রজনীগন্ধাও হয়।

ফিরে আসে ঘরে।

—বাব্বাঃ, আজ দেখছি পুরো লিস্ট অনুযায়ী বাজার।

এতক্ষণে খেয়াল হয় স্বামীর। সে ঐ লিস্টের কথা ভুলেই গিয়েছিল। আসলে বোতলে লালরঙ্গ দেখে তার বড় বরাভয় জেগেছিল। সে ভেবেছিল, নীলরঙ্গ হবে। অলীক ভাবনা। তবু ভেবেছিল।

সে কৌতূহলে বাথরুম যায় ঐ জামা-কাপড় পরেই। বাথরুমের প্রায়ান্ধকারে সে দেখে ঐ লিস্ট। লিস্টের শেষ লেখা, রজনীগন্ধা।

—দারুণ, নাও, পুরস্কার স্বরূপ এই রজনীগন্ধা নাও। গল্পের নাম রজনীগন্ধাও হতে পারত। এই নাও!

হাতে নি' ঐ গুচ্ছ। উনি ঢলে পড়েন আমার বুকে। রজনীগন্ধা চেপটে যায়।

—বড় লাজুক তুমি। এদিকে তো নারীর নাড়ি-নক্ষত্র জানো। নটি বয়। আমি লজ্জিত হই। উনি মিহিরকে নিয়ে পড়েন।

আমি ঘর দেখি। দেখি চতুর্দিকের দেয়ালে তাঁরই ফোটো, ছবি। নানা ঢঙে, নানা রূপে। কতগুলো ছবি বড় ফ্র্যাঙ্ক। তাকাতে পারি না।

একটি ছবির দিকে চোখ যায়। দূরের দেয়ালে আটা। উনি দাঁড়িয়ে আছেন। এক দিকে ছেলে, অন্যদিকে মেয়ে। দেখে হতবাক হই।

ছবিটার কাছে যাই। ওনার সঙ্গে ঐ ছবির মহিলার মিল আছে, আবার মিল নেই। তবে বুঝতে বাকি থাকে না যে, এ ছবি ওনারই। ঐ ছেলেমেয়ে ওনারই।

—কি দেখছ? ঐ ছবির কেউ বেঁচে নেই।

আমি মিহিরের দিকে তাকাই। তার কৌতুকের হাসি দেখি। পরক্ষণেই অপার দুঃখ দেখি।

এই মিহিরকে আমি ভালো বুঝতে পারি না। সে এমনিতে একসসট্রিমিস্ট, কিন্তু বড় ভায়োলেন্ট। তার ভায়োলেন্সের মধ্যে আমি কেন যেন এগজিবিশনিজম দেখি। দেখে বড় কষ্ট হয়। আমাকে যে রিভলবার দেখায়, সেটা বাস্তবিক কোবাল্ট। খেলনার নয়। তাতে কিন্তু টোটা ছিল না। অথচ এমন করে আমাকে টার্গেট করেছিল ট্রিগারে তর্জনী দিয়ে যে আমি ভয়ে হিম হয়ে গিয়েছিলাম।

দোষের মধ্যে আমি তখনকার বি. পি. এস. এফ.-এর পি. জি. সেলের সি. সি.-তে নির্বাচিত হয়েছিলাম।

আমার এই উচ্চাভিলাষ কেন ? আমাকে ঐ বি. পি. এস. এফ. ছাড়তে হবে।
আমি অবশ্য নতিস্বীকার না করাতে সে আমাকে বাহবা দেয় শেষ পর্যন্ত। অন প্রিন্‌সিপল্‌, একসট্রিমিস্টরা নতিস্বীকার করে না, কেউ নতিস্বীকার করলে ঘৃণা করে তাকে। উপহাস করে। কেউ নতিস্বীকার না করলে তাকে বাহবা দেয়।

ঐ মিহির আমাকে আরেক বেশ্যার কাছেও নিয়ে যায়। দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রীটের কন-ভেনশনাল বেশ্যার কাছে। তার নাম মনে আছে, বীণা। এই বীণার কথা কোথায় যেন পরে পড়ি। সুনীলের 'আত্মপ্রকাশ'এ কি, না সন্দীপনের 'সমবেত প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য'তে ? মনে পড়ে না। সেই বীণাকে, সে, প্রথমে, আমাকে দেখায়, ফুটপাথে।
সেদিন আবার বুলগানিন-ক্রুশ্চেভ কোলকাতায় এসেছিলেন। সেই সূত্রে সে আমাকে ছিনিয়ে নেয় কলুটোলা স্ট্রীটের জমায়েত থেকে মহম্মদ আলী পার্কের দিকে। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, ঐ যে মন্দির দেখছ, ওখানের ফুটপাথে যারা লালপেড়ে গরদে দাঁড়িয়ে আছে তারা সবাই রেড-লাইট এরিয়ার। ওখানে ঐ যে দেখছ ঘোমটা পরা চওড়া লাল পেড়ে গরদে আড়াল করছে মুখ, সে বীণা। আজ তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাব।
—বাঃ, বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের মিটিঙে যাব না ?
—যাব—তবে ঐ বীণায় কিছু টাচ দিয়ে।

যাই। সে বড় বিচিত্র জায়গা। দোতলায় উঠতে হল সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে। ঐ ১২টায়। তখন সবে বীণা শুয়েছে। উঠে বসে। তার চতুর্দিকে বাসি রজনীগন্ধা। চোখের কোলে কালি। সাংকেন আইজ। কিন্তু খুব আপ্যায়ন করে। আমি বরাবরই অভিভূত হই দ্রুত।
সেদিনও হলাম। বল্লাম, আপনারা দাঁড়িয়েছিলেন ফুটপাথে, দেখেছি, কিন্তু কেন দেখতে গেলেন বুলগানিন-ক্রুশ্চেভকে।
—বাঃ, দেখব না, ওদের দেশে নাকি আমরা কারখানায় কাজ করি, রেলগাড়ি চালাই, ক্লেশের সিসটার হই, দেখব না ?
—কি দেখলেন ?
—দেখলাম আমাদেরি মতন। তবে সাহেব। ভাবিনি, ওঁরাও সাহেব হবেন। কোট-প্যান্টে ফিটফাট। সাহেবরা তো খারাপই হয়।
—বাঃ ওরা কি সেই সাহেব ? ওরা তো শ্রমিক। আর আপনারাও তো শ্রমিক।
—না, শ্রমিক না।
—শ্রমিকই তো, আপনারাও তো শ্রম বিক্রি করেন।
—শ্রম না, দেহ বিক্রি করি। যতক্ষণ ক্রেতার কাছে থাকি, ততক্ষণ ঐ ক্রেতার কাছে আমরা ক্রীতদাসী। আমাদের এই দেহটা নিয়ে মজার সব কাণ্ড করেন। বুড়োরাই বেশি করেন। তোমাদের মতন যখন কেউ আসে, তারা কেবল বুক দেখতে চায়—আর

বুক দেখাবো কি করে, সে কি আর আছে ? সে যে কবেই নুয়ে পড়েছে। তাছাড়া দেখো, আমরা পুরো ক্রীতদাসী, আমাদের যত বয়স বাড়ে, তত রোজগার কমে। আমাদের কোনো রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট নেই। বড় জোর মাছ বেচতে পারি হাতিবাগানে। **পেনশন পাই না।**

শুনে আমি হতবাক হই। কোনোদিন ভাবিনি তো, বৃদ্ধা অথবা প্রৌঢ়া বেশ্যার কথা !

মিহির আমাকে জানায় কার্তিক পুজোর দিন আবার আনবো তোকে, এখানে, তখন মজার জিনিশ দেখবি, কার্তিক লড়াই। সরস্বতী পুজার দিনও আনব, সরস্বতী তো স্বর্গের বেশ্যা, অথচ দেখ, উনিই বিদ্যাদায়িনী। নে, শেখ, তোর যা কিছু শেখার, এই বীণাদের কাছেই শেখ।

আর যাওয়া হয় না। বীণাদের কাছে আর যাওয়া হয় না। মিহির হঠাৎ ডুব মারে। আমি আর জীবনে রজনীগন্ধা সহ্য করতে পারি না।

তাকে, ঐ মিহিরকে পুনরায় দেখি বরাহনগরে। ঐ নকশাল আমলে। চোখে কালি। রোগা লিকলিকে। চোখ দুটো অসম্ভব লুম্পেনী। ঘরে ঘরে টেকসই যুবাদের খুঁজছে। টেনে বার করে এনে এক আঘাতেই মেরে ফেলছে। আমি ওর হাতে পড়ে বেঁচে যাই। আমাদের হাতে পেয়ে ও চিনতে পারে, আহাম্মক কোথাকার ! এখানে ভিড়োছস কেন ?

এই হল একসট্রিমিস্ট। আজ অতিবামে আছে, কালই অতিদক্ষিণে চলে যাবে।

অষ্টম অধ্যায়

হয়তবা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিম কথা

১৯৫৮-তে আমার বিয়ে হয়।...
এই বাক্য লিখে কিছুক্ষণ আমি আর লিখতে পারি না।
কেবল তাকিয়ে বাকি বাক্যটার দিকে। অনিমেষ।
একসঙ্গে অনেকগুলো কথা মনে পড়ে যায়।
মনে পড়ে যায়, Marriage is a legal prostitution.
এ কথা আমার বাসর ঘরেও মনে হয়েছিল।
যখন বেনারসী স্ত্রীকে আমি বিনাভূমিকায় বিবসনা করি। কত যে সেফটিপিন ছিল, ঐ কনেসাজে, কি আর লিখব ! গুণে শেষ করতে পারি না। সবই বালিশের তলায় তলায় রাখি। সায়ার দড়িতে বিষ গিঁট। আমাকে ছিঁড়তে হয়। শিয়রে রজনীগন্ধা ছিল। আমাকে সরাতে হয়। তখনি আচমকা ঐ রজনীগন্ধা তথা Marriage is a legal prostitution মনে পড়ে যায়।

আমি আমার পোটেনসি হারাই। কার্যত যা বলাৎকার, তা মাটি পায় না। শেষরক্ষা হয় না।
ঐ সুরু।
আমি বাস্তবিক আর পোটেন্সি পাই না। যতটুকু পাই, তাতে স্ত্রীর চিড়ে অন্তত এক ফোঁটাও ভেজে না। আমার কথা আলাদা। ঐ রজনীগন্ধা, অন্য সময় দম বন্ধ করে, এই সময় দিল খুলে যায়। পোটেন্সি পাই না মানে, আমি দ্রুত ফুরিয়ে যাই। উপসংহারে, তখন, তার চোখ ভিজে যায় গ্লানিতে। অতৃপ্তিতে। তার নাকি ভিতরটা শুকিয়ে যায়।
স্ত্রী যখন আমার প্রেমিকা হয়েছিলেন, সে বড় সুন্দর কথা।
হল কী একদিন, ইউনিভার্সিটিতে নাম্বুদিরিপাদ এলেন। লনে সভা। ক্লাশ থেকে ঝেটিয়ে নিয়ে আসছি সকলকে। দেখি সে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে প্রত্যয়। চোখে চশমা। চিনি না। বল্লাম তবু, লনে চলুন।
দেখি, তবু সে দাঁড়িয়ে। তখন ওর হাত ধরতে বাকি রাখি। বল্লাম, আপনার সাবজেকট ?
—বাংলা।
—ও, তাহলে তো আমার ক্লাশ মেট আপনি। কি 'বি' সেকসনে ? আমি ; 'এ'।
—আমার ফিফথ ইয়ার। ফিফথ ইয়ার 'এ'।
—ও, তাহলে তো আপনি আমার অনুজা।
দেখি ঐ অনুজা শব্দে সে আটকে যায়।
এই আমার গুণ, কখনো-সখনো ওরকম উপযুক্ত শব্দ আমি প্রয়োগ করতে পারি। আমি কখনো 'বিয়ে' বলতাম না তখন, বলতাম, বিবাহ। শুনে মেয়েরা চমকাতো। তো, ঐ বিবাহেরই সোহাগ লাগল ঐ অনুজায়।
সে আসে ঐ লনে। আমি মাঝে-মধ্যেই তাকে দেখতে পাই। সে আমারই দিকে তাকিয়ে।
আমি সিনিক বলে কথিত। তবু ঐ চোখ, যা কেবল স্নানান্তেই স্নাত হয়ে দিনমান ঐ অটুট স্নাতই থাকে। আমি, কি বলব, নাম্বুদিরিপাদের সব কথায় মন দিতে পারি না। একে ইংরেজি, তারপর সে ; সে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়েই থাকে। বিশ্বাস করুন, আমার পানে তাকিয়েই থাকে।
এমনিতে আমি দেখতে ভালো না। উল্লেখ্য তো নয়ই। তবু ঐ তাকিয়ে থাকায় আমি রূপবান হতে থাকি। আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে, আমিই জানি, আর জানে সেই মেয়ে।
আরেকদিন দেখা হয়।
সেদিন স্বারভাঙা হলে হীরেন মুখার্জি ও অম্লান দত্তের এক্জিবিশন ডিবেট। বিষয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বনাম ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি।

দেখি সে পিছনের সারিতে, দাঁড়িয়ে। আমাকে খুঁজছে। টের পাই, যখন আমাতে এসে ও থামে।

দেখা হয়, কলুটোলার মোড়ে একদিন সেন্ট্রাল এভেন্যুয়ে। ট্রাঁপকালের বাস-স্টপে। আমি যাচ্ছিলাম হরবোলায়। এলগিন রোডে। সিগনেট প্রেসের বাড়িতে।

ডি. কে., দিলীপকুমার গুপ্তের মর্জালশে, হরবোলায়। যেখানে কমলকুমার মজুমদার ও তাঁর কিংবদন্তীর 'ঢ্যাংগা' মানিকদাও আসেন। দীপক মজুমদার, সেই অবিস্মরণীয় নাটক 'বেদনার কুকুর ও অমল' প্রণেতা আসতেন ; আসতেন সেই 'আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে'র শক্তি, সেই কবি, কবিদের ক্যাপ্টেন সুনীল গাঙ্গুলিও আসতেন। যাচ্ছি সেই মেজাজে। দেখি সে দাঁড়িয়ে কলুটোলার মোড়ে সেন্ট্রাল এভেন্যুয়ে। একই বাসে উঠি।

লেডিজ সীটে, টু সীটার, বসতে পায় সে, পাশের সীট ফাঁকা। সে জানালার ধারে। আমাকে বসতে বলে ঐ টেম্পোরারি সীটে তার পাশে সেই সীটে যা টেম্পোরারি ফর জেন্টস। আমি জাস্ট জেন্টলম্যানের মতো ওর পাশে বসি।

—আপনি সাউথে থাকেন ?

—না, না, আমি নর্থে। ইউনিভার্সিটি হলে।

—এদিকে ?

—এই এলগিন রোডে। আপনি ?

—বাড়ি ফিরছি ?

—কোথায় ? ভবানীপুরে ?

মুখ ফসকে বেরিয়ে যায়।

—হ্যাঁ, ভবানীপুরেই, জানেন নাকি ?

—না, না, জানবো কি করে ? আমি কি গণৎকার ?

—বলতে তো পারলেন !

—সে আপনাকে দেখে। ভবানীপুরের মেয়েরা আপনার মতো হয়।

—মানে ?

—বনেদী। আর চশমা পরা। সুশোভন সরকারের মেয়েকে জানি ঐ ভবানীপুরে।

আমরা, আশ্চর্য, একই স্টপে নামি। নামার পূর্বমুহূর্তে সে টিকিট কাটে। কনডাকটার কড়কড়ে একটাকার নোট ওর হাত থেকে পেয়ে, আমার দিকে তাকিয়ে, তার দাঁড়ি-গোঁফে অশৌচ মুখে, কিছু হাসে, বড় সুন্দর, বলে, কী দুটো ?

সে নির্মল সম্মতি জানায়।

কিছুর মধ্যে কিছু না, আমি সহসা ভাবি, এক থেকে দুই। এক প্লাস এক, তবু দুই না, এক। একটাকার নোটে দুটো টিকিট। অথবা দুটো টিকিট একটাকার নোটে।

দুই=এক। একাঙ্গীকরণ। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। না কুঁড়ি হবার কথা, তখন আসে না।

সে, নেমে, ডানদিকে যায়, আমি বামে।

যাবার আগে আমাদের ঠিকানা বিনিময় হয়।

অবিশ্বাস্য মনে হবে, তবু পরের দিনই, ইউনিভার্সিটি যাবার আগে, হস্টেলের লেটার বক্সে একটা নিটোল খাম দেখি। ছিমছাম খাম। গোল গোল অক্ষরে আমার ঠিকানা। সঠিক মুক্তো। অক্ষর যেন হরিণ খুরাকৃতি। ঝর্ণার জলে স্নান করছে ছিমছাম, গোল গোল। ধারে কাছে বাঘ নেই। সকলি স্নিগ্ধ। সকলি নবীন। সকলি টেনডার। অ্যান্ড টেন্ডার ইজ দা নাইট। যত রাত হয়, তত ঐ চিঠি আমাকে জাপটে ধরে।

ওর পত্র তখনো তো স্ত্রীর পত্র নয়।

লিখেছিল, অনেক কথার পর ঐকথা লেখে, আসুন। অবশ্য প্রথমত ছিল ঐ অনুজ্ঞা, দ্বিতীয়ত ছিল ঐ অনুজ্ঞা, তৃতীয়তও ছিল ঐ অনুজ্ঞা, এমনকি শেষ পর্যন্তও ছিল ঐ অনুজ্ঞা। এসব কথার পর ঐ অমোঘ কথাগুলো আসে, **আমি সাজতে ভালোবাসি**। আপনি, মোটে নিজেকে সাজান না। ভাবি, আপনি আমার চশমাকে মেনে নিয়েছেন। ওটাই আমার একমাত্র ক্লামজি এফেয়ার। আসবেন, অনুগ্রহ করে সেজে গুজে, একদিন, আমাদের বাড়ি। মাকে আপনার কথা বলেছি। মা আপনাকে দেখতে চান। তারপর, আপনার সঙ্গে বেড়াতে যাব। যেখানে নিয়ে যাবেন। চশমা পরব না।

যাই। আর সঙ্গে সঙ্গে অবিস্মরণীয় এক মাকে দেখি। যেন আমারই কাঙ্ক্ষিত মা। বিধবা। সে অবশ্য নীল জর্জেট পরেছিল। প্রসাধন ছিল না। কেবল চোখে মৃদু কাজল ছিল। আঃ, সেই বাল্যকালের নীল। ধবধবে শাদা মায়ের পাশে চির-লীলাত্মক নীল, উজ্জ্বল নীলমণি।

আমরা লেকে যাই।

কোনো কথা হয় না। সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। রাত্রি আসে। কোনো কথা হয় না। একসময় ওর হাত আমার হাতে দেখি, বড় নিবেদিত যেন। অধিকন্তু বড় তৃষ্ণার্ত। কামার্ত বলা যাবে না তখনো। তবু ভারচুয়ালি কামার্ত।

এই সুরুন। বড় দ্রুত সুরুন।

আমি যেমন সব কিছু দ্রুত করি, তেমনি। দ্রুত অভিভূত হই। দ্রুত ক্রুদ্ধ হই, দ্রুত বিপ্লব করি, দ্রুত ফলপ্রসূ হতে চাই। দ্রুত পদস্খলন হয়। দ্রুত সহবাস করি। করতে ইচ্ছা যায়। শেষরক্ষা হয় না। প্রকৃতি, তুমি আমাকে এই সুসময়ে এমন করলে কেন?

একদিন প্রমাণ হয়, what is what.

সেদিন সে স্নেহময়ী ছিল। ইলিশ মাছ ভাতে দিয়েছিল। কলাপাতায় খেতে দিয়েছিল। ইলিশ মাছের গাদা ভেজেছিল। শুক্তুলংকা ভাজা করেছিল। ইলিশ মাছের তেল দিয়েছিল।

তেল দিয়েছিল।

এসব আবার রাত্রে হয়। এই তেল।

—ইলিশ কোথায় পেলে ?

—কাটোয়ার এক মাছওয়ালা এসেছিল। বিকেলে। শেষরাত্রের কাটোয়ার গংগায় ধরা ইলিশ। অনেকগুলো গামছা দিয়ে ঢেকে এনেছিল। প্রতিটি ইলিশ, শুনলে অবাক হবে, কুমড়ো পাতায় জড়িয়ে এনেছিল। বড় বড় কুমড়ো পাতা। মাছ ভালো থাকে নাকি। আমি চারটে পাতা নিয়েছি, এমনি দিয়েছে।

—পাতা ?

—হ্যাঁ, পাতা, পাতায় জড়িয়ে ঐ ইলিশ ভাতে, জানি না, ভালো হবে কিনা !

মাকে দেখেছি রাঁধতে, অমৃত। কৈ, এসো। কি ?

—...।

—আজ কত তারিখ জানো ?

জানি, আমাদের তৃতীয় বিবাহবার্ষিকী। আমি গোপনে আমার প্যান্টের পেটে লুকিয়ে এনেছি নাইটি। বলেছিল সে, রাত্রে নাইটি পরায় সুবিধে অনেক। তখন গা করিনি। বাজারে গিয়েও না। ইচ্ছে ছিল, সেন্ট কিনব। ল্যাভেন্ডার। ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আমার ভালো লাগে। আনন্দময়ী মা আমার, আমাকে দিয়েছিল বিবাহে।

যে বিবাহ একপ্রকার তাঁরই দেয়া। কিন্তু সে কথা এখন না।

ঐ ল্যাভেন্ডারের শিশি বড় মজার ছিল। শিশির ছিপি এক পরী বিশেষ। ডানা আছে। ঐ ডানা ছড়ানো, যেমন থাকে ডানা। ঐ দুটো ডানা এক করলে ঝর্ণার মত সুগন্ধী রেণু স্প্রে হয়। প্রথম দিনই ঐ কান্ড করতে সে, স্ত্রী, হাত থেকে ছিটকে দূরে নিক্ষেপ করেছিল। ভেঙেছিল।

—বাঁচা গেল !

—কেন ?

—ল্যাভেন্ডারের গন্ধ আমি মোটে সহ্য করতে পারি না। মাথা ঘোরে।

ঐ ল্যাভেন্ডার আমার স্টিমিউল্যান্ট, কিনতে ঐ স্মরণ। তখন নিজের অজান্তে ফুটপাথে এক ঝুলন্ত ল্যাভেন্ডার ফুলের হালকা বেগুনি রঙের নাইটি দেখি। দাঁড়িয়ে পড়ি তার সামনে। নাইটি হাওয়ায় দুলছিল। অভ্যন্তরে স্পষ্ট স্ত্রীকে দেখলাম।... কী আশ্চর্য, কোন দরাদরি না করে, কিনি ঐ নাইটিই।

চর্বচোষ্য খেয়ে শুতে যাই। দেখি, শিয়রে রজনীগন্ধা। তন্মধ্যে তার ঐ নাইটি পরা সারা। দাঁড়িয়ে আছে। উদ্যত গ্রীবা। ঠিক যেন ম্যাডোনা।

—খুব সারপ্রাইজ দিলে যা হোক। নটি বয়।
হায়, ঐ নটি বয়। মিহিরের বৌদির দিদি সদর স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ঐ ফাস্টিনাস্টি সুরু করেছিলেন। যার অন্তিমে ঐ নটি বয়।

কোথায় আমার পোটেন্সি যাবে, দেখি উল্টে পোটেন্সি আসে দিকবিদিক কাঁপিয়ে। হায়রে প্রবৃত্তি, তোমাকে কোনোদিনই বোঝা হল না আমার। চেনা হল না।

সে দাঁড়িয়ে থাকে নাইটি পরে। আমি রজনীগন্ধার সুবাস পাই। যা ছিল অবদমিত, তাই উদ্যত হয়। তবু নড়তে চড়তে পারি না। পেটে যেন খিল চেপে থাকে প্রবৃত্তি। মেরুদণ্ডেও খিল। অর্গল। কেউ খুলতে চাইছে। সে ঝপ্ করে মশারী ফেলে। অবলীলায় ঢুকে যায় ভিতরে।
—কৈ এসো।
আমি যাই। সে অপাঙ্গে টেনে নেয় আমাকে।
—নটি বয়!
—দিদি!
—ও আবার কি?
— ...
আমি এক হাতে রজনীগন্ধা ধরি। অন্যহাতে ওর নাইটি নামাই।
হায়, শেষপর্যন্ত আমার পোটেন্সি বাড়ায় ঐ দিদি।
—মোটে দিদি ডাকবে না আমাকে।
হায়, এ বাক্যও সে বলে।

কী, খুব সুন্দর কথা তো! সে বড় সুন্দর কথা, হতে পারতো তো?

এখন সে পাশ ফিরে ঘুমায়।

এখন বুকে কান্না জমলে কার লাভ? অথবা সে, প্রাণভোমরা, যদি টিপে মেরে ফেলি, তবে কার লাভ? যদি প্রোজেকশন হয় পলিগ্যামিক, তবে কার লাভ? শেষপর্যন্ত কার লাভ?

আহা, ও যে কারুর দিদি নয়। ও ছোটো বোন। ওর তিন দাদা, এক দিদি। ওদের পরিবারে টিচার নেই। সব্বাই একজিকিউটিভ।

আমার এই কাহিনী পড়ে, যে কেউ বলবেন, তুমি নরকের কীট হবে।

হ্যাঁ, আমি নরকের কীট। নরকে এক ঋতু চলছে আমার। নরক তো যুধিষ্ঠিরও দেখেছিলেন। দুর্যোধন দেখেননি।
আমি আমার মা আনন্দময়ীকে বলেছিলাম তার ঐ প্রথম চিঠির কথা। উনি দেখতে চেয়েছিলেন, ঐ চিঠি। দেখাতে পারিনি।

একবার আমার মারাত্মক ফ্লু হয়। সেই ঐতিহাসিক '৫৬-র ফ্লু। সারা কোলকাতা জ্বরে পড়ে।
আমি বেহুঁশ।
হঠাৎ একদিন দেখি, হস্টেলে আমার রুমে, আমার শিয়রের কাছে দাঁড়ানো, ঈষৎ নত আমার মুখের পরে, আমার মা আনন্দময়ী।
—ওকে খবর দিসনি ?
— ...
—আমাকেই বুঝি খবর দিতে হবে ?
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওকে ধরে নিয়ে আসেন মা আনন্দময়ী।

ঐ যে ওকে ধরলেন উনি, আর ছাড়লেন না। আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তবে ছাড়লেন।
আমার বিবাহের ১০ বছর পর মা আনন্দময়ী বিবাহ করলেন এক টিচারকে। তখন আমার ত্রিশংকু অবস্থা। তখন দাবানল। তখন বলা বাহুল্য ১৯৬৮।
মা আনন্দময়ী আমাকে ছেড়ে চলে যান। আরও দূরে। কুচবিহারে।

যাবার আগে তিনি এক মস্ত ভুল করেন। স্ত্রীকে এক পত্র দিয়ে যান। সে পত্র আমি দেখিনি। বস্তুত সে দেখায় না। তবে মাঝে-মধ্যে ঠেশ দিয়ে ঐ মা আনন্দময়ীর কথা বলে।
—তোমার তাহলে আনন্দময়ী ছিল !
—কে, কে বলেছে ?
আমি চমকে উঠি।
—স্বয়ং উনি জানিয়েছেন চিঠিতে।
—কৈ ? দেখাও তো।
—না, সে চিঠি আমাকে লেখা, পার্সোনাল। চিঠি দেখে কি হবে ? আনন্দময়ী তাহলে ছিল তোমার ! তাহলে মরতে আমাকে বিয়ে করতে গেলে কেন ? আর উনিই বা আমাকে সিলেকট করলেন কেন, তোমার বউ হতে ?
—জানি না।
—জানো ভালোই। এখন মুখ ফুটে বলছ না। বুঝতে পারছি না, তিনিই বা কেন তড়িঘড়ি তোমার বিয়ে দিলেন আর বিয়ে দিয়ে তিনিই বা কেন নিজে বিয়ে করলেন দশ, ১০টি বছর পর। কেন ঐ অপেক্ষা ?

আরেকদিন।
—না, বাধাকপির রস তোমাকে খেতেই হবে।
—আরে, তুমি দেখছি, সব জেনে বসে আছ। নিশ্চয় ঐ চিঠি। তবে শোনো, আমার

এখন কোনো অসুখ নেই।
—সুখও নেই।
— ...
—কি, তাই না?
— ...
—খাবে, খেতে হবে, না হলে তোমার ঐ মা আনন্দময়ী নিশ্চিন্তে স্বামীর সংসার করতে পারবেন না। বলিহারি বাৎসল্য! একে বাৎসল্য বলে?

অন্যদিন।
—তোমার জন্য একটা লেখা উনি দিয়ে গেছেন। এতদিন দি' নি। এতদিন আমি পড়েছি। কেবল তাঁর আশঙ্কা দূর করতে। তিনি সংগ্রহ করেছেন, আমাদের পরিবারের। সবাই কংগ্রেসকে ভোট দেয়। ভোট নিয়ে নাকি তাঁর মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা হল ঐ সমর্থন। ওর মানে আমরা নাকি অ্যান্টি কমিউনিস্ট। যেন তিনি কিছু কম অ্যান্টি কমিউনিস্ট। লিখেছেন, তুমি নাকি কিছু বই পড়তে দিয়েছিলে, যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে তোমাদের। কিন্তু যে কথা তিনি তখন জানাতে পারেননি সেই কথা লিখে তোমাকে জানাচ্ছেন। এতদিন পর দিচ্ছি। এতদিন তোমার ঐ রাজনীতি আমাকে কিছু বুঝতে হল। এনে দিচ্ছি। এখুনি পড়।

সে চলে যায় লেখা আনতে। কোত্থেকে যে আনতে যায়, জানি না। শুধু টের পাই, ওরও আন্ডারগ্রাউন্ড আছে।

এইখানে কবুল করি, যাঁরা বলেন, বিয়ের আগে পুরুষ যা, বিয়ের পর সেই পুরুষ আর থাকে না, এটা ঠিক না।
এই কথাটা বোমালুম ভুল। অন্তত আমার ক্ষেত্রে ঐ কথাটা খাটেনি।
আমি যা আমি তাই। বিবাহের কিছু আগে, বিবাহের কিছু পরে সন্তান জন্মাবার আগে আমার মধ্যে কিছু অন্যরকম উপাদান দেখা দিলেও, শেষপর্যন্ত আমি যা, আমি তাই থাকি।

ঐ যে ছেলেবেলায় বৃটিশ সিংহ বিল সাহেবের উদ্যত রিভলবারের সামনে পড়ে, 'ক্ষি, বাণীনিলয় কালেজে ঠাকবে?' প্রশ্নে আমি, "না, থাকবে না" বলে পালাই—ওর সঙ্গে আমার ৫১ সালের প্রথম নির্বাচনে, ষোড়শবয়সী, আমি যে ২১ হই, তার বিলক্ষণ মিল আছে।
মিল আছে, স্ত্রীর কাছে আমার স্বামী হিসেবে পোটেন্সি হারানো।
মিল আছে, স্ত্রীকে মিহিরের বৌদির দিদি হিসেবে দেখে পোটেন্সি ফিরে পাওয়া।
মিল আছে, রজনীগন্ধাকে ঘৃণা করে তাকে পুনরায় বুকে টেনে নেয়া।

লেখা আসে। আনন্দময়ীর লেখা আসে। লেখা পড়ি :

"এ লেখা যার জন্য, তাকে প্রথমেই জানাই মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাওই কেবল পড়লে হবে না। এই সিলেবাস অসম্পূর্ণ। এতে স্ট্যালিন নেই কেন, ভেবে হতবাক হই। মার্কস পড়বার আগে ইমানুয়েল কান্ট পড়া দরকার, তারপর ফিটকে, নীটসে, তারপর হেগেল, বার্গসঁ; ডারউইন-প্যাভলব-পাশাপাশি, অবশ্যই মর্গান, আন্তোনিও গ্রামচি, ট্রটস্কি ও এম. এন. রায়। এ-সব না পড়লে ইনকমপ্লিট হয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী রাজনৈতিক দর্শন। তারপর তো বিজ্ঞান অবশ্যই। এবং ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রাষ্ট্র-চরিত্র বিশ্লেষণ। তথা কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস।

আমি যা বুঝেছি লিখছি, এ দেশে কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯২১-এ। বলা যায়, ১৯৩৪ পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী। ১৯২১-এ, ছাত্রজীবনে রাজনীতি করার জন্য কলেজ থেকে বহিস্কৃত ডাঙ্গে লেখেন 'Gandhi Versus Lenin'। ভাবা যায়, তখন উনি গান্ধীজীর সমালোচনা করেছিলেন আপোসকামী হিসেবে? আর উনিই কিনা পরে বৃটিশদের দালাল হন, স্বয়ং আপোষকামী হন। বলতে গেলে, পার্টি হিসেবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, নয়না সিংএর নেতৃত্বে, বিদেশে, মস্কোতে গঠিত হয়। দেশকে তাঁরা চিনবেন কি করে? এম. এন. রায়ও মেক্সিক্যান কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। পরে কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল গঠিত হলে উনি ইনটারন্যাশনালের প্রাচ্য ব্যুরোর ভারপ্রাপ্ত সদস্য হন। অথচ উনি ১৯২৭-এ ইনটারন্যাশনাল থেকে অজানা কারণে বহিস্কৃত হন। তারপর থেকে উনি দলচ্যুত। তিনি অবশ্য কখনো ভারতে পার্টি গড়ার কোনো প্রক্রিয়ায় থাকেননি। দেশে যে কমিউনিস্টদের আত্মপ্রকাশ ঘটে—তার জের টেনে ১৯৩৪-এ প্রকৃত সর্বভারতীয় পার্টি গড়ে ওঠে ফিলিপ (Philip) সাহেবের (এখানেও বিদেশী) প্রচেষ্টায়—সেখানে অবশ্য, ভারতের আদর্শবান যুবকদের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা, ১৪ বছরের অক্লান্ত প্রয়াসে যে সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে, সেখানের সমস্ত উদ্যোগই ছিল পশ্চাৎগামী গ্রামীণ আবহাওয়ার উপর চাপিয়ে দেয়া বম্বে, লাহোর, কানপুর, কলকাতা শহরের ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের। তাঁরা সবাই ছিলেন পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত মানুষ। নিজের দেশ সম্পর্কে তদনুরূপ ওয়াকিবহাল তাঁরা ছিলেন না। ফলে, বিপ্লব সংগঠনের ক্ষেত্রে তাঁরা ইউরোপীয় পদ্ধতির বিপ্লবকে অনুসরণ করতেন মাত্র, যা ছিল কার্যত সংসদীয়। ফলত তাঁরা বিপ্লব সমাধার ক্ষেত্রে কখনো মোগলের বিরুদ্ধে শিবাজী অথবা বৃটিশের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের সংগ্রামের ধরন বা সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহগুলিকে অনুধাবন করার মানসিকতা পাননি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন জন্মলগ্নেই নানাকারণে বিদেশী নির্ভর ও দেশ সম্পর্কে উদাসীন। সে পরের জন্য পা বাড়িয়েছে খুব। নিজের দেশের জন্য যুদ্ধ করার মনোবল তথা মানসিকতা পায়নি। তখন আমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণাও হয়নি তেমন। এরজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল রাহুল সংকৃত্যায়ন, নীহাররঞ্জন রায়, বিনয় ঘোষ, সর্বোপরি কৃষক বিদ্রোহের অনেকানেক গবেষক ও ঐতিহাসিকদের জন্য। তাঁদেরও কাজ অসম্পূর্ণ।

ফলে আমরা, ভোটের সময় যে গালাগাল খেয়েছি, অর্থাৎ চীনের দালাল, রাশিয়ার দালাল, সেসব আদ্যন্ত সঠিক গালাগাল। কেননা ঐ চীন-রাশিয়া তথা ইউরোপীয় ব্যাখ্যায় আমরা নিজেদের প্রস্তুত করেছি।

আমাদের তেলেঙ্গানা, তেভাগা, কাকদ্বীপে যে বিচ্ছিন্ন বিপ্লব সুরু হয়েছিল, তার শেষরক্ষা হয়নি। উপদলীয় কোন্দলে, সঠিক পথের দিশা না পেয়ে একপ্রকার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল।

প্রধান কারণই ছিল, পার্টি সংগঠনের ত্রুটি। যেখানে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার বালাই ছিল না। এবং কমিউনিস্টদের কোনো আচরণবিধিই তেমন ভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি। তাই ঠনঠনে কালীবাড়িতে প্রণাম ঠুকে বিভিন্ন আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার বহু নিদর্শন আছে। তাই ঘরে ফিউডাল, বাইরে প্রোলেতারিয়েত হওয়ার চেষ্টায় বিপ্লব বারবার ঘরের খাটের তলায় লুকিয়েছে। জীবনে আনতে হবে ঐ কাঙ্ক্ষিত স্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগকর্ম। নতুবা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে আমরা কেন ভোটযুদ্ধে কেবল কমিউনিস্ট এনার্জি হারাবো?

যাদের সংসার ধর্ম কেবল স্ত্রীকে শয্যাসঙ্গী করা অথবা হেঁসেলে রাখা, স্ত্রীকে সহযোদ্ধা না করা, তাদের কপালে দুঃখ অনেক। তাদের ডিপ্রেশন স্বাভাবিক। এখন ঘর থেকেই সুরু করতে হবে বিপ্লব।

ঘর থেকে সুরু করতে হবে বিপ্লব।

হায়, যখন বিবাহ করলাম, কেউ এসে জানতে চাইল না, স্ত্রী কি কমরেড?

বরং বিদুষী সুন্দরী স্ত্রী পেয়ে চুটিয়ে সংসার করতে গিয়ে দেখলাম, কোনোটাই হল না। না হল সংসার করা, না হল বিপ্লব।

১৯৬২।

তখন স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য কলহ তুঙ্গে।

ঐ বছর শরতে, স্ত্রীর জন্মদিনে, সীমানা সংক্রান্ত কলহ হল খুব। শেষ অব্দি হিংসাত্মক কলহের সুরু। হল কী, স্ত্রী ইলিশ ভালোবাসে বলে বাজার থেকে ইলিশ কিনে আনি ভরদুপুরে। তখন আসানসোলে সারাদিন খোলা থাকত মাছের বাজার। অন্তত বিশ্রামরত চটের ঢাকনা খোলাতে পারতাম আমি। স্ত্রী তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে রান্না করি। ঐ সেই কুমড়ো পাতা মোড়া সর্ষের ইলিশ ভাতে। স্ত্রী জেগে উঠবার আগেই আমার সব কাজ সারা হয়ে যায়। তাকে দেখি শয্যায় অকাতর। সন্ধ্যা হয় হয়। আমি রেকর্ড-প্লেয়ার চালাই। লো ভলিউমে।

কি কুক্ষণে যে 'তবু মনে রেখ' 78 আর. পি. এম.এ প্লে করি, আর ঐ রবীন্দ্রকণ্ঠে, যা বুক খেয়ে নেয়, বাঁচতে দেয় না, আবার মরতেও দেয় না, জানি না কেন আমার ঐ ভীমরতি হয়, ঐ 'তবু মনে রেখ' তে, জানি না।

'তবু মনে রেখ'তে সে অবশ্য জাগে না। জাগে 'যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে…'তে।

জেগে, কপাল কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।
—বন্ধ করো, বন্ধ করো ঐ গান।
বন্ধ করি না। শুনি, "থাক আর সোহাগ করে ঐ গান বাজাতে হবে না,—জানি তো তোমার 'পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে…' —তো ঐ নতুন নাগরী কে ?" পৃথিবীর সব 'কে'-র উত্তর হয়। ঈশ্বর 'কে' ? উত্তর হয় না। আমি কে ? উত্তরই হয় না। তুমি 'কে' ? তার উত্তর আদৌ হয় না।
—কি জবাব দিচ্ছ না যে ?
—কি জবাব দেব।
—নতুন আনন্দময়ী কে ?
—স্টপ।
—স্টপ মানে ?
—থামো, আর চোপা বাজিও না।
—ও, আমি কথা বল্লেই বুঝি চোপা বাজানো হয় ?…চোপা ! যতসব গ্রাম্য কথা ! আর তুমি যে চোপা বাজিয়েই চলেছ রাসটিক !
—কোথায় চোপা বাজাচ্ছি ?
—বাজাচ্ছ না, ঐ যদি পুরাতন প্রেম… ? জানি তো আমি ওল্ড, তোমার কাছে ওল্ড ফসিল।
—জানো, কে গাইছেন ?
— …
রাগে ফুঁসতে থাকে; কথা বলে না।
প্লেয়ার বন্ধ করি।
বাইরের ঘরে যাই। লিভিং রুমে।
সে আসে।
—ওঃ, গোসা ঘরে এলেন ! কেন শোবার ঘরে থাকতে কি হয়েছিল ? কি হয়েছিল, বদমাশ ?
—ফের ?
—ফের কি ?
—ফের বদমাশ ?
—বলবই তো বদমাশ। মদখেকো ! যত্র-তত্র মধু খেয়ে বেড়ানো ! আনন্দময়ীর বয় ! মিথ্যেবাদী। কমিউনিস্ট হয়ে চর্ব-চোষ্য খায়, দুশ্চরিত্র হয় ! কমিউনিস্ট হয়ে বেশ্যাবাড়ি যায় ! লজ্জা করে না।
—বাড়ির থেকে কি বেরিয়ে যাব ?
—তাই যাও ? যাও, নবপ্রেমজালে বদমাইশি করো গিয়ে। আমার সীমানায় এসেছ কি, লোক ডাকব। লোক ডেকে বলব তোমার কীর্তি কাহিনী ! আবার কমিউনিস্ট !

আমি উঠে পড়ি। পা-জামা পরাই ছিল। কেবল পাঞ্জাবী পরা। বেরিয়ে পড়ি।
—বেরুচ্ছ, বেরোও! আর ঢুকেছ কি পুলিশ ডাকব।...দাঁড়াও, বেরুলে জন্মের মত বের হও। আমার একটা হিল্লে করে বের হও। নিজের গোপন জিনিসপত্র সব নিয়ে যাও। মদের বোতল নিয়ে যাও, লুকানো টাকা নিয়ে যাও, আনন্দময়ীর সব স্মৃতি নিয়ে যাও। বলে সে দরজা আটকায়। আমি বেরুতে পারি না। মুখ গনগনে।
ঐ মুখ আমি চিনি। ঐ মুখ সাজতে ভালোবাসে। ঐ মুখে সুস্নাত সুবাস। ঐ মুখে কেবল হাতে হাত। সব কাজ তুচ্ছ মনে হয়। সব স্বপ্ন পন্ড মনে হয়। সব ক্রোধ সামান্য মনে হয়। সব কিছু শূন্য মনে হয়। শূন্য মনে হয়। আবার পূর্ণ মনে হয়, পূর্ণ মনে হয়।
ঐ মুখ চুম্বন করে। ঐ মুখে জিভ আছে। আস্বাদন করে আমার জিভ। ঐ মুখের উপর যে মনন, মেধা, মেমোরি, সেই মাথায় যে মস্তিষ্ক, ব্রেন, রিয়ালাইজেশন, সেই মাথায় দেখি সব ত্রিনয়ন, সব দেখতে পায়। কিছুই লুকানো যায় না। কিছুই লুকানো যায় না। মদের বোতল না, গোপন টাকা না, গোপন অভীপ্সা আদ্দি না।

সারারাত তর্ক হয় কে কার সীমানা, কে কখন লঙ্ঘন করেছে।
পড়ে থাকে ভাত। পড়ে থাকে ভাতে ভাত। ইলিশ ভাতে।
আমরা উভয়ে উভয়ের সীমানা লঙ্ঘন করি।

সে স্কুলে কাজ নেয়। মিশনারী স্কুলে। দুদিনে খৃস্টান হয়। সেই যীশুর শিষ্যা হয়, যিনি সপ্তাহে একদিন ছুটির ব্যবস্থা করেছিলেন ক্রীতদাসদের, মজুরদের, কথা ভেবে। রবিবার।

যিনি এখন নিজের সীমানা লঙ্ঘন করে মিশনারী হয়েছেন।
সীমানা লঙ্ঘন অন্যত্রও হয়।
ঠিক ঐ সময় ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের সঙ্গে ভারতের পঞ্চশীল সম্পর্কের গুরুত্বর অবনতি ঘটতে থাকে। হঠাৎ শ্রীলঙ্কায় যাবার আগে নেহরু, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে হুকুম দিলেন, "আক্রমণকারীদের (চীনেদের) হটিয়ে দাও। তারা সীমানা লঙ্ঘন করেছে।"
ঐ নেহরুরই একান্ত বিশ্বস্ত, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর তৎকালীন অধিনায়ক তাঁর "আনটোল্ড স্টোরী"তে লিখেছিলেন, পরে, "চীনের এলাকায় হামলা করতে যে সামরিক প্রস্তুতি প্রয়োজন আমাদের তা নেই। তা সত্ত্বেও নেহরুর এই আদেশ ভারতীয় বাহিনীকে অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফেলেছিল।"
এতে কি স্পষ্ট নয়, হামলা কে সুরু করেছিল?
যাই হোক, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চীনা গণফৌজের পাল্টা আক্রমণে সাড়ে তিন হাজার ভারতীয় ফৌজ, তাদের অফিসার সমেত, আসামের বমডিলায় প্রায় বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করল। সঙ্গে সঙ্গেই চীন গণফৌজ ফিরে গেল। তথাকথিত সীমানা

ম্যাকমোহন লাইনের ১২২ কিলোমিটার উত্তরে সরে গিয়ে একতরফা ভাবেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, "এক বিজয়ী বাহিনীর নিজে থেকেই পিছু হটে যুদ্ধের অবসান ঘোষণা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি।

স্ত্রীর সব রাগটাই গিয়ে পড়ল আমার উপর।

—ঐ তো কমিউনিস্ট! শ্বেত কপোত আঁকা। লজ্জা করে না, জানোয়ারের মত মানুষের আত্মা ও অস্তিত্বের উপর গোলাবারুদ রেখে যুদ্ধ করছে চীন? এমন হিংস্র ভাবে তোমাদের মুখোমুখি দাঁড়াবো, শয়তান, চীনের দালাল, এমন হিংস্র ভাবে দাঁড়াবো, যেরকম ভাবে মানুষ কখনো পৃথিবীতে দাঁড়ায়নি।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এগিয়ে এসে আমার বুকে কিল মেরে ক্রোধে অন্ধ হয়ে বল্ল, তোমাদের প্রতি তোমাদের নারীদেরও ভালোবাসা নেই কামনা করব। আমরা ভালোবাসতে পারব না তোমাদের মাতৃভূমি চীনের কচি কচি ছেলেমেয়েদের মুখ।

সে ভুলে গেল, সে আমার স্ত্রী। সে ভুলে গেল, সে ভারতীয়। সে ভুলে গেল, আমি ভারতীয়। সে ভুলে গেল, সার্থক জনম আমার। ভুলে গেল, সকল দেশের রাণী। ভুলে গেল জননী জন্মভূমি। ভুলে গেল, তার সন্তান নেই, হবে না আর কখনো।

কে যেন বলেছিলেন, রাসেল সাহেব কি? বলেছিলেন, ঘরের মধ্যে যে ফ্যামিলি, অধুনা হাউজহোল্ড, ফ্যাসিবাদ সেইখানেই থাবা লুকিয়ে রাখে। কেননা ফ্যামিলি অথবা হাউজহোল্ড, যদি সে কখনো Self-Control হারায়, তাহলে ঐ থাবা উদ্যত হয়।

"But Self-Control will be applied more to abstaining from interference with the freedom of others than to restraining one's own freedom."

"Everything Surreptitious is undesirable, and sex relations which are serious cannot develop their best possibilities without children and a common life. Moreover, if a man or woman is young and vigorous, it is not in the public interest to say : '*You shall have no more Children*'. Still less is it to the public interest to say what the law does in fact, say, namely, '*You shall have no more children unless you choose a lunatic for their other parent.*"

—তবু টেস্টটিউব ভালো। পেটে ধরা? তোমাদের তো ধরতে হয় না।

ডাক্তার জানিয়েছিলেন, অত্যধিক ওরাল কনট্রাসেপটিভে সেকেন্ডারি স্টেরিলাইজেশন হয়।

"The family is decaying fast, and internationalism is growing slowly.

The situation, therefore, is one which justifies grave apprehensions. Nevertheless, it is not hopeless, since internationalism may grow more quickly in the future than it has done in the past, Fortunately, perhaps, we cannot foretell the future and we have therefore the right to hope, if not to expect, that it may be an improvement upon the present."

এই আন্তর্জাতিক হবার পথেও কোনো কোনো পৃথিবী বড় বাড়াবাড়ি করে।
হরেকৃষ্ণ কোনার অবশ্য বাড়াবাড়ি করেন না।
ঐ ৬২-তে পরাজিত ভারত সরকারের সব রাগটাই গিয়ে পড়ল কমিউনিস্টদের উপর। ভারতরক্ষা (?) আইনে ব্যাপক গ্রেপ্তার সুরু হল। সব এম. পি., এম. এল. এ., পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য, জেলা কমিটির সদস্য, এমনকি এলাকার ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বাররাও অ্যারেস্ট হল। চারু মজুমদারকে ২১ নভেম্বর অ্যারেস্ট করে প্রথমে জলপাইগুড়ি, পরে দমদম সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল।
ঐ জেলে হরেকৃষ্ণ কোনারও ছিলেন।
উনি জেলে দুটো ক্লাশ নিলেন। জার্মানী, বৃটেন ও আমেরিকার বুর্জোয়ারা সামন্ততন্ত্রকে কিভাবে উচ্ছেদ করেছিল তার উপরে।
চার নম্বর ওয়ার্ডে ক্লাশ হওয়ায় সকলেই উপস্থিত থেকে নীরবে শুনতেন।
কানু সান্যাল জিজ্ঞাসা করলেন, "সামন্ততন্ত্রকে খর্ব করেও যেখানে জিইয়ে রাখা হচ্ছে সেখানে কৃষক সংগ্রাম গড়ে উঠবে কি করে ?"
—সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করার সংগ্রামই সেখানে প্রধান হবে। হরেকৃষ্ণ কোনারের এই উত্তরে চারু মজুমদার বলেছিলেন, "কৃষকের সংগ্রামলব্ধ অধিকার ও জমির উপর অধিকার রক্ষার জন্য কৃষকেরই হাতে অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে আপনারা কি ভাবেন ?"
জবাব নেই।

ঐ হরেকৃষ্ণ কোনার, ভিয়েৎনাম ফেরতা, আমার নাম তোমার নাম ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম, কয়েক বছর পরে, গদিতে বসে, হুঙ্কার দিয়েছিলেন, কী, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান ?
মুছে দাও ঐ দেয়াল-লিখন। পিঠের চামড়া খুলে নাও ঐ সব অতিবামদের। ওরা আসলে সিয়ার দালাল।

তার কয়েকমাস আগে চারু মজুমদার বল্লেন, আমি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি মেম্বার মনে করি নিজেকে।

নাও, এবার আন্তর্জাতিকতা সামলাও।

হায়, কতদিন আগে জীবনানন্দ বলে গেছেন,

তৃতীয় চতুর্থ সব আন্তর্জাতিক ভেঙে গড়ে ভেঙে গড়ে,
দীপ্তিমান কৃষিজাত জাত্তক মানব আসিতেছে ঐ।

—কি, চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান বলতে লজ্জা করে না? তোমাদের কমিউনিস্টদের কি বাপের ঠিক আছে! তোমাদের কমিউনিস্টদের বাপ-মার বিয়ে হয়েছিল তো?

তখন নকশাল বাড়ির দাবানল। বসন্তে বজ্রের নির্ঘোষ।
হাতে পাই খাপ সমেত এক ভোজালি। যায় খাপটাও মেটালের। অগ্রভাগও চোখা।
ঐ খাপ সমেত, ক্রোধে অন্ধ হয়ে, স্ত্রীর পিঠে বসাই। খাপ খুলতে পর্যন্ত জানি না।
স্ত্রী তাতেই কঁকিয়ে অজ্ঞান হয়।
আহা কান্না কেন আসে? এ হেন শ্রেণীসংগ্রামে কান্না কেন আসে?

চারু মজুমদার আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, আপনাদের মতো পুঁথিপড়া প্রোফেসাররা আসলে পেপে চোর। হ্যাঁ, এখন হয়ত ট্রিগার চিনি না, ভোজালি থেকে খাপ খুলতে পারি না। ঐ খাপই বসাই শ্রেণীশত্রুর পিঠে। দেখেছি, তাতেই অজ্ঞান হয় সি. পি. এম.— So what?
শুনুন, প্রোফেসার, বিপ্লবের বন্ধ্যা যুগে বিপ্লব কবে সুরু হবে, এখন না, বহু পরে (অর্থাৎ কার্যত কোনো কালেই না), এই তর্কের মধ্যে নকশালবাড়ি হাজির হয়েছিল একটা বক্তব্য নিয়ে।
শুনুন, প্রোফেসার, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরুন, স্কুল-কলেজ ছেড়ে কৃষিবিপ্লবের পথ ধরুন, শ্রেণীশত্রু খতম করুন, অস্ত্র কাড়ুন, অস্ত্রের ব্যবহার শিখুন, অস্ত্রই রাজনৈতিক শক্তির উৎস।
স্ত্রী রাঁধছিল উত্তপ্ত কড়াই-এ মাছ। ভাজা হচ্ছিল। ভাজা মাছও উল্টে খেতে জানত না বলে, বলে বসল, "নিন, স্নান করুন, কোন ফকস হোলে দুঘণ্টা কাটিয়ে এলেন কে জানে, এবার চর্বচোষ্য গিলুন, কমিউনিজম করুন ঘরের খেয়ে দেয়ে, যান তারপর, বনের মোষ তাড়াতে যান। আমিও কি বনের মোষ?"
এর জবাব দি' ওর হাত মুচড়ে। সেও কম যায় না, ঐ উত্তপ্ত খুন্তি আমার গালে মারে। গালে খুন্তিপ্রতিম ফোসকা পড়ে।

কোথায় গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতায় স্বামী-স্ত্রী কমরেড হবে পরস্পরের—তা না হয়ে হলাম পরস্পরের শ্রেণীশত্রু।

—ভাটনগর কোথায়, নেপালে? ওখানে কোন নাগরী থাকে তোমার? এ-সব অলক্ষুণে কাগজপত্র পাঠায় কোন নবপ্রেম? চণ্ডালে ডাকিয়া আনি পোড়াও পুস্তক।

নিজেই চণ্ডাল হয়। পোড়ায় মাও এর 'অন কনট্রাডিকশন', পোড়ায় 'মাও'জ ডকুমেন্ট অন আর্ট অ্যান্ড লিটারেচার' পোড়ায় রেডবুক। পুড়তে থাকে আমার আন্তর্জাতিকতা। পুড়তে থাকে চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি।

পুড়ুক, তোমাদের চেয়ারম্যান মাও-এর ছবি পুড়ুক। তিন তিনটে বিয়ে। শেষেরটা আবার অ্যাকট্রেস। মোঙ্গোলয়েড ক্ষুদে বুকের সাইজ বাড়াতে বিদেশ থেকে ব্রেসিয়ার এনে পরে, লজ্জা করে না? কৈ, তোমাদের চেয়ারম্যান মাও তো ঐখানে কালচারাল রেভোলিউশন করেন না?

এ-সবেরও জবাব হয় না। এতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

পংকজ এল। একটা দলিল দিয়ে গেল। মধ্যপন্থাকে চূর্ণ কর, ধ্বংস কর। বলে গেল, রোজ দুপুরে একজন কমরেড আসবে খেতে। ১১টায় আসবে। আপনার স্ত্রী স্কুলে চলে গেলে। একই ছেলে আসবে তা কিন্তু নয়। একেক দিন একেকজন হয়ত। তবে প্রতিদিন একজন। এসে বলবে, আপনার কাছে চিনি হবে? শনি-রবিবার আসবে না। আপনার স্ত্রী বাড়ি থাকেন। ঐ দুই দিন আপনি দশটাকা করে মোট কুড়ি টাকা দেবেন শুক্রবার, ফ্রাইডে, যে আসবে, তাকে।

প্রতিদিন আসে। প্রতিদিন খাওয়াই। নিজের বরাদ্দ থেকে। বরাদ্দের মাছও খাওয়াই। ভাতও কম পড়ে। ডাল কম পড়ে না। প্লেট ধুয়ে নিয়ে, কখনো সেই পাত্রে যা আমার বাকি বরাদ্দ, খাই। ভালো লাগে। এও আমার এক আন্ডার-গ্রাউন্ড।

বুগাদার এমন এক আন্ডারগ্রাউন্ড ছিল। রোজ দুপুরে প্রাইমারী স্কুল থেকে বেলা ঠিক দেড়টায় ফিরে, যে যুবতী ভিকিরি ওদের নিচতলার পোড়ো বারান্দায় শুতো, তাকে ডেকে নিয়ে, রান্নাঘরে, খাওয়াতেন নিজের বরাদ্দ থেকে ডাল-ভাত-মাছ। বুগাদার মা তখন ঘুমিয়ে। বাবা বেঁচে নেই। ভাই বোন স্কুলে। সেই শাকচুন্নি ভিকিরি একদিন প্রকৃত যুবতী হয়। এবং আরেক আন্ডারগ্রাউন্ডে, ভরদুপুরে, নীচতলার ঘরের পরিত্যক্ত আসবাবের ভাঁড়ারে, এক খাট ছিল আদ্যিকালের, তার ধুলি ধূসরিত গদির উপর নিজে শুয়ে শোয়াতেন ঐ শাকচুন্নিকে, বলা বাহুল্য তখন সে তারই খেয়ে পরে যুবতী বিশেষ।

পংকজের ঐ ব্যবস্থার পরবর্তী বিজয়া দশমীর দিন আসানসোল ডি. আই. বি. অফিস থেকে একজন অফিসার আসেন গাড়ি নিয়ে। আমাকে বিজয়ার উৎসবে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

—এভাবেই আপনাকে ডাকলাম। নিন আগে মিষ্টিমুখ করুন।

করি।

—সিরাজকে চেনেন তো? সে মারা গেছে। তার ডাইরীতে, বীরভূমের জঙ্গলে উদ্ধার করেছি আমরা ঐ ডাইরী, ওতে আপনার নাম আছে। ডঃ হাজরার কাছ থেকে

স্যাম্পল ফাইল নিয়ে আপনি যে পাচার করেন বীরভূমের জঙ্গলে, তার কয়েকটি ডেট আছে।

—আমি সিরাজকে চিনি না।

—নিজের প্রিয় ছাত্রকে চেনেন না? তাই হয়? দুপুরে ভাত খাইয়েছেন আপনার স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে, আমাদের হিসেব, মোট ৯ দিন। অস্বীকার করবেন?···কি, জবাব দিচ্ছেন না যে?

—জবাব আবার কি দেব? আমি তখন কলেজে থাকি।

—কলেজে থাকেন? আমাদের হিসেব, আপনি এই বছর এ যাবৎ মোট ৪৫ দিন কলেজে গেছেন। তাও বেলা দুটোর পর। ফিরেছেন এক ঘণ্টার মধ্যে। আমরা কিন্তু এভাবে ইন্টারোগেট করি না। আমরা শক দি'। আঙুলের নোখে আলপিন ফোটাই। লাইটার জেলে আঙুল পোড়াই। পেনিসে ইলেকট্রিক শক দি। অন্ডকোষ টিপে ধরি শক্ত মুঠিতে। কচলাই। কেবল কচলাই।

সামনে সদা হাস্যময়ী প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার ছবি। আর ঐ ভাবলেশহীন পোকার ফেস ডি. আই. বি-র। 'র', রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল ব্যুরোর এজেন্ট। ইন্দিরা প্রতিষ্ঠিত 'র'-এর।

অব্যাহতি পাই সেদিন পরের দিন মুচলেকা দেব এই অঙ্গীকারে।

কলেজের সি. পি. আই. সহকর্মীকে ধরি। তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন জানতে পারিনি আজও। কেবল, আমি আর দুপুরে কাউকে খাওয়াবো না, মহাদেব মুখার্জির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না। আর ড. হাজরার চেম্বারে গিয়ে স্ত্রীর অবস্থা জানাবার আছিলায় ওর চেম্বারের পাশে অ্যান্টিরুমে ঢুকে লিস্ট অনুযায়ী স্যাম্পেল ওষুধ নেব না কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ ভরে। এতেই অব্যাহতি পাই।

পুরো অব্যাহতি পাই না। প্রায় শ' দুয়েক লোক একদিন আমার বাড়ি চড়াও হয়। এক স্বামী পরিত্যক্তা স্ত্রীলোক আমাদের পাড়ায় থাকেন, তাঁকে জড়িয়ে আমার চরিত্রহনন হয়। এবং আমি মার খাই। সেই সমাবেশে আমার প্রাক্তন কমরেডদেরই বেশি দেখি, আনাচে কানাচে। বলা বাহুল্য, পাড়ার সেরা লুম্পেন আমার গালে চড় মারে।

ঐ লুম্পেনকেই দেখি লেফট ফ্রন্টের ভলানটিয়ার হয়েছে ১৯৭২-এ। আমি ভোট বয়কট করি।

ঐ সময়ের ২।১ বছরের মধ্যে, আগে-পরে, দু'জায়গায় পালাই। এক বরাহনগর, আগেই লিখেছি। দ্বিতীয় কুচবিহারে, সেকথাও লিখেছি।

কুচবিহারে যাবার সময় বীরভূম হয়ে যাই। আশিস সঙ্গে যায়। দেখি, ফকস-হোল। কর্তিত শালগাছে ঢাকা। তলায় যাই। তিনবার উলুধ্বনি দিতে শুনি আশিসকে। একজন পাইপগান নিয়ে বাইরে আসে। আমাকে অবলোকন করে। তারপর আমাদের নিয়ে যায় ভিতরে। দেখি এক ছিমছাম ও. টি.। সব আছে। পরিচ্ছন্ন

ধবধবে শাদা বেড। বেডের উপরে ঝোলানো ডে-লাইট, হ্যাজাক। স্পষ্ট মনে হল ভুল হতে পারে, নীচু মুখ চারু মজুমদার টিনের চেয়ারে ঝিম বসে। কে একজন তাঁর বাহুতে ইনটার-মাসকুলার ইনজেকশন দিচ্ছেন, পেথিড্রিন, জানি। নিমেষে তিনি চাঙ্গা হন। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসেন, কি প্রোফেসার, মুচলেকা দিলেন। ভয়ে আমি হিম হয়ে যাই। মনে পড়ে, তিনি একদা বলেছিলেন, "বৃষ্টির জল মাটির তলায় চলে গিয়ে ক্রমে ক্রমে প্রবল দাহ্য পেট্রোলে পরিণত হয়। তোমরাও জীবন যুদ্ধে পোড় খাওয়া মানুষের মতো ঐ অবিশ্রান্ত জনবৃষ্টির জল খেয়ে খেয়ে, তাদের গায়ের রক্ত জল করা জল খেয়ে খেয়ে, তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ঘাম খেয়ে খেয়ে ঐ পেট্রোল হয়ে যাও। শুধু আগুন, দাবানল ছোঁয়াবার ওয়াস্তা।"
তাঁরই ছোটো ছেলে, সৌরেন বসু, তাঁরই ডান হাত, বলেছেন, তারই ছোটো ছেলে, ছোট্ট অভি ছিল দারুণ। বাড়িতে, সকালে, ঐ কথার পর, উঠোনে একটা কাঠি পুঁততে পুঁততে অভি বলে—বাবা, এখানটায় খুঁড়লে পেট্রোল বেরোবে? এখানেও তো বৃষ্টির জল খুব পড়ে! সংশোধন করেন না চারু মজুমদার। নিজেও বিশ্বাস করেন তাই।

অথচ পেট্রল তো. : 'A hydro carbon (C_8H_{10}) occuring in petroleum' : এবং পেট্রোলিয়াম হল বস্তুত rock oil। পৃথিবী কোন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অরণ্য অধ্যুষিত সপ্রাণী অরণ্যানীকে rock area-য় কবর দিয়েছিল একদা।
এবং জানুন, আপনার ঐ বৃষ্টি ইমেজ পেট্রলের ক্ষেত্রে অন্তত অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বিজ্ঞানমনস্ক না হলে পৃথিবীকে বদলানো যায় না।
অজ্ঞানতার কাছে মুচলেকা তো আপনিও দিলেন।
আর আমি তো খর্বকায় উন্মাদ বিশেষ। মনে রাখবেন, মার বুকের কুইনাইন খেয়ে সচেতন হয়েছি। আমি মুচলেকা দেবো না তো কে দেবে?

পংকজ আমাকে শেখায়, "কমিউনিস্টদের প্রতিটি বিষয়ে 'কেন' বলে প্রশ্ন করা উচিত এবং নিজের মাথা খাটিয়ে ভাবা উচিত বিষয়টা যুক্তিসঙ্গত কিনা, বাস্তবের সাথে মিলছে কিনা। কোন বিষয়েই কমিউনিস্টদের দাসত্ববাদকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত না।"
এও সে জানায়, "রাশিয়া এবং চীনের রাজনৈতিক চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত ভারতের মার্কসবাদীরা ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁরা ভারতের বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব এবং বিকাশের পর্যায়গুলি অনুধাবন না করে শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্বের ভিত্তিতে কেবল স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।
কিন্তু পরাধীন ভারতের ঔপনিবেশিক চরিত্রটি স্বাধীনতার পরে কেবল ঔপনিবেশিক চরিত্রে পরিণত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই ঔপনিবেশিক ধরনের চরিত্রকে কিছুতেই শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না। ভারতের অবিকশিত

উপজাতি এবং জাতিসত্তাগুলির উপর ইংলন্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বণিক সাম্রাজ্যবাদীরা একটি কেন্দ্রীভূত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলে ভারতের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন উপজাতি এবং জাতিসত্তাগুলিকে একটি দেশের রাষ্ট্রীয় সীমায় আবদ্ধ করতে সুরু করেছিল। তার পূর্বে দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের কোনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছিল না। বিভিন্ন উপজাতি এবং জাতিসত্তায় বিভক্ত ভারতবাসীর উপরে বিজাতীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপিত হবার ফলে উপজাতিগুলিকে আত্মীকরণ করে জাতিসত্তাগুলির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হল এবং জাতিসত্তাগুলির ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয় রাষ্ট্র বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে রইল। এইভাবে স্বাধীনতার পূর্বেই পরাধীন ভারতের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর মন্ত্রীসভা স্থাপন করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার ফলে তার ঔপনিবেশিক চরিত্রের কোনো মৌলিক পরিবর্তন হল না। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থার ঔপনিবেশিক ধরনের চরিত্রটি নির্ধারিত হয়ে গেল। পরবর্তী ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন এবং সেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে পরাধীন ভারতবর্ষের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক দেশের সৃষ্টি করা হয়।

বিভক্ত ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং দাস সংবিধানকে ভিত্তি করে রচিত স্বাধীন ভারতের সংবিধান ১৯৫০, ২৬ জানুয়ারি, ইংরেজদের হাত থেকে পাওয়া ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র হল ঔপনিবেশিক ধরনের। এটাই হল ভারতের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির দ্বারা বিভ্রান্ত নকশাল-পন্থীরা বিদেশী রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাবে স্বাধীন ভারতকে আধা ঔপনিবেশিক আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ ধরে নিয়ে এবং নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে সশস্ত্র কৃষিবিপ্লবের ভুল রাজনৈতিক লাইনের শিকারে পরিণত হল।

সি. পি. এম.ও শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের সাহায্যে স্বাধীন ভারতের আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ঔপনিবেশিক ধরনের রাজনৈতিক চরিত্রকে বৃহৎ বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে জমিদার বুর্জোয়া চরিত্রের সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতন্ত্র অর্থাৎ জনগণের গণতন্ত্রের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক লক্ষ্যস্থির করেছে।

বর্তমানে তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি সি. পি. আই. (এম) রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার দাবী নিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করেছে।

ভারতীয় কমিউনিস্টদের প্রকৃত কাজ হবে সঠিক তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে বিকশিত করা। কোনো মতেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে গণতান্ত্রিকতাকে সংকুচিত এবং খর্ব করা নয়।"

এরকম পংকজেরা আসে যায়। অর্জুনেরাও আসে যায়।

উপরন্তু অর্জুন বলে বসে, পরিবার থেকেই সুরু হোক বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামো—

যে কাঠামোতে এক একটি হাউজহোল্ড এক একটি ফার্ম বিশেষ—এভাবে দেশের ফার্মগুলি ঐ সর্বাপেক্ষা ছোট্ট ইউনিটের হাউজহোল্ড ফার্মের গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর দ্বারা পরিবর্তিত হোক যৌথ ও কমিউনিটি প্রোডাকশনে।*

বীরভূমের সেই ফকসহোলে ঐসব কথাগুলি ঢোকে না। বরং সেইসব শেয়ালেরা চেয়ে দেখে বরফের রাশি জ্যোৎস্নায় পড়ে আছে।

—কিন্তু আপনাকে তো ছাড়া-গোরুর মত ছাড়তে পারি না। আপনি এখন বিপদজনক। মুচলেকা এযাবৎ কারা কারা দিয়েছেন, জানেন? এক ডাঙ্গে সাহেব, দুই অজয়বাবু, তিন বসু, অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আপনি। এবার ভাবুন, কেমন বিপদে পড়লেন আপনি। একদিকে সি. পি. এম. আপনাকে ঠেঙাবে। অন্যদিকে আমরা, কিছু বিচ্যুতি দেখলেই ঠেঙাবো। না, ঠেঙাবো না। আপনাকে আসলে আগাপাস্তালা অস্ত্রহীন করব। আপনার ডানহাত ভেঙে দেব। আর যদি আপনি মুচলেকা দিয়েও জনগণের পক্ষে থাকেন, যেমন আছেন এক কাকা; দুই, পরিমল, তিন বিপ্লব, লাস্টলি উৎপল, তাহলে আপনাকে রক্ষা করব।

বীরভূমের ঐ ফকসহোল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি কোচবিহারের দিকে পা বাড়াই। আশিস আমাকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বাসে নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় ট্রেনে।

আমার স্বপ্ন অপরিসীম। আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই। দিন বদলের স্বপ্নপালা আমি এখনো দেখি। পালটে দেবার স্বপ্ন আমার এখনো গেল না।

দেখি, কৃষ্ণনগরের কুমোর পাড়ায় অজস্র নেহরু, জহরকোট পরা, দেখি ইন্দিরা, রাজীব প্রমুখ স্ট্যাচুর স্টুডিওতে বিশাল এক লেনিনের মূর্তি। তার খোলে আন্ডারগ্রাউন্ড।

দেখি, চিত্রমন্দির সিনেমা হলের পর্দার পিছনে মা কালী। মা কালীর মতই নরমুণ্ড-মালা গলায় পরে, আসলে আমার মা আনন্দময়ী, মা কালীর মতই ঐ ছিন্নহস্তের শতনলি হার পরে, তিনি, আনন্দময়ী, আমাকে ডাকছেন, "আয়, অসুর নিধন করবি, আয়!" তাঁর ডাকে সাড়া দি'। কাছে যাই। মা কালীর উদ্যত বক্ষ যেন অগ্নি, পাবক, যেন অগ্নি জ্বলে। আমি পুড়তে থাকি।

শেষ কথা এই, আমার ডানহাত ওঁরা ভেঙে দেবে বলেছেন, তারই অপেক্ষায় আছি। সর্বক্ষণ কেবল হাতুড়ির শব্দ পাই, যেন আমি মেক্সিকোতে, লা ভিভা মেক্সিকোতে। আমার মাথার পিছন অবিকল ট্রটস্কি যেন। হাতুড়ি উদ্যত। তবু গাই, পরাজয় সহে না অন্তরে তোমার, তুমি যে জয়ের মূর্তি, কমরেড স্তালিন।

অন্ধের জনযুদ্ধের গান ভেসে আসে।

---

* এই ডাইরীতে আলাদা পৃষ্ঠায় অর্জুন সেনের পেপার আছে। যা হুবহু এই: পৃষ্ঠা ৫১ দ্রষ্টব্য। —উদয়ন ঘোষ।

হয়তবা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিম কথা। হয়তবা রক্তের পিপাসাই ঠিক। স্বাভাবিক। মানুষও রক্তাক্ত হতে চায়। হয়তবা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের নিজেকে নবীন বলে অগ্রগামী (অন্ধ ?) উত্তেজের ব্যাপ্তি বলে প্রচারিত করার ভিতর। হয়তবা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালোভাবে লালিত জাতির কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা, সুখে থাকা, হিংসা রক্তিম হয়ে থাকা। হয়তবা বিজ্ঞানের অগ্রসর, অগ্রগতির মানে এই, শুধু এই। হয়তবা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয়। হয়তবা মৃত্যু নেই। প্রেম আছে। শান্তি আছে। মানুষের অগ্রসর আছে।

সেই সি. পি. আই. সহকর্মী আমাকে জানালেন, সবচেয়ে লুম্বিনীপার্ক ভালো। নিরাপদ। আপনাকে সেখানেই পাঠানো হবে॥

উদয়ন ঘোষের সংযোজন

সেখানে সে ভালোই থাকে। আমি একবার যাই সেখানে। দেখি, এক মুখ দাঁড়ি নিয়ে সে বিছানায় বসে। সামনে দাবার বোর্ড। আনমনে খেলছে। প্রতিপক্ষ অদৃশ্য।

—দেখছেন তো আমি কেমন মৃত্যুর সঙ্গে দাবা খেলছি। এমন এক চাল দিয়েছি এই লুম্বিনী পার্কে ঢুকেই, আজও মৃত্যু তার নিজের চাল দিতে পারছেন না, যে চালই দিন তিনি এবার কিস্তিমাৎ।

আমি একটা ইংরাজি কবিতা লিখেছি, শুনবেন ?...

Let 0 be a point
And listen that point covers no area as such
And has no length nor breadth, not even height.
That is, point is nothing and nothing and somehow zero,
But remember, point is not a zero at all.
And zero has no point over all.
Zero is zero.
Not only that, zero is also a number on the whole.
And any number will never be zero any time.
However, all zeroes are seemingly not equal.
Like, zeroes, all men are not equal.
And all women also are not equal.
Like men & women, all children are not equal in the world around.
Like children, all equals do not appear to be equal.
And only all equals and unequals are equal in the underground.

কি, ইংরাজির 'ক'-অক্ষর যার গোমাংস, সে পারলো তো !
আরেকটা শুনুন ! এটা অবশ্য স্রেফ বাংলা :

দূরত্বের অর্থ আমি জানি।
দূরত্বের টাইম দেখি না, বিলক্ষণ স্পেস দেখি।
দূরত্বের স্টার্ট আছে, কিন্তু ফিনিশ নেই।
স্টার্টিং পয়েন্টেও সে কিন্তু দূরত্ব নয়।
কখন যে সে দূরত্বে যায়, কেউ জানে না, আমি জানি।
জানি, দূরত্ব শেষ হবার নয়, সেইজন্যই সে দূরত্ব।
যদিবা সে ব্যস্তবাগীশ, তাড়াহুড়োয় শেষ হতে চায়—তাহলেও
সে দূরত্ব বলেই আরও দূরে চলে যায়।
আসলে দূরত্ব মানে, ডিসট্যান্স, মনে রাখলেই হয় ॥

আপনি আবার এ-সব পদ্য নিজের লেখায় ব্যবহার করবেন না। আমার কবিতা বহুকাল ধরেই অন্যলোকের ব্যবহারে লাগছে। এই দেখুন, আমি লিখেছিলাম,

Wishing is dreaming
Dreaming is having
Having dreaming
Dreaming die.

কডওয়েল সাহেব হুবহু এটা চুরি করে নিয়েছেন।
আমার এপিটাফও চুরি করে নিয়ে গেছেন। দেখবেন ?
দেখুন :

Unhappy men, who roam, on hope deferred
Relying thinking not of painful death.
Here was *I*, great in mind and word
Who his young Prime enjoyed but for a breath
In world-edge *Lumbini Park*, so far from Lesbian-lands.
I lie a stranger on uncharted strands.

দেখুন, উনি কেবল আমার '*I*' কেটে নিয়েছেন। কডওয়েল খুলে দেখবেন, আমাকে, আমার **'আমি'** কে, ভাবুন একবার, আমার **'আমি'** '*I*', *Lumbini* Park সব কেটে দিয়েছেন ॥

ফলে এক উপত্যকায়, আনাড়ী আমি, অটোর পাইলট আসনে বসে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। আর থামাতে পারলাম না। থামাতে জানি না আমি। ব্রেক জানি না। দেখি, ঋত্বিক ঘটক কেবল হাসছেন। মদ ছুঁড়ে আবছা করছেন মুভি ক্যামেরার লেন্স ॥*

* পাঠক, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। এই লেখায় আমি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিনয় মজুমদার, জাঁ জেনে, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, সুমন চট্টোপাধ্যায়ের কত-না-কত পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছি। আমার অজান্তে অনেকানেক কবিদের ভাষা, হয়তবা, আছে এই লেখায়।

THESIS ON MARX
Or a critical criticism of the idealism of Marx and the Marxists

☐ The chief defect of all hitherto existing materialism—that of Karl Marx and the Marxists included—is that they have conceived of "revolutionary", "practical critical" activity as only political/ideological activity without grasping the significance of "revolutionary", "practical-critical" activity directly in the realm of the processes of human material existence. Truly revolutionary political thought and action can arise, become possible, real and material only when it arises from truly revolutionary attempts to change the conditions of material existence—the relations of "production and reproduction of immediate life". The tragic irony of Marx and Marxists is that though they realised that the production and reproduction of immediate life constituted the "determining moments of history" or the structural aspect of social orders, yet in practice they attempted only political or superstructural change without directly trying to change the structural social relations.

☐ The relations of production and reproduction of immediate life do not exist in society in a generalised, vague, society-wide way but appear concretely, materially in the relations that obtain in specific social organisations for carrying out the tasks of production and reproduction of immediate life. While Marx and Marxists recognise the social organisations which carry out the task of reproduction of life—*the family (or in the light of modern social reality, more accurately the household)*—they failed to realise that even production is carried out by specific social organisations based on social cooperation among specific individuals to carry out production which for convenience we may call *firms*. This failure to recognise the concrete, material social organisations which give concrete, material shape to relations of production and reproduction hid from them a clear conception of how relations of production (ROP) and reproduction (RORP) change in history, how first new

firms and households based on new ROP and RORP respectively appear on the historical proscenium and how as these new firms and households proliferate, they create new social and political forces. It is only then that political changes begin to take place. Never ever in history has political change succeeded in bringing about firms and households with new structural ROP and RORP but it has always been the way around. The tragedy of the Marxist is that they have tried to first bring about political change in the hope that later they may be able to create firms and households with new structural ROP and RORP. A hope which they should have known was sure to be belied as they were already aware that structural change precedes superstructural (political) change. In practice they contradicted their own theory.

☐ Political activity which is confined to making attacks against only the political superstructure of any social status quo (the state machinery) and irrespective of whether these attacks are armed or unarmed, parliamentary or extra-parliamentary, overground or underground or a combination of all these, remains essentially non-revolutionary and even when it appears to have achieved success (as in all previous socialist revolutions) in reality fails to break the structural status quo. It is then only a matter of time before the essentially intact status quo explodes the myth of apparent political change and returns with great vengeance (as has happened in all so-called socialist countries, Soviet Russia and China included). Truly revolutionary activity aims at breaking the status quo right from the very beginning by creating new collectively owned communist firms based on direct consumption of production rather than a wage system (thus changing the ROP) and new collective/communist households based on group marriage (thus changing the RORP). It is only in the process of bringing about these structural changes that truly revolutionary political and other superstructural needs arise and truly revolutionary political activity become possible. As a result of failing to understand this, the ironic tragedy of Marx and the Marxists have been that the more revo-

lutionary they have tried to be politically the less revolutionary they have actually been in practice in terms of bringing about structural change in society.

☐ The tragic irony of all hitherto Marxists, including Marx himself, is that they have all along realised that the breakdown of all class-riven exploitative social orders and their transition to class-less, egalitarian, non-exploitative social order implies the withering away and final abolition of the state machinery and yet in practice they have contradicted their own theory and have all along advocated state ownership of the means of production—something which if established would make it practically impossible for the state to wither away and get abolished. On the contrary, state ownership can survive only so long as it intervenes in the life of the people in an extremely pervasive and fascist way. For the people, the fascism of state ownership is worse than the fascism inherent in bourgeosie democracy. Genuine class-less, egalitarian, non-exploitative social orders can be hoped to be created only when collective households based on group marriage collectively own and operate production units (firms). Each such collective firm household combination can then become a self-governing, truly democratic state in itself. The state as we know it withers away and instead there remains only the need to build exchange and cooperation relations among the collective household-firm combinations to bring the entire world (the people as well as the means of production) effectively under the control of the whole people without there being any need for a separate fascist state machinery which sits on the shoulders of the people in an oppressive way.

☐ The main task of any social superstructure (the state machinery, legal framework, cultural and ideological patterns) is to maintain the social structural status quo. Hence, the weaker the structure of any social order becomes as a result of inner contradictions, the stronger that society tries to make its superstructure. Thus we find today that world capitalism is weak and is increasingly becoming weaker everyday structurally—its economy (or firms based on

capitalist/precapitalist ROPs) is constantly facing the threat of being wiped out by recession or depression while in the realm of the family the more developed a capitalist country is the higher is the rate of divorce (or the rate of breakdown of the family) in that country. But superstructurally the world capitalist state is the strongest ever and is increasingly becoming stronger under the leadership of the American military machine and not only does it threaten to wipe out any political activity aimed at breaking the status quo but it also has the strength to do so. The tragedy of all hitherto Marxists has been their total failure to understand this primary military issue—the true dispensation of the enemy's forces. As a result they have all along chosen to attack the enemy where he is strong (the state machinery) without attacking where he is weak (the economy and the family). The attempt to change the status quo by setting up collective household-firm combines which are collectively organised internally but which operate as business units externally, is not only the only scientific way to change the status quo but is also bound to succeed in changing this status quo because it adopts the correct military strategy of attacking the enemy where the concentration of forces is weak while skilfully by-passing the points where the enemy's concentration of forces is strong. Collective household-firm combinations which are organised on the basis of direct consumption of their products by their members rather than a wage system and which consciously produce a marketable surplus aimed at giving tough competition to capitalist enterprises have the inherent strength to drive more and more capitalist enterprises out of business in the market place while at the same time bring more and more means of production under the direct control of the people. If skilfully managed, these units can operate within the capitalist legal framework under the very nose of the capitalist state machinery without the state being able to do anything to stop their proliferation until these household-firm combines proliferate enough and become strong enough to directly take on the capitalist state machinery and destroy it completely.

☐ The Marxists have tried to change the world only politically, in various ways : the point, however, is to change it structurally by changing the relations of production and reproduction, i.e. by creating collective/communist firms owned and operated by collective/communist households based on group marriage. ☐

□
With best compliments from :

S. Sen & Co.

Engineer, Fabricator, Fire Fighting
Equipments & General Order Suppliers
76A, RASTRAGURU AVENUE,
CALCUTTA-700 028.

□
Space Donated By :

S. P. Bhattacharya

□

With best compliments from :

Associated Superintendent

13, B. B. GANGULY STREET
CALCUTTA-700 012.

With best wishes from :

Manpal Singh

RAMGARH CANTT.

□
With best compliments from :

Metropolitan Electric Works

Engineers and Contractor
373/2, N. R. AVENUE, BLOCK-'G'
NEW ALIPORE, CALCUTTA-53
PHONE : 78-2320

□
With best compliments from :

S. N. M. Consultants

1/1 VANSITTART ROW
CALCUTTA-1.

□

With best compliments from :

Midnapore College
Computer Centre
MIDNAPORE

With best compliments from :

Phone : 31-6219
Kumar Tank & Safe Works
Dealers in : C. I. & Black Steel Tubes, G. I. Spun Pipes, D/F Pipes & Specials, C. I. Joints, G. I. Fittings Lead & Spunyarn and Sanitary Goods.
Dealers in : Kalpana ISI Sluice Valve.
34, COLLEGE STREET,
CALCUTTA-700 073.

□
Space Donated By :

Prasanta Kumar Guin

□
With best compliments from :

M/s. Electric Equipment & Engineering Co.

Electrical Contractor & Suppliers

P-40, INDIA EXCHANGE PLACE
CALCUTTA-700 001.

PH. Off. : 25-2118, 25-3019
Res. : 31-5389

□

With best compliments from :

I. T. C. Limited
37, CHOWRINGHEE,
CALCUTTA-700 071.

চিত্তরঞ্জন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার
৩৪বি শ্যামবাজার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৩৫
৩৩-৬০২৫, ৩০-৮২৭০

□
With best compliments from :

SINHA SANITATION

Dealers in :

Sintex, Patton, Polycon Tank, Plastic Door-Shutter, Glass-Windows, False Ceiling & Wall Panelling, P. V. C. Ice Box, Lakshmi & Himson Gun Metal Valves.

Classic C. P. Fittings, Brass Cocks, P. V. C. Pipe & Fittings, Glazed Tiles, Spartek, Sanitary Ware, Acrelic Self, Mirror etc. &
General Order Suppliers.

9C, NIRMAL CHANDRA STREET,
CALCUTTA-700 012.

Phone : Shop : 272849
Resi : 270903

□

Space Donated By :

A WELL WISHER

Compliments from :

Hollywood Decor

Interior Decorator & Furnishers
3 GOPAL NAGAR ROAD, ALIPORE.
CALCUTTA-700 027.
PHONE : 479-5617

□

মানস-প্রতিবন্ধীদের সংস্থা :
বিকাশায়ন
আপনার সহযোগিতা চায়
যোগাযোগ :
৪০ বনহুগলি গভঃ কলোনি,
কলিকাতা-৭০০ ০৩৫।

□

একগুচ্ছ তাজা বইয়ের ডালি নিয়ে
যাত্রা শুরু করছে
সিন্ধুসারস
৩৭ গার্ডনার লেন,
কলকাতা-৭০০ ০১৪

□

Balmer Lawrie & Co. Ltd.
(A Government of India Enterprise)
21, NETAJI SUBHAS ROAD,
CALCUTTA-700 001
Tele : 220-6871 to 74
220-6875 to 79
220-5407 to 09
Telex : 021-7435 & 021-2341 BLCA IN
Fax : 243-4478
243-4479
248-3768

বারীন সাহা, তারকোভস্কি ও বাদল সরকার
আমাদের প্রথম তিনটি গ্রন্থের লেখক।
সিন্ধু সারস

COMPLIMENTS :

MOLOY BANDYOPADHYAY

With best compliments from :

M/S. DAS PRINTERS

123/1, ACHARYA P. C. ROAD,
CALCUTTA-700 006
Phone : 350-4312, 350-8843
Leading House of Quality Letter press
& Off-Set Printing

Declaration No. : 96/93 ☐ Jan.-Mar. 1994 ☐ Rs. 18

CITIBANK CARDS
The Best Way To Pay

সঞ্জয় চক্রবর্তী কর্তৃক ইমপ্রিন্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি ২/২৯, তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।